কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক

শঙ্খ ঘোষ

রত্নাবলী

১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন □ কলকাতা ৭০০ ০০৯

তৃতীয় সংস্করণ : ১৯৯৫

প্রচ্ছদ শিল্পী
সোমনাথ ঘোষ

কলেজ স্ট্রিটে প্রাপ্তিস্থান
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯
দূরভাষ : ২৪ -৬৯৮

জে. এন. ঘোষ অ্যান্ড সন্স
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
দূরভাষ : ২৪১-৬৪৭০/২৪১-৭ ১৯

মুদ্রণে
নিউ রেনবো ল্যামিনেশন
৩১এ, পটুয়াটোলা লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯
দূরভাষ : ২৪১-২৯০৯

বাবা

শ্রীচরণেষু

লেখকের অন্য কয়েকটি বই :

ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ

এ আমির আবরণ

নির্মাণ আর সৃষ্টি

ছন্দের বারান্দা

নিঃশব্দের তর্জনী

শব্দ আর সত্য

সকালবেলার আলো

শব্দ নিয়ে খেলা

রবীন্দ্রনাটক বিষয়ে সাম্প্রতিক একজন পাঠক বা দর্শকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ এই বই। প্রবন্ধগুলি বিচ্ছিন্ন, সাত-আট বছরের ছড়ানো সময়ে লেখা। ফলে এর মধ্যে কখনো কিছু-বা পুনরুক্তির অন্যায় দেখা যাবে। সে-জন্য মার্জনা চাই।

পুরোনো লেখা নিজের কাছে সব সময়েই লজ্জার, কিন্তু 'নাটকে গান' রচনাটি তারও চেয়ে বেশি। এই প্রবন্ধের গোটা গড়নটাই আজ আমার পক্ষে অস্বস্তিজনক। তাহলেও, অল্পবিস্তর তথ্যের ব্যবহার ছিল বলে, একেবারে বর্জন না করে ওটিকে 'পরিশিষ্টে'র অন্তর্গত করা হলো। এ-লেখাটিতে প্রশ্রয় পেয়েছে সমস্যাটির অধ্রুব দিক, এর ধ্রুব দিকটিকে লক্ষ করবার চেষ্টা আছে 'নাচ গান নাটক' প্রবন্ধে।

বইটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হতে পারছে প্রীতিভাজন শ্রীস্বপন মজুমদারের অদম্য আগ্রহে। প্রসঙ্গত স্মরণ করি সেইসব সম্পাদককে যাঁদের তাড়ায় প্রবন্ধগুলি লেখা হয়েছিল। বইটি পড়ে অবশ্য পরিহাসরসিক কেউ বলতে পারেন যে তাড়া না দিলেই ওঁরা ভালো করতেন। সে-কথা আমিও মানি।

শঙ্খ ঘোষ

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

ছোটো একটি প্রবন্ধ বাড়ল এবার, শেষে। আর 'পরিশিষ্ট' কথাটি সরিয়ে নিয়ে বইয়ের শেষাংশকে তৃতীয় পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা হলো।

এ-বই পড়ে যাঁরা কিছুমাত্র খুশি হয়েছিলেন একদিন, তাঁদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

শঙ্খ ঘোষ

তৃতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

এবারও যোগ করা হলো ১৯৮১ সালে লেখা নতুন একটি প্রবন্ধ, বইয়ের দ্বিতীয় অংশে। আশা করা যাক যে এইখানেই শেষ।

'নাটকে গান' লেখাটিতে গানের সংখ্যা-বিষয়ক দুএকটি অসংগতি থেকে যাচ্ছিল এত দীর্ঘকাল ধরে, সেটা আমার লক্ষ্যে এনেছেন শ্রীমতী আলপনা রায়চৌধুরী। এ ছাড়াও, এবার প্রুফ দেখতে গিয়ে ধরা পড়ল বেশ-কয়েকটি উদ্ধৃতির স্খলনবিচ্যুতি। যথাসম্ভব পরিমার্জিত করা হলো এসব।

১ বৈশাখ ১৩৯২

শঙ্খ ঘোষ

সূচিপত্র

ל

নাট্যমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ

যেমন ধর্মের আফিমে বা প্রাকৃতিক ছলাকলায় ভুলিয়ে রাখা যায় মন, ঠিক তেমনভাবেই কখনো কখনো ব্যবহারে আসে 'পুরাণ' শব্দটি। তখন পুরাণ আমাদের কাছে কেবল মৃত তথ্যের সমাহার, নির্জীব এক গতদৈনিক অস্তিত্ব, তার বেশি নয়। তখন তার অভ্যাসমন্থর আলস্যের কাছে আমরা পাই না কিছু, কোনো অর্থেই সে আর আমাদের গড়ে উঠতে সাহায্য করে না। 'রক্তকরবী'র রাজাকে যখন পুরাণ-আলোচনায় ভুলিয়ে রাখবার চক্রান্ত চলছিল, বলা হচ্ছিল এখন কিছুদিন 'পুরাবৃত্তের গাঁঠ-কাটা চলুক', তখন পুরাণ শব্দের এই তাৎপর্যই ছিল সর্দারদের মনে। তারা চেয়েছিল বর্তমানের বোধ থেকে এইভাবে সম্পূর্ণ স্খলিত হয়ে যান রাজা।

কিন্তু কেন পুরাণ বর্তমান থেকে সরিয়ে নেবে চেতনাকে ? সেটাই কি তার স্বভাব ? রবীন্দ্রনাথ ঠিক কী দেখাতে চাইছিলেন এই অংশে ? এর একটা ইঙ্গিত অনুমান করা যায় যখন দেখি পুরাণ শব্দের অধ্রুব এই ভ্রান্ত প্রয়োগের পাশাপাশি নাটকে একটি গাঢ়তর সত্যের উচ্চারণ করেন রাজা। বলেন : মহাকাল নবীনকে সম্মুখে প্রকাশ করে চলেছে। মহাকালের অন্তর্গত থেকে এইভাবে পুরাণ যখন কেবলই নবীনকে প্রকাশ করে চলে তখন সে সত্য, আর যখন তার অর্থ কেবল অতীতকে পিছনে বহন করে বেড়ানো তখন সে ঘোর মিথ্যে।

মহাকাল নবীনকে সামনে প্রকাশ করে চলে, এই বিশ্বাসে দেখলে ছিন্ন একটি নিমেষও আর একাকী স্বয়ংতন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না, তার সফলতা গড়ে ওঠে ব্যবধিহীন কালস্রোতের অংশ হিসেবে। সময় যেন দীর্ঘ একটি একক অস্তিত্ব, ক্রমে তা খুলে যাচ্ছে অন্তহীনভাবে এবং প্রতি মুহূর্তের বর্তমান এইভাবে তার স্বভাবের মধ্যে আত্মগত করে নিচ্ছে অতীতের নির্যাস। বর্তমানের মধ্যে অতীত তখন আর জীর্ণ ভার হয়ে থাকে না, হয়ে ওঠে এক সঞ্জীবিত প্রবাহ।

এই প্রবাহকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে ওতপ্রোত অঙ্গীকার করে নিতে চেয়েছিলেন মনে হয়। নাটকের বিষয়ে এবং বিন্যাসে তিনি তাই নিয়ে আসেন ব্যাপ্ত সময় আর স্মৃতির ব্যবহার। সাম্প্রতিককে দূরে সরিয়ে দেখবার ইচ্ছেয় এখন পশ্চিমি নাটকেরও অন্যতম এক ধরন হলো পুরাণপন্থা বা ক্লাসিকের অনু-বর্তন, যেন শিকড়সন্ধান হিসেবে। যেমন সার্ত বলবেন : মেটারলিঙ্কের 'নীল পাখি' ধরনের শিশুসেব্য প্রতীক আর চাই না, কিন্তু আজও আমরা চাই পুরাণ, মৃত্যুর, নির্বাসনের, প্রেমের পুরাণ। যেমন ইয়েট্‌স একসময়ে মনে করেছিলেন যে সরল লোককথাকেই আবার সঞ্চারিত করে নিতে হবে আমাদের শ্রেষ্ঠ রচনায়, ধরতে হবে তার সমৃদ্ধ দূরপ্রসারী চিত্রবহুল জীবন। অথবা যেমন ব্রেখ্‌ট চেয়েছিলেন ; এই মুহূর্তকেই ধরবার জন্য যেমন তিনি অনেকখানি ঘুরিয়ে ধরতে চেয়েছিলেন দেশকাল : 'মাদার কারেজ' বা 'গালিলিও'র দূর সময়, 'ককেশিয়ান চক-সার্কল'-এর দূর দেশ। এইভাবে হয়তো বাস্তবের ধারণাও পালটে যায় অনেকটা, আধুনিককে ধরবার জন্য বাস্তবিকের রুদ্ধ দেয়াল সরিয়ে দেবারও দরকার ঘটে যায় অনেকসময়ে। রবীন্দ্রনাটকেও তেমনি দেখতে পাই বারবার, সময় ও স্মৃতির স্পর্শে সাম্প্রতিকের পেষণকে কেমনভাবে তিনি খুলে দেন আধুনিকতার মুক্তিতে, কেমনভাবে তিনি প্রত্যাহার করে নেন ছোটো-খাটো বাস্তবের দাবি।

অবশ্য ব্যাপ্ত এই সময় সেখানে নিশ্চয় প্রচলিত পুরাণের পথ ধরে আসে না। মীথ রিচুয়াল আর্কেটাইপে সংহত এক নিত্যজায়মান লোকপুরাণের কথাই হয়তো অলক্ষ্যে ভাবছিলেন তিনি, যেমন 'ফাল্গুনী'র কবি জানিয়েছিল এক বিশ্বপুরাণের কথা। মনে পড়ে, পুরাণ-আলোচনায় ভুলিয়ে রাখবার প্রস্তাবের পাশাপাশি প্রতিবিন্যস্ত এক সংলাপ আছে 'রক্তকরবী'তে, হঠাৎ বলতে হয় অধ্যাপককে : 'ওই দেখতে পাচ্ছ, কে যাচ্ছে ?' ধানীরঙের কাপড়পরা নন্দিনী তখন 'পৃথিবীর প্রাণভরা খুশিখানা নিজের সর্বাঙ্গে টেনে' নিয়ে দূর পথে চলে যাচ্ছে। পৃথিবীর খুশি আপন শরীরে বহন করে নন্দিনীই তখন মুহূর্তমধ্যে জেগে ওঠে নব-পুরাণ হয়ে। পাঠক বা দর্শকের লোকস্মৃতিকে এইভাবে চকিতে ছুঁয়ে যায় সমাজে-নিসর্গে একত্র-গাঁথা আমাদের নবান্নের গ্রাম। আবার অল্প পরেই যখন অনুপ-উপমন্যুর ক্ষয়িত যৌবনের জন্য আর্তনাদ করে ওঠে নন্দিনী, যখন সে বলে : ওরা 'আষাঢ়-চতুর্দশীতে আমাদের নদীতে বাচ খেলতে আসত', তখন এই উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই আদ্যন্ত কালের মধ্যে আমাদের যোগ পেয়ে

যাই। দেশকালের স্মৃতি এইভাবে এক অন্যতর পুরাণমহিমার সঙ্গে পাঠককে লীন করে নেয়। ‘রক্তকরবী’র রঙ্গভূমি থেকে পুরাণবাগীশ যে নিঃশব্দে সরে যায়, সেটাকে তখন আমরা সংগত বলেই ভাবতে পারি।

খুবই ভিন্ন এক প্রসঙ্গে, মানুষের তিনটি জন্মভূমির কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ‘মানুষের ধর্ম’ বইতে। তার প্রথম বাসস্থান পৃথিবীলোক, দ্বিতীয় ভূমি স্মৃতি-জগৎ, আর তৃতীয় জন্ম যেন আত্মিক নিখিলে। এই তিন জগৎ কিন্তু একত্র জড়িত, মানুষ তার মুক্তি জানে কেবল ত্রিজাগতিক সমন্বয়ে।

রবীন্দ্রনাথের নাটকও জন্মায় এই ত্রিলোকে। একটি অনতিনির্দেশিত স্থানকালে বিন্যস্ত তার ঘটনাজগৎ, কিন্তু সে পৌঁছে দেয় নিবিড় কোনো আত্মিক চেতনায়। আত্মভূমি বস্তুভূমি এইভাবে দুই প্রান্ত টান করে ধরে, তার মধ্যবর্তী যোগের পথ তৈরি রাখে লোকস্মৃতি। ‘শারদোৎসব’ থেকে অন্ত্যকাল পর্যন্ত যে-সময়খণ্ডে রবীন্দ্রনাটক তার নিজস্ব ধরন অর্জন করে নিয়েছে, যেখানে প্রথানুগত্যের সমস্ত দায় এড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ আত্মস্থ, সেই অংশের অন্তর্বিষয় এবং বহির্বিন্যাসে আমরা ব্যাপকভাবেই দেখতে পাব এই লোকস্মৃতির সুঠাম ব্যবহার।

২

বাংলা নাটক যখন প্রথম তৈরি হচ্ছে, তাকে ভিন্ন ভিন্ন আদর্শে সাহায্য করছিল সংস্কৃত নাটক আর যাত্রা। কিন্তু নাট্যকারদের পক্ষে অনেকদিন পর্যন্ত এই সাহায্য ছিল যান্ত্রিক, বস্তুত তাঁরা নতুন-পাওয়া বিদেশি আঙ্গিককেই ধরতে চাইছিলেন সবলে। কেবল উপকরণবিন্যাসের জন্য, বৈচিত্র্যসৃষ্টির ইচ্ছায় অথবা কখনো-বা নিছক আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তাঁরা হাত বাড়াচ্ছিলেন দেশীয় ঐতিহ্যের দিকে—যদি ‘ঐতিহ্য’ কথাটি ব্যবহার করা যায় এখানে। প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা তখনো ফুরোয়নি, যাত্রা আর নাটক একটা সময়ে এসে দাঁড়াচ্ছিল প্রতিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্কে। জনরুচিকে একদিক থেকে আরেকদিকে টান দেবার ইচ্ছে থেকেই কিছু যৌতুক দিতে হতো কখনো, গিরিশচন্দ্রদের তাই যাত্রা-প্রভাবিত না-হয়ে উপায় ছিল না। এই অর্থে যাত্রা অথবা সংস্কৃত নাটক এঁদের কাছে ছিল এমন এক বন্ধন, যাকে এড়িয়ে চলাই ছিল সমস্যা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতে এইটেই এল মুক্তিপন্থা হিসেবে। কেননা তিনি তো আত্ম-রক্ষার কারণে আনেননি এর ব্যবহার, এনেছিলেন আত্ম-আবিষ্কারের জন্য। রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যস্থাপনার মধ্যে যাত্রার তুল্য মুক্তি চাই, এ-কথা ঘোষণা করবার

সময়েও তাই তাঁর মনে পড়েছিল 'প্রাচ্যদেশের ক্রিয়াকর্ম খেলা-আনন্দ সমস্ত সরল-সহজ'। এই ক্রিয়াকর্ম খেলা-আনন্দের বিশেষ প্রাচ্যভঙ্গিমাটি আয়ত্ত করবার জন্যেই রবীন্দ্রনাথ আনেন যাত্রা বা সংস্কৃত নাটক, রূপকথার আবেশ অথবা খোলামেলা প্রাকৃতিক আনন্দ।

তাই যাত্রা তাঁর কাছে জনজীবনের নামান্তর। টমসন তাঁর নাটকে যে মেলার প্যাটার্ন লক্ষ করেছিলেন, সে-প্যাটার্নের মধ্যে সহজ সরল জীবনশ্রীকে রঙ্গময়ী করে তোলাই ছিল রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়। 'অচলায়তন'-এর দর্ভকপল্লির আবাসিকেরা মাটির কাছাকাছি চলে যায় এইভাবে, কিংবা কেবল 'অচলায়তন'ই কেন, তাঁর প্রায় সব নাটকই এইভাবে এক অবিচ্ছিন্ন জনজীবন-প্রবাহ রচনা করে তুলতে চায়। এরই অঙ্গ হিসেবে দেখলে 'ঠাকুর্দা আর তার দলবল' বলে পশ্চিমি ধরনে উন্নাসিক তাচ্ছিল্য জানাতে আর ইচ্ছে হয় না, ওঁরা বুঝতে না পারলেও আমরা ধরতে পারি কেন 'ফাল্গুনী'র বাউল বা 'রাজা'র পাগল অল্প একটু মাতিয়ে নিয়েই আমাদের কালকালান্তরের স্মৃতিকে দুলিয়ে দেয়, বাউল-বৈরাগীর চিরন্তন বাংলাদেশের সজীব মূর্তি হিসেবে ঠাকুর্দা আর ধনঞ্জয়কে আমরা চিনে নিতে পারি সহজেই। এই চরিত্রগুলি সমগ্র নাটকের অন্তঃশরীরে একটি দেশীয় নকশা বুনে দেয়, কিন্তু বুনে দেয় খুব আধুনিক ধরনে, কেননা তাকে আমরা দেখতে পাই জীবিত স্বভাবের মধ্যে। বঙ্কিমের সন্ন্যাসীর মতো তারা নিছক বাইরের আগন্তুক নয়।

দ্রুতবর্ধমান জটিল নগরসভ্যতার পাশাপাশি এই শ্যামল উপস্থাপনার একটা মানে আছে হয়তো। এমন নয় যে এর মধ্যে আছে 'গ্রামে ফিরে যাও' ধরনের কোনো সরল পরামর্শ। আধুনিক সমস্যাবলিই ছিল রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্যে, যদিও তাকে নাম দিয়েছিলেন তিনি চিরন্তন সমস্যা— এবং তার কোনো কোনো জীবনঘনিষ্ঠ উত্তরও ছিল তাঁর ভাবনায়। কিন্তু সে-উত্তরকে তিনি জড়িয়ে নিয়েছিলেন গ্রামীণ মণ্ডনে। এর মধ্য দিয়ে তিনি চাইছিলেন বাংলাদেশের চিরায়ত যোগসূত্রটিকে অবিচ্ছিন্ন রাখতে, পটভূমিকায় সজীব করে তুলতে চাইছিলেন আমাদের বিলীয়মান অস্তিত্বের টান।

সংস্কৃত নাট্যজগৎকেও তিনি ব্যবহারে আনেন এইভাবেই। কোথাও কোথাও প্রাচীন নাট্যধরনে প্রস্তাবনা তৈরি হচ্ছে, অথবা রাজবয়স্যের চরিত্র-ভঙ্গিমা আসছে কোথাও, কিংবা এমন-কী ঘটনানিবেশেও কখনো-বা মনে পড়ছে পুরোনো নাটক — এসবই হলো গৌণ কথা। 'রত্নাবলী'র রাজঅন্তঃপুরে অগ্নিকাণ্ডের

ঘটনা যে 'রাজা' বা 'মুক্তধারা'র ঘটনাকৌশল হিসেবে দেখছি, এসব তথ্যও এখানে তত গণনীয় নয়। কিন্তু কেবলমাত্র রাজপ্রতিবেশ গঠনের দ্বারা আধা-ঐতিহাসিক একটি মায়া রচনা, ইতিহাসের বিষয় না হলেও অনায়াস মহিমায় ইতিহাসের রঙিন প্রচ্ছদ গড়ে তোলা— এইটেই অনেক জরুরি আঙ্গিক হয়ে ওঠে তাঁর রচনায়। 'রাজা'র ঠাকুর্দা হঠাৎ রাজকর্মীর ভূষণে চলে আসেন, 'অচলায়তন'-এ দাদাঠাকুরেরও রাজকীয় আবির্ভাব ঘটে যোদ্ধবেশে, প্রায় সব নাটকেই কেন্দ্রিত থাকে রাজ-জল্পনা,— এর মধ্য থেকেই লোককল্পনা জীবিত হয়ে উঠে স্পর্শ করতে থাকে দূর-মধ্য অতীতকে, ঠিক প্রত্যক্ষভাবে নয়, অনেকটা তির্যক চালে। এই পদ্ধতিতেই আবার কখনো-বা অগোচরে রূপকথার নিঃসৃত নির্যাস সঞ্চারিত হতে থাকে অমলের খেয়ালি কল্পনায়, 'শারদোৎসব'-এ বিজয়াদিত্যের ছদ্মবেশী ব্যবহারে অথবা 'ফাল্গুনী'র 'ওহে কোটাল হে, কোটাল হে' জাতীয় স্বতঃছন্দোময় সংলাপের প্রয়োগে। 'শারদোৎসব'-এর ঠাকুরদাদা যখন বালকদলকে ঘুরিয়ে আনতে চান পঞ্চাননতলার মাঠে, আর তারপর যখন আমরা শুনতে পাই ছেলেদের কথা : 'না, গল্প না, বটতলায় বসে আজ ঠাকুর্দার পাঁচালি হবে' 'বটতলায় না, ঠাকুর্দা, আজ পারুলডাঙায় চলো', তখন এই পঞ্চাননতলার মাঠ, বটতলা, পাঁচালি আর পারুলডাঙায় মিলেমিশে বাংলাদেশের এক নিত্য-কাঠামো প্রস্তুত হয়ে যায়। তেমনি আছে 'ডাকঘর'-এ : লাঠির আগায় পুঁটলি বাঁধা নাগরাজুতো-পায়ের লোক, কাঠবিড়ালি আর ডুমুরগাছের তলায় ঝরনা, পাঁচমুড়া পাহাড় আর শামলী নদী, পারুলদিদি সুধার বেনে-বউ পুতুল, ক্রৌঞ্চ-দ্বীপের নীলরঙা পাহাড় আর শেষ অবধি অমলের এই স্বপ্ন : 'তার নাকে নোলক, তার লাল ডুরে শাড়ি। সে সকালবেলা নিজের হাতে কালো গোরু দুইয়ে নতুন মাটির ভাঁড়ে আমাকে ফেনাসুদ্ধ দুধ খাওয়াবে, আর সন্ধ্যের সময় গোয়াল-ঘরে প্রদীপ দেখিয়ে এসে আমার কাছে বসে সাতভাইচম্পার গল্প করবে।'

প্রদীপ দেখিয়ে আসা ! এই ভাষাভঙ্গিই আজ আমাদের কাছে কত দূরের জগৎ !

ওরই সঙ্গে মনে পড়ে প্রকৃতির আয়োজন। 'শারদোৎসব' 'ডাকঘর' 'ফাল্গুনী'তে প্রকৃতি তো প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব, কিন্তু অন্যত্রও সে আছে সমস্ত অবয়বের সঙ্গে জড়িত রূপে, বরং সেইজন্যেই আরো বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাট্যাবলিতে কতই সে অচ্ছেদ্য অংশ। এই প্রকৃতি কি সেখানে আছে কেবল রোম্যান্টিক কবির যোগ্য অনুষঙ্গ হিসেবে? এ কি কেবল সৌন্দর্যধ্যান? একরকম পলায়নপর ভাবনা?

সত্যতন বাংলাদেশে বসে আমাদের অনুভব করতে বাধা হয় না যে এই নিসর্গ-সংসারে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগের এক নূতন রিচুয়াল তৈরি করে নিতে চেয়েছিলেন, 'শারদোৎসব' এবং 'ফাল্গুনী'র মধ্য দিয়ে ক্রমে সেটা পৌঁছয় তার পালাগানে, বর্ষাবসন্তের নিত্যউৎসবে যে-নৃত্যগান স্পষ্টই আমাদের জীবনাঙ্গ হয়ে উঠছে আজ।

এইভাবে, নাচগান আর কবিতার ব্যবহার রবীন্দ্রনাটককে জীবনের সমভূমি থেকে তুলে নেয় আত্মিক ভূমিতে, স্মৃতির আবহ তাকে টেনে রাখে সাম্প্রতিকতা থেকে কিছু দূরে; কিন্তু এর কোনোটাই একে সত্য অর্থে দূরে ঠেলে দেয় না, বরং নিবিড়ভাবে ধরে রাখে দেশকালেরই বোধের মধ্যে। তাই প্রাচ্যদেশের সহজ সরল ক্রিয়াকর্ম খেলা-আনন্দ হয়ে ওঠে একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাট্যের বিষয় ও বিন্যাস, এইখানেই তাঁর নাটক খুঁজে পায় যথার্থ মুক্তি।

৩

একদিক থেকে দেখলে তাই বলতে হবে যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই জেনেছিলেন বাংলা নাটকের সম্পূর্ণ স্বকীয় নাট্যবিন্যাস, তার লোকজীবনের সঙ্গে ঘন সম্পর্কে যোজিত এক নাট্যরূপ। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও ঠিক যে এই ভঙ্গিই আবার স্পর্শ করে আছে প্রতীচ্যের আধুনিক পর্ব, এখনো পর্যন্ত তাঁকেই হয়তো বলা যায় আমাদের দেশের আধুনিকতম নাট্যকার।

'যা কিছু নাটুকেপণা তার থেকে ছাড়িয়ে নিতে হবে নাটককে' এই হচ্ছে এক সাম্প্রতিক ধুয়ো। আধুনিক বিদেশি নাটকে তাই আমরা নাটকের প্রচলিত গড়নকে ভেঙে পড়তে দেখছি বারংবার, এক-একটা দ্রুত পর্যাবসানের মধ্য দিয়ে আজ অ্যাবসার্ড বা উদ্ভট নাটকের জগতে এসে দাঁড়িয়েছি। লক্ষ করতে হবে যে আমাদের দেশে এই মুক্তির একটা সূত্র তৈরি হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের হাতেই। তাঁর নাটকের ইতিহাস আমাদের দেখিয়ে দেয় কেমন করে তিনি বর্জন করছেন চলতি চরিত্রের অথবা প্লটগঠনের ধারণা, কেমন করে স্থানকালের বিন্যাসকে ক্রমে নিবিড় ঐক্যের মধ্যে ধরে এনে আবার টুকরো করে ছড়িয়ে দিচ্ছেন, কিছু-বা এক্সপ্রেশনিস্ট ধরনে। 'ফাল্গুনী'র মঞ্চবিহীন খোলামেলা অভিনয়ে যে তিনি দর্শক আর অভিনেতাদের মধ্যে অনায়াস যোগ খুঁজছিলেন অথবা প্রচলিত রীতির বাইরে এনে নাটককে জড়িয়ে নিচ্ছিলেন নাচগানের সম্মিলিত পার্বণে—এই সবই আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ করবার বিষয়।

ঠিক, অনেকটাই আধুনিকতার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে এখানে। এমন-কী ঐ শেষ কথাটির পর একটা সহজ সমীকরণের ভাবনাই মনে আসে, হয়তো ভাবতে পারি যে ব্রেখ্‌টের ধরনধারণের সঙ্গে কোথাও একটা সামঞ্জস্যই তৈরি হয়ে যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের। তাই বলে কি ব্রেখ্‌টের 'এপিক থিয়েটার' আর রবীন্দ্রনাটক এক নিশ্বাসে তুলনীয় হবে? প্রায় 'বিসর্জন' লিখবার সমকালেই রবীন্দ্রনাথ বুঝে নিয়েছিলেন যে চল্‌তি ট্র্যাজেডির ধারণা তাঁর আপন জগৎ নয়। কিন্তু সে-জগৎ থেকে ফিরে দাঁড়াবার পথ ব্রেখ্‌টের যেমন, রবীন্দ্রনাথের তেমন না। 'রক্তকরবী' বা এমন-কী 'মুক্তধারা'তেও কখনো মনে হতে পারে যে এপিক ধরনে এখানে মণ্টাজের ব্যবহার যেন কিছু আসছে, ভিন্ন ভিন্ন টুকরোর একত্রগ্রন্থন — তা সত্ত্বেও, সাধারণভাবে বলতে গেলে, নাট্যবিষয়কে ক্রমাবর্তনে গড়ে তুলবার পুরোনো পদ্ধতিটিকেও রবীন্দ্রনাথ একেবারে ছাড়েন না। তাকে আনেন হয়তো অনেকটা কাব্যময়তায়, অনেকটা ভিতরমুখী করে, এই মাত্র। ন্যাচারালিজ্‌মের দৌরাত্ম্য থেকে সরিয়ে নেবার ইচ্ছেয় এঁরা দু-জন সদৃশ, কিন্তু সরিয়ে নেবার জন্য ব্রেখ্‌ট যেমন এম্‌প্যাথি-বিমুখ হতে পারতেন, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেটা সম্ভবপর ছিল না।

ব্রেখ্‌ট নিজে অবশ্য পরবর্তী জীবনে আক্ষেপ করেছিলেন এই বলে যে তাঁর কোনো কোনো কথা তিনি আর ফিরিয়ে নিতে পারছেন না। যেন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর এলিয়েনেশন-তত্ত্বকে একটু ভুল ব্যাখ্যায় টেনে নেওয়া হচ্ছে অনেকদূর। তাহলেও অভিনেতা এবং দর্শক যে নাটকের চরিত্রাবলিকে অনেকটা বিচারের ভঙ্গিতে দেখবেন, এইটে তাঁর রচনার প্রাথমিক শর্ত। এই বিচারের ফলে অভিনয়ের কোনো যে চাপ তৈরি হবে না এ-ধারণা ভুল। আবার এ-বিচার কেবল এই নয় যে অভিনয়কালে সংযত করতে হবে আবেগ। সে তো বলেছিলেন শিশির ভাদুড়িও; আবেগবিহ্বল হলে কেমনভাবে তিনি জানবেন ঠিকমতো আলো পাচ্ছে কি না মুখ, অথবা সহ-অভিনেতারা কোনোরকমে বিপন্ন হচ্ছেন কি না। এ তো বুদ্ধিমান অভিনেতা মাত্রেরই কাছে স্বাভাবিক দাবি। কিন্তু চরিত্রটিকে নিজের দিক থেকেই অনেকটা বস্তুগত দূরত্বে রেখে যে-নৈর্ব্যক্তিকতার সঞ্চার, অভিনয়-মুহূর্তেই চরিত্রটিকে সমালোচনা করবার যে-ভঙ্গি, সে হলো আরেক জিনিস। এই নৈর্ব্যক্তিক সমালোচনায় পৌঁছনো কোনো দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়ের অন্তর্গত ছিল না।

ভেবে দেখুন 'রক্তকরবী'র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ। নন্দিনী এবং অপরাপর চরিত্র যে একই সঙ্গে ব্যক্তিগত মানুষের এবং মানুষগত শ্রেণীর,

এ-কথাটা মনে করিয়ে দেন কবি নিজেই। তবু তিনি দর্শকদের বলেন : 'শ্রেণীর কথাটা ভুলে যান, এইটে মনে রাখুন রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি'। তাঁর পরামর্শ 'যেটা গূঢ় তাকে প্রকাশ্য করলেই তার সার্থকতা চলে যায়'। এইসব জ্ঞাপনে দর্শককে অনুভূতির জগতে মিলিয়ে নেবার আগ্রহই আছে, আবেগের দিক থেকেই তাকে টান দেবার অভিপ্রায়; এবং ঠিক এই কারণেই এ-দুই ভিন্ন নাট্যকারের সংগীতব্যবহারকে এক মানে বিচার করা অসংগত হয়ে দাঁড়ায়, রবীন্দ্রনাটকে গীতপ্রয়োগের সার্থকতা-ব্যর্থতার ভাবনা আসে সম্পূর্ণ অন্য পথে। ব্রেখ্‌ট যে-মুহূর্তে নাটকে নিয়ে আসেন গান, তখনই তাঁর দাবি থাকে সে-বিষয়ে সতর্ক অভিনিবেশের; অন্য একটি স্তরের যে সঞ্চার হলো সেটা স্পষ্টতই বুঝিয়ে দেওয়া চাই। প্রাত্যহিক ভাষা, প্রগাঢ় ভাষা আর গান—এই ত্রিস্তর যেন সব সময়েই থাকে পরস্পর-ভিন্ন, কখনোই যেন একটির স্বাভাবিক ক্রম হিসেবে না দেখা দেয় আরেকটি, যেন কখনোই গানের ব্যবহার এমন না হয় যে মনে হতে পারে আবেগ-প্রবলতার ফলে এখানে কথা তার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছে, 'থ্রি-পেনি অপেরা'য় এই ছিল ব্রেখ্‌টীয় নির্দেশ। রবীন্দ্রনাথে, আমরা জানি, এর বিপরীত ইচ্ছাই বহমান। তাঁর নাটকে 'plain speech' অজ্ঞাতে কখন 'heightened speech'-এ গড়িয়ে যায় এবং তা আবেগনিবিড় উচ্চারণ পায় গানের মধ্যে। তাই ঠাকুর্দা বা ধনঞ্জয় যখন গান ধরেন সে তো হয়ে ওঠে সংলাপেরই বিকাশ, তাকে আমরা দেখতে পাই না স্বতন্ত্র কোনো অভিজ্ঞতায়। ফলে আধুনিক মননস্বভাবমণ্ডিত কোনো নাট্যদল যদি এই সব চরিত্রকে ভাববিহ্বল আত্মহারা রূপে দেখান তো অভিযোগের কারণ ঘটে না, সেইটেকেই বরং সংগত বলে ভাবা যায়।

অর্থাৎ দেশীয় স্বভাবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নাট্যমুক্তির যে নির্দেশ রেখেছিলেন তা ব্রেখ্‌টীয় অর্থে মুক্তি নয়। দুই চরিত্রের বাসনা এবং অভিজ্ঞতার স্পষ্ট প্রভেদ লক্ষ না করে কোনো কোনো উপরতলের সাদৃশ্যে আমরা তাঁদের সমীকরণ করতে পারি না। আবার এ-ও ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ থেকেই ব্রেখ্‌টে পৌঁছবার একটি পথ আছে কোথাও, যদিও তা সহজ কোনো রাজপথ নয়। বাংলা নাটক আজ হয়তো এই পথটির আবিষ্কারে উন্মুখ হতে পারে।

এ-আবিষ্কারের অর্থ এই নয় যে, ব্রেখ্‌ট বা অনুরূপ কোনো পশ্চিমি ভঙ্গিমাকে সমূলে তুলে আনতে চাইব আমাদের ব্যবহারে। তা যদি করি তবে সে-টবের গাছ শৌখিন চর্চার চেয়ে বেশি কোনো প্রাণের ইঙ্গিত দেবে বলে মনে হয় না।

এমন করতে গেলে আমরা সেই ভুলই করব, যে-প্রমাদে ডুবেছিলেন উনিশ শতকের 'সাম্প্রতিকে'রা। তাঁরা হয়তো সমকালীন ইবসেনকে গণ্য না করে বরণ করছিলেন অতীত দিনের শেক্সপীয়র রাসিন বা মলিয়েরকে, আর আমাদের হয়তো গৌরব হবে এইটুকু যে আমরা ধরছি নিত্যনূতন তাজা সমকাল, ইওনেস্কো ওয়েস্কার বা অসবোর্ন, কিংবা সাময়িকীর পৃষ্ঠা থেকে ক্রমে আরো সব উত্তেজক নাম। এর ফলে যে আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়বে না কিছু, তা নয়। কিন্তু এমনি অভিজ্ঞতার কথা যদি বলি, সে-বিষয়ে গিরিশচন্দ্রেরাই কি কম ছিলেন কিছু? এর মধ্য দিয়ে আমরা যা পাব না তা হলো বেঁচে থাকবার নিজস্ব কোনো কাঠামো, পাব না কোনো প্রবাহ রচনা করবার স্ফূর্ত প্রবলতা। মনে রাখতে হবে যে অ্যাবসার্ডের প্রবক্তা ইওনেস্কোদেরও আজ ভাবতে হচ্ছে ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ তৈরির সমস্যা। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক নাট্যচর্চা যখন আরো একবার দিশেহারা হচ্ছে বলে মনে হয়, তখন এই বিপন্নতার সামনে একবার তদ্গতভাবে লক্ষ করা ভালো রবীন্দ্রনাথ কী করতে চেয়েছিলেন, জাতীয় জীবনের স্মৃতির মধ্যে কীভাবে তিনি জড়িয়ে নিয়েছিলেন তাঁর নাট্যগঠনকে, বিষয় এবং বিন্যাসের সমন্বয়ে কেমন করে তিনি পাচ্ছিলেন এক দেশীয় নাট্যধরন। কেবল দেশের মধ্যে নিহিত থাকবার জড়তা নয়, কেবল কালের মধ্যে মুক্ত হবার উন্মার্গতা নয়। যোগ্য শিল্পে খুঁজে নিতে হয় এ-দুয়ের মধ্যে যাওয়া-আসার সহজ কোনো প্রণালী, কালের মধ্যেই দেশের সত্তাকে প্রবাহিত করে নেবার ধরন। এক-লাইনের এক কবিতায় লিখেছিলেন স্পেনীয় কবি হিমেনেথ, 'ডানা আর শিকড় : শিকড়ের ডানা হোক, ডানার শিকড়'। কালস্বভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে পালটে নিচ্ছিলেন তাঁর নাট্যরীতি, সে-রীতিও সব সময়ে ভিতরে রেখে দিয়েছিল এই দাবি : শিকড়ের ডানা হোক, ডানার শিকড়। এরই তাৎপর্যের বোধ আমাদের মধ্যে এলে লোকপুরাণের সজীব স্পর্শ আমাদের নাটকে আরেকবার লাগবে এবং একমাত্র তখনই রবীন্দ্রনাথের নাট্যচর্চার একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রস্তুত হতে পারবে এ-দেশে।

১৯৬৬

নাচ গান নাটক

সোফোক্লেসের একটি নাটকে নির্বাসিত ঈডিপাসের সঙ্গে গ্রামজনতার কথা চলছিল এইরকম :

> প্রথমে ঐ অঝোর ঝরনা থেকে শুদ্ধ অঞ্জলিতে নিয়ে এসো পুণ্য জল। নিপুণ শিল্পীদের তৈরি পাত্রগুলিকে সাজিয়ে দাও মেষশাবকের রোমে। উষার দিকে মুখ রেখে জলের অঞ্জলি দাও তিনবার। নিঃশেষ করো শেষ পাত্রটিকে, ভরে নাও জলে আর মধুতে।
>
> তারপর দু-হাতে সাতাশটি জলপাই-পল্লব রেখে প্রার্থনা করো। প্রার্থনা করো : করুণাময়ী বলে যাঁদের ডাকি আমরা, তাঁরা যেন করুণাবশে আমাদের রক্ষা করেন।

শুনে আমাদের মনে পড়তে পারে খুবই ভিন্ন ধরনের আরেক নাটকের প্রসঙ্গ। 'কলোনাসে ঈডিপাস' থেকে অনেক দূরের ব্যাপার রবীন্দ্রনাথের 'শারদোৎসব', কিন্তু প্রায় যেন অনুরূপ স্পন্দে বলতে থাকেন ছদ্মবেশী সম্রাট :

> ওই কাশবন থেকে কাশ তুলে নিয়ে এসো। আঁচল ভরে ধানের মঞ্জরী আনতে হবে। আর, তোমরা আজ শিউলিফুলের মালা গেঁথে ওইখানে ফেলে রেখে গেছ, সেগুলো নিয়ে এসো।…
>
> এবার অর্ঘ্য সাজানো যাক…একবার পূর্ব আকাশে দাঁড়িয়ে বেদমন্ত্র পড়ে নিই।…
>
> এবার সকলে মিলে তোমাদের শারদোৎসবের আবাহন-গানটি গাইতে গাইতে বনপথ প্রদক্ষিণ করে এসো। ঠাকুর্দা, তুমি গানটি ধরিয়ে দাও। তোমাদের উৎসবের গানে বনলক্ষ্মীদের জাগিয়ে দিতে হবে।

আমরা নিশ্চয় মনে রাখছি যে এ-অংশদুটির প্রভেদও বড়ো সামান্য নয়। ভয়ংকরী পাতালদেবী এউমেনাইদেসকে প্রীত করবার আয়োজন আর শ্রীময়ী

এই প্রাকৃতিক সত্তার অর্চনা এক নিশ্বাসে তুলনীয় হতে পারে না। তাহলেও অনেকটা যেন সমীপবর্তী এই দুই আবাহনভঙ্গি, আর এ-ভঙ্গি, আমাদের মনে করিয়ে দেয় নাটকের অন্তঃস্থিত অন্য এক কাঠামোর কথা। 'কলোনাসে ঈডিপাস'কে বলা হয়েছে প্রায় যেন এক ধর্মকবিতা। ভালোবাসায়, ক্ষমায়, এমন-কী নিসর্গসৌন্দর্যের উত্তেজনায় এর মধ্যে প্রকাশ পেতে থাকে মানবভাগ্যের অদৃশ্য দিগ্‌বলয়। সেই অর্থে 'শারদোৎসব'ও কি নয় একরকমের ধর্মাচার? কোনো আনুষ্ঠানিক আচারধর্ম নয়, তবু এর সমস্ত গড়নটার মধ্যেই থেকে যায় যেন এক ব্রতগানের বিন্যাস।

এই যে শরৎ-ঋতুর অভ্যর্থনা করছেন বালকবেষ্টিত সম্রাট, তাকে কেবল অলীক কবিকল্পনা ভাবলে ভুল হবে। এক-একটি ঋতুকে জীবনের লাবণ্য হিসেবে সঞ্চিত করে নেবার পালা আছে আমাদের ব্রতগুলিরও মধ্যে, যেমন ভাদুলির ব্রতে দেখি শরতের উৎসব, যেমন শীতের কুয়াশা থেকে বসন্তকে উন্মোচন করে নেবার উৎসব আছে মাঘমণ্ডল ব্রতে। এসব ব্রতের গভীরে প্রচ্ছন্ন আছে পৃথিবীকে শস্যময়ী দেখবার কামকামনা, অথবা সুফলা ধরণীর প্রতি কৃতজ্ঞতার এক যৌথ নিবেদন। এই নিবেদনে আবার মিলে যায় শিল্পসৃষ্টিরও আবেগ। আর, আমাদের 'শারদোৎসব'ও কি এক হিসেবে তাই নয়? নবীনধানের মঞ্জরী দিয়ে ডালা সাজাবার আনন্দ এখানে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ওঠে, প্রকৃতি যে নিজেকে সম্পূর্ণ উদ্গত করে দিচ্ছে ফলেফসলে তারই মধ্যে সম্রাট দেখেন সৌন্দর্যের সারাৎসার। সন্দেহ নেই যে মূল ব্রত-ভাবনা থেকে অনেকটা শীলিত আধুনিকতায় সরিয়ে নেওয়া হলো বিষয়টিকে, সে তো হবারই কথা। কিন্তু তবু লক্ষেশ্বরের দিনযাপনের আসক্তিতে, উপনন্দের ঋণযাপনের কৃচ্ছ্রতায়, বিজয়াদিত্যের পুত্রলাভের প্রতীক্ষায় আর বালকদলের ছুটির পৃথিবীতে মিশে যাবার খেয়ালখুশিতে 'শারদোৎসব'ও হয়ে ওঠে যেন এক আধুনিক ব্রতকথা। আমরা স্পষ্টই শুনি যে এখানকার রাজ্যে প্রথম বৃষ্টির পর বীজ বুনবার আগে একটা মহোৎসব হয়, চাষি গৃহস্থেরা বনে গিয়ে মেতে ওঠে সীতার পূজা আর বনভোজনে।

আরেক দিক থেকেও দুয়ের মধ্যে গড়নের সাদৃশ্য বুঝে নেওয়া সম্ভব। লোক-ব্রতগুলির মধ্যে কেমনভাবে গড়ে উঠছে এক নাটক, 'বাংলার ব্রত' বইতে অবনীন্দ্রনাথ তা বিশ্লেষণ করে দেখান। 'এটাকে একটা মহানাটক বলা চলে না, কিন্তু নাট্যকলার অঙ্কুর যে এখানে দেখছি সেটা নিশ্চয়।' এই নাটক চলছে

চরিত্রে, কাহিনীর ক্রমিকতায় ; তার উপায় হচ্ছে ছড়া, গান। জনজীবন থেকে সহজে উঠে আসে বলে কখন যে ছড়াগানে মিলেমিশে যায় এসব শিল্পে, তা আমরা আর লক্ষ করি না, ব্রতকথা অনায়াসে হয়ে ওঠে ব্রতগান।

রবীন্দ্রনাটক প্রসঙ্গে তাহলে মনে রাখতে হবে ছড়াগানে ভরাট উৎসের এই স্মৃতি, মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের গড়ন আবিষ্কার করে নিতে চেয়েছিলেন এই বিশেষ দৈশিক গড়ন থেকেই। এই আবিষ্কারের জন্য তাঁকে অবশ্য প্রতীক্ষা করতে হলো দীর্ঘ সময়। এটা আকস্মিক নয় যে 'শারদোৎসব' রচনার আগে পুরো এক যুগ তিনি বন্ধই রেখেছিলেন নাটকরচনা, 'চিত্রাঙ্গদা'-'মালিনী'র পর যেন তিনি বুঝে নিচ্ছিলেন কোথায় আমাদের আপন চেহারা ধরা আছে। 'চিরপীড়িত ধৈর্যশীল স্বজনবৎসল' যে-মানুষগুলির ছবি রবীন্দ্রনাথ দেখতে চেয়েছিলেন সাহিত্যসংসারে, তার শিকড় খুঁজে নেবারই ব্যাপক আয়োজন চলছিল তাঁর পদ্মাপারের জীবনে। ক্রমে রচিত হলো উত্তেজক আত্মদীক্ষাময় 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ, মেলা অথবা যাত্রাকে তিনি ঘোষণা করলেন আমাদের একেবারেই নিজস্ব শিল্প হিসেবে, বাউলবৈরাগীদের জীবনধরনের নিকট-সাহচর্য পেলেন তিনি। এই সবের মধ্য থেকে উঠে এল যে-শিল্পের ধারণা সেখানে কোনো বিদেশি নাটকের পুরোনো বা চল্‌তি চাল সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব ছিল না, তাঁকে গড়ে নিতে হলো মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত আরেক নাট্যবিন্যাস। এই বিন্যাসের মধ্যে রেখে দেখলে বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের নাটক গড়েই নিতে চেয়েছে এক সাংগীতিক কাঠামো, তাঁর নাটকে গানের বিচার প্রসঙ্গে তাই বৈদেশিক নাটক বিচারের মান আর ব্যবহার্য থাকে না। কেন আমাদের নাটকে গান আসবে তার স্বভাব থেকেই, সে-বিষয়ে নিজেই তিনি লেখেন শেষ পর্যন্ত, ১৩৪২ সালে :

> তাই আজও দেখতে পাই বাংলা সাহিত্যে গান যখন-তখন যেখানে-সেখানে অনাহূত অনধিকারপ্রবেশ করতে কুণ্ঠিত হয় না। এতে অন্যদেশীয় অলংকারশাস্ত্রসম্মত রীতিভঙ্গ হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের রীতি আমাদেরই স্বভাবসংগত। তাকে ভর্ৎসনা করি কোন্ প্রাণে ? সেদিন আমাদের নটরাজ শিশির ভাদুড়ী মশায় কোনো শোকাবহ অতি গম্ভীর নাটকের জন্য আমার কাছে গান ফর্মাশ করে বসলেন। কোনো বিলাতী নাট্যেশ্বর এমন প্রস্তাব মুখে আনতেন না, মনে করতেন এটা নাট্যকলার মাঝখানে একটা অভ্যুৎপাত। এখনকার

ইংরেজি-পোড়োরাও হয়তো এরকম অনিয়মে তর্জনী তুলবেন। আমি তা করি নে, আমি বলি আমাদের আদর্শ আমাদের নিজের মন আপন আনন্দের তাগিদে স্বভাবতই সৃষ্টি করবে। সেই সৃষ্টিতে কলাতত্ত্বের সংযম এবং ছন্দ বাঁচিয়ে চলতে হবে, কিন্তু তার চেহারা যদি সাহেবী ছাঁচের না হয় তবে তাকে পিটিয়ে বদল করতে হবে এ কথা বলতে পারব না। বিদেশী অলংকারশাস্ত্র পড়বার বহু পূর্ব থেকে আমাদের নাট্য, যাকে আমরা যাত্রা বলি, সে তো গানের সুরেই ঢালা।

তাহলে 'গানের সুরে ঢালা' এই কাঠামো থেকে সহজেই উঠে আসে গান। যে-অর্থে গিরিশচন্দ্রেরা একেবারেই এক ভিন্ন গড়নের মধ্যে মাঝে মাঝে ব্যবহার করতেন গান, দর্শকজনের স্বস্তিবিধানের জন্য, যাত্রার সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য —রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ সে-অর্থে নয়। তেমনি আবার আছে জীবনের নির্যাস হিসেবেই গানকে বুঝে নেবার একটা ইচ্ছে। গান তো নিছক শিল্প-অলংকারই নয়, একে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন আমাদের এক সম্পূর্ণতার প্রকাশ। পাখি যে গান গায় সে কেবল বিধিদত্ত শক্তির খেলা, কিন্তু মানুষের গান হলো নিজেকে রচনা করে তুলবার শক্তি, নিজস্ব অন্তরতমকে প্রকাশ করতে পারবার আনন্দ। আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাস অবশ্য রুদ্ধ করে দিতে চায় আত্মরচনাশীল সে আনন্দকে, মহাপঞ্চকের দল থেকে-থেকেই বিরক্ত ধিক্কারে বলে ওঠে : 'গান! অচলায়তনে গান!' 'রক্তকরবী'র রাজার মতো এ-সমাজেরও বুকের ভিতরে বুড়ো ব্যাঙটা টিঁকে আছে সকল সুরের ছোঁয়া বাঁচিয়ে। এখানে গান নেই এমন নয়, কিন্তু কেজো লোকের এই সংসারে সংগীতও শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠছে এক বাণিজ্যিক বিনিময় মাত্র, অতি-অভ্যস্ত জীবনযাপনেরই আরেকটা জড় অংশ। ছন্দোময় মানবস্বভাব আপনি প্রকাশ পায় যে গানে, যান্ত্রিক দিনক্ষয়ের মধ্যে শেষ পর্যন্ত তাকে আর খুঁজে পাওয়া শক্ত। অথচ সেইটেকেই রবীন্দ্রনাথ ভাবছিলেন আমাদের সামাজিক জীবনের সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন, যেমন অজিতকুমার চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে লিখছেন তিনি : 'শান্তিনিকেতনে বাইরের প্রান্তরশ্রী যেমন অগোচরে ছেলেদের মনকে তৈরি করে তোলে, তেমনি গানও জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলবার একটা প্রধান উপাদান। এতে করে ওদের জীবনের প্রাচীরের একটা বড়ো জানলা খুলে দেওয়া হচ্ছে।'

সেইজন্যেই যক্ষপুরীতে যন্ত্রদানবের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মস্ত এক অস্ত্র হতে পারে রঞ্জনের ভাঙা সারেঙ্গি। মোড়লদের মুখের উপর তুড়ি মেরে রঞ্জন জানায় যে

কাজের রশি খুলে যাবে যদি কোদালের বদলে মাদল পাওয়া যায় হাতে, কেননা কাজ আর ছন্দ তার কাছে অভেদ সম্পর্কে বাঁধা। শ্রম এবং সংগীতের পরস্পর-সাপেক্ষতা আজ হয়তো খানিকটা অস্পষ্ট লাগে, কিন্তু এখনো তো আমাদের অভিজ্ঞতার সামনে আছে বৈঠাবাওয়ার গান, ছাদপিটোনোর গান। 'রক্তকরবী'তে তাই পৌষের গান বেজে ওঠে কৃষকদের মাঠে, মাদলের তালে তালে কোদাল নাচে শ্রমিকদের হাতে। আমাদের চারপাশে নিত্য যেসব অকালমোড়লদের গম্ভীর মুখ দেখতে পাই তারাও নিশ্চয় এমন অবস্থায় গলা মিলিয়ে বলবেন, 'এ কেমন তোমার কাজের ধারা', কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র জীবনধারণায়, শান্তিনিকেতনের ব্যবহারিক শিক্ষাচর্চায় অথবা তাঁর রচনাবলির গূঢ়কোষে খুঁজে নেন কাজের সঙ্গে সুরের এই সহজ চলাচলের পথ। গীতিছন্দোময় এই পথকেই তিনি জানেন সত্যিকারের জীবনপন্থা। এই অর্থে, গান তাঁর নাটকের বিন্যাস মাত্র নয়, নাটকের বিষয়ও বটে।

২

কিন্তু 'শারদোৎসব'-এ এই যে কাঠামোকে এবং বিষয়কে ধরবার জন্য গানের ব্যবহার, অবিকল সে-অবয়বই বারবার ফিরে আসতে পারে না আর। কেননা শিল্পী স্বভাবতই তাঁর রচনাক্রমে আবো নবীন জটিলতা আত্মস্থ করে নিতে চাইবেন। 'শারদোৎসব'-এর বেলায় যেটা ছিল অনেকটাই স্পষ্ট প্রকাশ্য—পরবর্তী চর্চায় সেটা অনেক বেশি আড়াল হয়ে আসবে, এইটেই প্রত্যাশিত। অর্থাৎ 'রাজা' বা 'মুক্তধারা'য় ঐ একই মর্ম হয়তো আমরা লক্ষ করতে পারব, কিন্তু সেটা জারিত হয়ে থাকবে সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে, তাকে ধরা যাবে কেবল স্ফুরিত ইঙ্গিতে, একেবারে স্বতন্ত্রভাবে তাকে চিহ্নিত করে দেখানো মুশকিল। তখন আমাদের মনে পড়ে যে, প্রায় কুড়ি বছর বয়স থেকেই নাটকচর্চার যে-ধরন তৈরি হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের হাতে, অল্প এগিয়েই তা স্খলিত হয়ে পড়ল বটে, কিন্তু তবু তার অভিজ্ঞতা কাজে লাগল উত্তরজীবনে পৌঁছে। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র মতো অপেরার সৃষ্টি থেকেই যে 'নাটক'কে ধরবার ইচ্ছে ছিল তাঁর, যা আরো প্রকট হলো 'রাজা ও রানী' বা 'বিসর্জন'-এ, সেই 'নাটক'কেও তিনি মেলাতে চাইলেন 'শারদোৎসব'-এর শিক্ষার সঙ্গে। হয়তো সেই কারণেই একবার খুব দুর্বল চেহারার 'প্রায়শ্চিত্ত'ও লিখতে হলো। দুর্বল, প্রথানুগত। কিন্তু তাহলেও তার মধ্যে এল ধনঞ্জয় বৈরাগী আর তাঁর দলবল। রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত সাংগীতিক

কাঠামো এখানে একেবারেই আলগা হয়ে আছে নাট্যকাঠামো থেকে। এরপর থেকে রবীন্দ্রনাটকের সাধনা চলবে এ-দুয়ের জোড় মিলিয়ে দেবার চেষ্টায়, আর তার ওপরই নির্ভর করবে নাটকে সংগীত-প্রয়োগের সফলতা বিচার।

'বাল্মীকিপ্রতিভা' থেকে শুরু হয়েছিল নাটকে-গানে সম্পৃক্ত করবার অভ্যাস, এর লক্ষ্য ছিল 'গানের সূত্রে নাট্যের মালা' হয়ে ওঠা। কিন্তু গানের মধ্যে কীভাবে নাটক ধরবেন রবীন্দ্রনাথ? গান তাঁর কাছে লোকাতীতকে স্পর্শ করবার উপায়, গানের স্পন্দন যে আবেগ জন্মিয়ে দেয় 'সে কোনো সাংসারিক ঘটনামূলক আবেগ নয়'। বিশেষত প্রাচ্যপ্রতীচ্য সংগীতচর্চায় এই একটি বড়ো ভিন্নতা লক্ষ করেন তিনি যে 'য়ুরোপের সংগীত প্রকাণ্ড এবং প্রবল এবং বিচিত্র, মানুষের বিজয়রথের উপর থেকে বেজে উঠছে' কিন্তু 'কোনো একটা বিশেষ উদ্দীপনা—যেমন যুদ্ধের সময়ে সৈনিকদের মনকে রণোৎসাহে উত্তেজিত করা,—আমাদের সংগীতের ব্যবহারে দেখা যায় না।' আলাপচারি প্রসঙ্গে আইন-স্টাইনকে তিনি জানিয়েছিলেন যে আমাদের গান অনেক লিরিক্যাল, কিন্তু ইওরোপীয় গান যেন মহাকাব্যিক ব্যাপকতা নিয়ে ভরে ওঠে, যেন গথিক তার গড়ন। রোমাঁ রলাঁকে যদিও তিনি বলেছেন 'বীটোফেন আর বাখ আমার প্রিয়,' তাহলেও সন্দিগ্ধ এই প্রশ্ন তুলছেন পরের মুহূর্তে: 'কোনো কোনো আবেগকেই রূপ দেবার চেষ্টা হয় পশ্চিমি সংগীতে। সেটা কি ভালো? সংগীতেরও কি উচিত নয় আবেগকে লক্ষ্য হিসেবে না রেখে উপাদান হিসেবেই গণ্য করা?'

বস্তুত, অনির্দেশ্যতার মধ্যেও পশ্চিমি সংগীতকলায় আবেগপুঞ্জের এমন প্রতি-ঘাত চলতে থাকে যে তার মধ্যেই গড়ে ওঠে অন্তর্লীন এক নাট্যদেহ। বীটো-ফেনের নবম সিম্ফনি যখন অন্তিম চলনে সহসা উত্তাল কণ্ঠস্বরে বিস্ফারিত হয়ে পড়ে, বলে ওঠে 'আর এ বিষাদ নয়, এসো আমরা স্বর মেলাই আনন্দের ধ্বনিতে', আমাদের মতো অদীক্ষিত শ্রোতাও তখন তার তুমুল আলোড়ন খানিকটা টের পায়। আমরাও অনেকটা ধরতে পারি কেন জর্জ টমসন এই 'কোরাল সিম্ফনি'র সঙ্গেই উল্লেখ করতে চান শেলির 'মুক্ত প্রমেথিউস'-এর প্রসঙ্গ, কীভাবে এর পট-ভূমিতে দেখতে পান ফরাসি বিপ্লবের আগুন। অথবা উদ্গীর্ণ এই কণ্ঠস্বরের আগেও এর যন্ত্রঝংকারের মধ্যে কেমনভাবে আনন্দবিষাদের চকিত মন্থন চলছিল, চলছিল নাটক, তার একটা পরিচয় ধরা আছে স্থাগ্‌নারের অন্তর্দর্শী বিশ্লেষণে। এর চারটি পৃথক চলনের সঙ্গে অনায়াসেই তিনি সমান্তরাল সাজিয়ে দেখান

গ্যোয়টে-র নাটকের ভিন্ন ভিন্ন অংশ, দেখিয়ে দেন কোথায় 'নবম সিম্ফনি' আর 'ফাউস্ট' হয়ে উঠছে সদৃশ, যেন একই নাটক।

এই প্রবল নাটক ভারতীয় সংগীতের অন্তঃশীল পরিচয় নয়। হয়তো সেই উপলব্ধি থেকেই রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে ইওরোপীয় কণ্ঠসংগীত শুনে কিছু-বা কৌতুক বোধ করেছেন। মাডাম নীলসনের গানকে তাঁর মনে হয়েছিল পাখির অনুকরণ করবার হাস্যজনক চেষ্টা মাত্র, কেননা 'গান আর অভিনয় তো এক জিনিস নয়। অভিনয়কে যদি গানের সঙ্গে মিলিত করি তবে গানের বিশুদ্ধ শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়।'

১৯১২ সালের এই উচ্চারণ, অথচ এরই মধ্যে রচিত হয়ে গেছে 'রাজা' বা 'অচলায়তন'-এর মতো নাটক। একটু পৃথক অর্থে, অভিনয়কে গানের সঙ্গে মিলিত করে নেওয়া এখন তাঁর নিজেরই দায়িত্ব। তিনি তো নিছক শুদ্ধ শিল্প হিসেবে বিচ্ছিন্ন করে রখেতে চাননি নাটককে, যৌথ আয়োজনে এর অভিনয়ই প্রত্যাশা করেছিলেন। সেখানে নাটকের ব্যবহারিক বা সাংসারিক আবেগতাপের সঙ্গে কীভাবে মেলানো যাবে গানের বিশুদ্ধ শক্তিকে, সেটা নিশ্চয় তাঁর ভাববার বিষয়।

অবশ্য যতটা জোরের সঙ্গে ইওরোপীয় আর ভারতীয় গানের প্রভেদ দেখান তিনি, তাঁর সবটাই হয়তো তাঁর নিজের গান বিষয়ে তেমনভাবে গণ্য নয়। তার একটি কারণ যেমন এই যে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র কাল থেকে ইওরোপীয় প্রভাব রবীন্দ্রনাথের স্বরব্যবহারেও অল্পবিস্তর ধরা পড়ে, তেমনি আবার সত্যি যে বাংলা গান অনেক আগেই ভারতীয় সংগীতের প্রধান ধারা থেকে স্বাতন্ত্র্য পেয়েছিল তার কথার সামর্থ্যে। 'ছবি জিনিযটা অবনীর আর গান হচ্ছে গগনের' একথা বলবার মুহূর্তেই কবি মনে করিয়ে দেন যে 'কথা' হলো এ-দুয়ের মধ্যবর্তী, তার ভিতরে একই সঙ্গে বাঁধা পড়ে রেখা ও ধ্বনি, ছবি ও গান। এরই ফলে রবীন্দ্রনাথ দেখেন, যে-নাট্যরূপের আশ্রয় হয়নি হিন্দুস্থানি সংগীতে তা আছে কীর্তনে, পালাগানে; 'কীর্তনে জীবনের রসলীলার সঙ্গে সংগীতের রসলীলা ঘনিষ্ঠভাবে সম্মিলিত।...(কীর্তন) পরিবর্ত্যমান ক্রমিকতাকে কথায় ও সুরে মিলিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছিল।'

কেবল কীর্তনেই নয়, লোকসংগীতের এক সমৃদ্ধ অংশে আমরা চলমান জীবনেরই একটা কথাচিত্র ফুটে উঠতে দেখি, তার মধ্যে প্রবল নাট্যসংঘাত না থাকলেও অন্তত প্রত্যক্ষের বর্ণনাভঙ্গি আছে। আর এরই সংগত ব্যবহারের

মধ্য দিয়ে কীভাবে গড়ে উঠতে পারে নাটক তার একটা সাম্প্রতিক উদাহরণ পাই সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন' ছবিতে। এই ছবিটির উল্লেখ অন্য কারণেও এখানে প্রাসঙ্গিক মনে হয়, কেননা একদিকে যেমন এর বিষয়বৃত্ত থেকে কখনো কখনো মনে পড়ে 'রক্তকরবী'র জাল আর মাঠ, শক্তি আর শান্তির লড়াই, অন্যদিকে তেমনি এর গানে কথা-সুরের আরোপভঙ্গি মনে করিয়ে দেয় রাবীন্দ্রিক গীতিনাটকগুলিকে।

গানের এই নাটক মিলে যাবে রবীন্দ্রনাথের নাটকের গানে, আমাদের দেশীয় চরিত্রকেই করে নিতে হবে আধুনিকতায় বিন্যস্ত, দুই ভিন্ন কাঠামোর জোড় মিলে যাবে সংগতিময় ঐক্যে; এইটে ছিল প্রতীক্ষিত। কিন্তু এটা মানতে হয় যে অতঃপর সর্বত্র তা ঘটল না। 'শারদোৎসব'-এর মতোই না হলেও 'ফাল্গুনী'র মধ্যেও আছে একেবারে সরাসরি গানের অবলম্বন, গানের চাবি দিয়েই এর এক-একটি অঙ্কের দরজা খোলা হয়। কিন্তু 'রাজা' বা 'মুক্তধারা' বা 'রক্তকরবী' বিষয়ে তা আর বলা যায় না। এসব নাটকে ব্যবহৃত যে-কোনো গান কি নাট্যাভিনয়ে অনায়াসে প্রয়োগযোগ্য? অভিনয়ের সামগ্রিকতা স্থির রাখবার জন্য এসব গান নিয়ে পরিচালক কতটা বিব্রত হতে পারেন তার প্রমাণ আছে বহুরূপী সম্প্রদায়ের অভিনয়ে। নাটক থেকে কয়েকটি গান নির্বাচিত করে নিতে হয় তাঁদের, এবং সে-ও এক-এক রাত্রে এক-এক রকম, এমন-কী 'রাজা'য় কখনো-বা চলে আসে নাটকের বহির্ভূত কোনো গান। এই অস্থিরতা কেবল পরিচালকেরই নয়, রচয়িতারও। তিনিও ঠিক জানেন না কোন্ গান নাট্য-স্বভাবগত, কোন্‌টি-বা নিছক অলংকরণ। দুই কাঠামোর মধ্যে অনায়াস সামঞ্জস্য ঘটে যায়নি বলেই এমনটা হতে পারল। 'রাজা'য়—এমন-কী 'প্রায়শ্চিত্ত'র তুলনায় সম্পূর্ণ নবায়ত হয়েও 'মুক্তধারা'য়—সেই জোড়ের চিহ্নটা যেন স্পষ্ট দেখা যায়। গান এসব নাটকের চারিত্রদীপ্তি হয়েও বহুল ব্যবহারে ছড়ানো। এ-কথা বলবার সময়ে আমরা ভুলছি না যে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে এটাকে কেউ ভাবতে পারেন ইংরেজি-পোড়োদের ধরনে তর্জনী তোলা। কিন্তু আমরা এখানে যে অস্বস্তি বোধ করি সেটা 'সাহেবি ছাঁচের' অভাববশত নয়। 'সৃষ্টিতে কলাতত্ত্বের সংযম এবং ছন্দ' কতটা থাকছে, সেইটেই হয় সংশয়ের বিষয়। রবীন্দ্রনাটকে গান যে সব সময়েই সেই সংযম এবং ছন্দ স্থির রাখছে, তা আর আমরা বলতে পারি না।

৩

জোড় মিলিয়ে দেবার যোগ্য একটি আয়োজন দেখা দিল রবীন্দ্রনাথের অন্ত্যপর্বের নাটকচর্চায়, তাঁর নৃত্যনাট্যে। আপাতবিচারে এই রচনাগুলিকে মনে হতে পারে খানিকটা পিছিয়েই আসা। কেননা, প্রশ্ন হতে পারে, কুড়ি বছর বয়সের 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র সঙ্গে নূতন এই 'শ্যামা' 'চণ্ডালিকা'র প্রভেদ কি কেবল এইটুকুই নয় যে এখানে সময়ের গুণে সহজ হয়েছে গানের সঙ্গে নাচের সম্মিলন?

এমন-কী এইটুকু প্রভেদও যে তাৎপর্যে অনেক বড়ো, সেটা হয়তো ক্রমে বুঝতে পারব। কিন্তু তার আগে বুঝে নিতে হবে যে নিছক বিন্যাসের দিক থেকেও গীতিনাটক নৃত্যনাটক ঠিক একই জিনিস নয়। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' রচনার অন্যতম আদর্শ হিসেবে ছিল ইওরোপীয় অপেরার ধরন, এর অল্প আগেই তিনি ফিরে এসেছেন বিলিতি সমাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে। কোনো কোনো পর্যটকদলের কৃপায় অবশ্য বাংলাদেশে বসেই অপেরার স্বাদ পাওয়া সম্ভব ছিল তখনকার দিনে। অমৃতলাল বসু লিখছেন লিণ্ডসে স্ট্রিটের অপেরা হাউসের স্মৃতি, যেখানে সাহেবরা ইটালিয়ান অপেরাদলকে আহ্বান করে এনেছিলেন কয়েক বছরের জন্য। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে এর প্রভাব দেখা যাচ্ছে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র দু-চার বছর আগে থেকেই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' আর স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বসন্ত-উৎসব'-এর পথ দিয়ে এল 'বাল্মীকিপ্রতিভা', তিনটিরই সৃষ্টি বিদ্বজ্জনসমাগমের উৎসব উপলক্ষে।

অবশ্য 'বাল্মীকিপ্রতিভা' চল্‌তি অপেরার ধরন থেকে, অন্তত ইটালিয়ান অপেরার ভঙ্গি থেকে অনেকটাই স্বাতন্ত্র্যে গড়ে উঠেছিল। সেই বয়সে হার্বার্ট স্পেন্সারের ভাবনা যে রবীন্দ্রনাথের কত দূর প্রিয় ছিল, তাঁর রচনায় ছড়ানো আছে সে-প্রমাণ। কথার মধ্যে হৃদয়াবেগের সঞ্চার হলে আপনিই সেখানে কিছু-না-কিছু সুর লেগে যায়, স্পেন্সারের এই সূত্রের যেন প্রত্যক্ষ পরীক্ষা হলো 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য়। তাই এ-নাটক তাঁর কাছে আনন্দের ছিল সংগীতের মুক্তি হিসেবে, সুর সেখানে কথার বাহন মাত্র। হ্বাগ্‌নারের প্রাগ্‌বর্তী ইওরোপীয় অপেরায় কথার মূল্য ছিল গৌণ, সুরের স্ফূর্তিটাই সেখানে বড়ো। তাই হ্বাগ্‌নারের আবির্ভাবে দেখতে পাচ্ছি অপেরার যুগান্তর, তাঁর রচনায় সুরের চেয়ে কথা চলে এল পুরোভাগে। রবীন্দ্রনাথের মন সামঞ্জস্য খুঁজল হ্বাগ্‌নারীয় 'মিউজিক ড্রামা'তে, সুর যেখানে কথার অনুচর হতে পারে। 'কবিতা থাকবে সামনে, সুর হবে অনুগামী' অথবা 'সুর আর কথার বিবাহে কথাই পুরুষ আর

স্বর হলো নারী', হ্বাগ্‌নারের এইসব প্রিয় উক্তি হতে পারত রবীন্দ্রনাথেরও কথা।

তাই 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র বিন্যাস বিদ্রোহী হলেও তুলনায় সহজ, এবং পরবর্তী 'মায়ার খেলা'য় দেখা দিল একেবারে বিপরীত চাল। এ হলো 'নাট্যের সূত্রে গানের মালা'। সুরে-কথায় নাটকসৃষ্টির যে-পরীক্ষা কেবল শুরু হয়েছিল 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য়, এইখানে তা স্পষ্টই থমকে গেল। তাই অনেকদিন পরে যখন 'চিত্রাঙ্গদা'র গীতরূপ তৈরি হলো, তখন আমরা কৌতূহল বোধ করি পুরোনো পদ্ধতিটির পরিণতি খুঁজবার জন্য।

এখন, এই দীর্ঘ জীবনের প্রান্তে এসে, স্পেন্সারের ভাবনা একটু হয়তো দূরে সরে গেছে। এবং ভারতীয় রাগরাগিণী বিষয়ে তাঁর বক্তব্যও ঈষৎ পালটাল। ধূর্জটিপ্রসাদ-দিলীপকুমারদের সঙ্গে নিরর্গল তর্কপ্রবাহে এর ভিতরকার অন্য এক চরিত্রও তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, আর শান্তিদেব ঘোষ জানাচ্ছেন যে নৃত্য-পরিকল্পনা সঙ্গে ছিল বলে নৃত্যনাট্যগুলির গানে খানিকটা অনিবার্য হলো বাঁধা-ছন্দের ব্যবহার। এখানে আর বলা যায় না কথা সুরের অনুগামী অথবা সুর কথার, এখানে যেন কথা-সুর একটা সমান মর্যাদার প্রতিষ্ঠায় আকর্ষণ করে নিতে পারছে নাটক। এই 'চিত্রাঙ্গদা' 'চণ্ডালিকা' বা 'শ্যামা'র ঘনসংহত নাটকীয়তার তুলনায় যে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'কে মনে হয় অনেকটা গল্প বলে যাওয়া, বিবরণধর্মী, সেটাও লক্ষ করবার বিষয়। তেমনি লক্ষণীয়—আর এইটেই হয়তো বিন্যাসের দিক থেকে বড়ো কথা—যে, এই শেষ পর্বে রচনাগুলির সংলাপ এবং গান বেশ স্বতন্ত্র করেই সাজিয়ে নেওয়া যায়, যেমন নেওয়া যেতে পারত তাঁর 'রাজা' বা 'রাজা ও রানী'র মতো নাটকে। প্রভেদ কেবল এই যে ওইসব নাটকে সংলাপের অংশটা গদ্যে কিংবা পদ্যে আবৃত্তি করা চলছে, এখানে সেই আবৃত্তিতে লাগছে সুর, অভিনয়ে লাগছে নাচ। কেননা 'পায়ে চলার শিল্প যেমন নাচ, বাক্যের শিল্পরূপ তেমনি গান'। এই দুই শিল্পের একত্রমিলনের অভিজ্ঞতা নেই পুরোনো চর্চায়। আর, 'মায়ার খেলা'তে তো নয়ই, এমন-কী 'বাল্মীকিপ্রতিভা'তেও তেমন জোরালো হতে পারেনি দ্রুতগামী সংঘাতের ধরনটা।

নাটকের গান আর গানের নাটককে এইভাবে মিলিয়ে দিতে পারছে নাচ। ছোটো ছোটো নৃত্যের কল্পনা রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে অনেকদিন ধরেই রেখে-ছিলেন, 'ফাল্গুনী'র অভিনয়ে তিনি নেচেছিলেন নিজেই এবং আমাদের লোক-জীবনের সামীপ্যে থেকে নাচের আদর্শ এই দেশেই পেয়ে যাওয়া সম্ভব,—এসব

তথ্য মনে রেখেও বলতে হবে যে জাপানভ্রমণ বা জাভাযাত্রারই পরোক্ষ ফল হিসেবে রবীন্দ্রচর্চার এই নূতন শিল্পরূপটির আবির্ভাব হলো। 'এই প্রাচ্যজগতের পরিমিত শ্রীমণ্ডিত শিল্পপ্রকাশ বিষয়ে তিনি দিনলিপি বা চিঠিপত্রে কেবলই আগ্রহ দেখান, মনে হয় ওরই অবয়বে তিনি ব্যাপকভাবে একটা প্রাচ্য এবং ভারতীয় ধরন দেখে নিচ্ছেন। ইয়েটস অথবা এজরা পাউণ্ড যে জাপানি নো-নাটকের দিকে তাকাচ্ছিলেন, চীনা জাপানি কবিতার প্রতি উৎসুক হচ্ছিলেন, তার ভিতরে ছিল একটা নূতনত্বের উত্তেজনা, এমন-কী ধর্মনির্যাসময় প্রেরণা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই দেখা বস্তুত আত্ম-আবিষ্কারেরই একটা প্রক্রিয়া, পূর্বজগৎ থেকে তিনি নিয়ে ফিরলেন যেন ভারতীয় জগতেরই অন্তঃস্রোত। তাই তাঁর পঁচাত্তর বছর বয়সে যখন 'চিত্রাঙ্গদা'কে নাচে ঢেলে দেবার অনুরোধ জানালেন প্রতিমা দেবী, মুহূর্তমধ্যে জেগে উঠল গোটা উদ্যমটা। জাভায়-জাপানে যে-দেহভঙ্গির সংগীত তিনি জানতে পেরেছিলেন নৃত্যে, তার সমগ্র স্মৃতি ক্রিয়াবান্ হয়ে উঠল এইখানে।

অসম্ভব নয় যে কাবুকি-অভিনয়ের 'দেবায়সি' রীতিটিও তাঁর পছন্দ হয়েছিল। পশ্চিমি ব্যালে বা অপেরা যে-অর্কেস্ট্রার সহযোগ পায় তার অবস্থান মঞ্চের নিচে ; শ্রোতাদের সামনে হলেও খানিকটা যেন অগোচর। কিন্তু কাবুকি সহজেই তার বাজনদারদের তুলে নেয় মঞ্চেরই পাটাতনের ওপর, কেননা মায়াবিভ্রম রচনার কোনো অতিরিক্ত সতর্কতা তার নেই। রবীন্দ্র-প্রযোজনাতে এই রীতিটি এখন আমাদেরও মঞ্চপ্রচলিত আঙ্গিক। উপরন্তু কাবুকির নর্তক-অভিনেতা যেভাবে পাটাতনের সঙ্গে পায়ের নিরন্তর সংঘর্ষের জোরকে ব্যবহার করতে চান নাটকীয়তা সঞ্চারের উপায় হিসেবে, সেই শক্তির প্রকাশও রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির সামান্যলক্ষণ। এটা বিশেষভাবে গণ্য করবার বিষয় যে মণিপুরীর তুলনায় ক্রমেই তাঁর নৃত্যনাট্যে বাড়ছিল কথক বা কথাকলির প্রয়োগ।

এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে এসব নৃত্যনাট্যে আছে কোনো বাঁধা-নৃত্যের ব্যবস্থাপনা। রবীন্দ্রসংগীতের অনুরূপ কোনো রবীন্দ্রনৃত্যেরও যে ঘরানা নেই, সেটা ভাবতে হবে। অথবা হয়তো এইভাবে বলা যায় যে রবীন্দ্রনৃত্যের ঘরানা হচ্ছে নানা প্রদেশের নৃত্যভঙ্গির যথেচ্ছ সংকলন, যেখানে আঙ্গিকের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে ভাবের দাবি। তাই তাঁর নাটকে নৃত্যের চর্চা চলতে পারে নাটকের ভাবপ্রকাশের অনুকূল যে-কোনো আত্মস্ফূর্ত রীতিতে এবং তাঁর নিজের প্রযোজনা-তেই দেখি একই ভূমিকার নৃত্যাভিনয়ে কখনো আসে মণিপুরী, কখনো কথক,

কখনো এমন-কী রুশ লোকনৃত্য অথবা সিংহলের ক্যাণ্ডী নাচ। যেমন অনেক সময়ে যোগ্য গায়িকার সাহচর্য মিলছে বলে নাটকের অলংকরণ হিসেবেও তিনি প্রয়োগ করছেন গান,—এসব নাচের ব্যবহার তেমন নয়। অলংকরণের নাচ 'চিত্রাঙ্গদা'য় ছিল অল্পস্বল্প, কিন্তু অবশেষে তার বর্জনেরই পরামর্শ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, একে 'সমগ্রভাবে বাধাজনক' বলেই মনে হয়েছিল তাঁর। তাহলেও যে এক-এক-সময়ে সুযোগ-মতো এক-এক ধরনের নাচে তাঁর প্রশ্রয় থাকে, সে-তথ্য থেকে এই নাট্য-বিন্যাসেরই এক গূঢ় তাৎপর্য ধরতে পারি। বুঝতে পারি যে নাচকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশের এক অনিবার্য উপায় হিসেবে। পায়ের চলনে, হাতের মুদ্রায়, চোখ এবং মুখের সজীব সঞ্চালনে সমস্ত শরীর যার কাছে যে-ভঙ্গিতে জেগে উঠতে চায়, তাকে সেইভাবে সেই দিকেই মুক্ত করে দেওয়া সম্ভব বলে মনে হয়েছিল তাঁর। এরই অতিদূর পূর্ব-সূচনা ছিল 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র ক্ষীণ নৃত্যনির্দেশে, যার স্মৃতিতে ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী লেখেন '…গানের সঙ্গে ঢোলক বাজাতে বাজাতে নাচতে নাচতে রঙ্গমঞ্চে লাফানোকে কতকটা স্বাভাবিক আনন্দবিকাশের একটা ভঙ্গিমাত্র বলা যেতে পারে। তবে এইসব নাচের মধ্যেই বোধ হয় রবিকাকার পরবর্তী নৃত্যকলা-বিকাশের অঙ্কুর নিহিত।' ঠিকই তাই, এবং এই অর্থে রবীন্দ্রনাথের নাটকে নাচ অথবা গান হয়ে ওঠে চরিত্রের সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ। এই আনন্দময় আত্মপ্রকাশেই তাঁর নাটকের ঠাকুর্দা বা ধনঞ্জয় মেতে ওঠেন নাচ-গানে, আকাশের মেঘ দেখে নৃত্যে ভরে ওঠে পঞ্চক, এবং এই আত্মপ্রকাশের আবেগেই একদিন 'ফাল্গুনী'র অন্ধ বাউল একতারা হাতে তুলে নেচে নিয়েছিলেন মঞ্চে।

১৯৬৯

নাট্যমুহূর্ত ও ভাষার সন্ধান

'বাক্যের সৃষ্টির উপরে আমার সংশয় জন্মে গেছে' : এই কথা বলেছেন তিনি, যাঁকে আমরা বাক্‌পতি বলে জানি। অন্ত্যজীবনে এই সংশয়েরই কোনো অভিঘাত তাঁর চিত্রকলার জনক হয়েছিল কি না সে-কথা চিন্তার যোগ্য। কিন্তু যখন মনে পড়ে যে রবীন্দ্রনাথ উপরের ওই বাক্যটি ব্যবহার করেছিলেন তাঁর নৃত্যনাট্য প্রযোজনার সময়ে, আমাদের মনে তখন আরেকটি কৌতূহলও উন্মুখ হয়। বাক্যের শক্তিতে সংশয় করে নাটককে আবার যে তিনি গীতি-মাধ্যমিক রূপে রচনা করছেন, এর তাৎপর্য কী? গদ্য বা পদ্য নাটকের পক্ষে আর যথেষ্ট নয়, এই কি তিনি ভাবছিলেন? এতদিনের চর্চায় কোনো অসংগতি কি লক্ষ করলেন রবীন্দ্রনাথ? নাটকরচনায় ভাষার সন্ধান সমস্ত জীবন কীভাবে তাঁকে চালিত করছে, পদ্য গদ্য এবং গান এই তিন স্তরে তাঁর তিন যুগের নাটক বিন্যস্ত কেন, নাট্যমুহূর্তকে স্পর্শ করবার যোগ্য ভাষানির্মাণে কোন্ সংগ্রাম অতিক্রম করতে হচ্ছিল তাঁকে—এইসব জিজ্ঞাসা তখন আমাদের মনে জাগে।

১

ইবসেনের ব্যাপক প্রভাবের পর ইওরোপীয় নাট্যকলায় অবশেষে গদ্য ভাষার শালীন প্রতিপত্তি সম্ভব হলো। শ' এবং সিঙ (Synge) নিশ্চয় বিপরীত নাট্যাদর্শে বিশ্বাসী, কিন্তু সেই দুই আদর্শই গভীর আশ্রয় পেল গদ্য সংলাপে। বাস্তবকে স্পর্শ করবার আবেগে সিঙ জানিয়েছিলেন তাঁর নাটকে একটি-দুটি মাত্র শব্দ থাকতে পারে যা আয়র্ল্যাণ্ডের জনজীবনের মধ্যেই তিনি পাননি, যা তিনি শোনেননি তাঁর কৈশোরেই। আবার, কেবল বাস্তবতার অভিযান বলে মনে করা যায় না এই গদ্যসন্ধানকে, যখন দেখি মেটারলিঙ্ক তাঁর স্টাটিক ড্রামা বা স্থাণু নাটকে দূরের পরাজগৎকেও আকর্ষণ করে আনতে চান এরই

সাহায্যে। কিন্তু এইসব রচনার প্রায় সমকালে নাট্যভাষা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ নির্বাচন করে নিলেন পদ্য। কেন?

শেক্সপীয়রের আদর্শে ক্ষণস্থায়ী আশ্রয় এর একটা বড়ো কারণ হয়তো। ঠিক প্রথম সেই যুগে সমকালীন ইওরোপের রচনা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ থাকলেও আসক্তি খুব তীব্র দেখি না। বিশেষত ইবসেন প্রসঙ্গে, সিঙ-এর মতো, তাঁকেও মনে হয় বেশ সন্দিগ্ধ। ফলে গীতিনাটক থেকে মুক্ত হবার প্রাথমিক পদ্ধতি হিসেবে পুরোনো প্রথাকেই তিনি বরণ করলেন নাটকে, বরণ করে নিলেন শেক্সপীয়রকে এবং সেই সূত্রে খানিক-বা রোম্যান্টিক কবিকুলকেও। কবিতার চর্চায় শেলি-কীট্সের রচনায় যে মগ্নতা অর্জন করেছিলেন কবি, নাটকেও তা কিছু কণা ছড়িয়ে গেল হয়তো-বা। এই রোম্যান্টিক কবিদল অনেকটা যে অবসরযাপনের মতো ব্যবহার করছিলেন নাটককে, অথবা পরে টেনিসন-ব্রাউনিঙের নাট্যচর্চা—তারও কিছুদূর ছায়া দেখা গেল 'রাজা ও রানী' বা 'বিসর্জন'-এর ছড়িয়ে-পড়া বিন্যাসে।

সঙ্গে সঙ্গে এ-ও ভাববার যে সাধারণভাবে গদ্য সম্পর্কে তখনো পর্যন্ত কবি দ্বিধাচ্ছিন্ন। একদিকে 'প্রাচীন সাহিত্য'র সঞ্চারিণী রচনা অন্যদিকে বঙ্কিমের ঈষৎ-ধরন তাঁকে সেই গদ্য তখনো হাতে তুলে দেয়নি, যার দ্বারা বাস্তব ব্যবহার এবং শ্রীমণ্ডিত অন্তর্জগৎ একত্র মিলতে পারে। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' বা 'প্রফুল্ল'র ভাষা কেন রবীন্দ্র-সমর্থন পায়নি তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁর বরং আকর্ষণ বাংলাদেশের রূপকথার গদ্যে। আর এ-ও আমরা দেখি যে 'নৌকাডুবি' পর্যন্ত উপন্যাসের সংলাপেও ব্যবহৃত হচ্ছে সাধুরীতি। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' বা 'হাস্যকৌতুক'-এর কথা এখানে মনে পড়ে অবশ্য, কিন্তু মনে হয় যে পরিহাসিকতার নিরাপদ ভূমি ছেড়ে গদ্যকে এখনো রবীন্দ্রনাথ আনতে পারছেন না গূঢ়তর নাট্যপ্রয়োজনে।

পদ্যভাষাই এই সময়ে ব্যবহার করলেন তিনি, কিন্তু রচনার অভ্যন্তরীণ দিক থেকে তার কোনো অনিবার্যতা আজ আমরা বুঝতে পারি না। যে-কথা গদ্যেই বলা যেত তা গদ্যে বলাই ভালো, এলিয়টের এই সূত্রটি অনেকসময়ে মনে পড়ে 'রাজা ও রানী' বা 'বিসর্জন' প্রসঙ্গেও, মনে হয় যে কথাগুলির সঙ্গে অন্য কোনো দ্যুতিপ্রয়োগ এখানে সবসময়ে নাট্যকারের অভিপ্রায় নয় এবং অন্তত পদ্যের আঘাতে উক্ত দুই রচনায় অন্তরালবর্তী কোনো স্তর খুলে দেবার আয়োজন এখানে সর্বত্রই নেই। 'রাজা ও রানী' যখন 'তপতী'তে পরিণত হলো তাঁর প্রবীণ

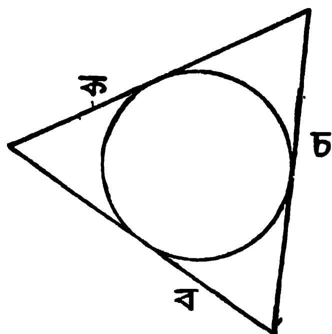
বয়সে, তখন এ-কথার এক পরোক্ষ প্রমাণ ধরা পড়ল। এবং 'বিসর্জন'-এর সঙ্গে 'রাজর্ষি' মিলিয়ে পড়লে কোনো-কোনো অংশে 'রাজর্ষি' ব্যাকুলতর করে বলে আমার বিশ্বাস। নির্জন অরণ্যগর্ভে গোবিন্দমাণিক্য যখন বলেছিলেন নক্ষত্র রায়কে 'কেন মারিবে ভাই, রাজ্যের লোভে?' সেই দীর্ঘ প্রগাঢ় উক্তি যে গম্-গমে ধ্বনি তৈরি করে সমস্ত কাহিনী আর চরিত্রপুঞ্জের চতুর্ভূমিতে, তার কতটাই-বা ধারণ করতে পারে 'বিসর্জন'-এর এই সংলাপ ?—

আমারে মারিবে তুমি ? বলো, সত্য বলো,
আমারে মারিবে ? এই কথা জাগিতেছে
হৃদয়ে তোমার নিশিদিন ? এই কথা
মনে নিয়ে মোর সাথে হাসিয়া বলেছ
কথা...

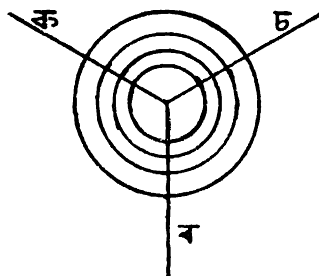
অথচ এই আপেক্ষিক গদ্যময়তার পাশে পাশেই আবার চলে আসে এক-রকমের কবিতা, নাট্যকারের অভীষ্টের পক্ষে যা তৃপ্তিজনক ছিল না। ধূর্জটি-প্রসাদ একসময়ে বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাট্যে পদ্যভাষা কখনো অকারণ কবিত্বের দ্বারা নির্জিত নয়, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। এ-কথাই বরং মনে হয় যে কবিতার সমস্যাই তাঁর এ যুগের নাট্যাবলির দুরূহতম সমস্যা। কবিতার সমস্যা অর্থে এ নয় যে রচনাগুলি আবছায়া অ্যাবস্ট্রাকশনের অনুগামী, বা যে-অর্থে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেন 'লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি', ঠিক সেই অর্থেও নয়। লিরিকের টানে 'রাজা ও রানী'তে ইলা-কুমার অসংগতরূপে প্রবেশ করেছে, কবির এই ধারণাকেও সংগত মনে হয় না। এদের 'প্রবেশ' কেবল লিরিকের টানেই নয়, এবং তা বাধাজনকও নয়। অন্তত পক্ষে এ তো আমরা দেখি যে শোধিত রচনা 'তপতী'তেও কুমার বর্জিত হতে পারল না এবং প্রবেশ করল একটি নূতন প্রেমিকযুগল, নরেশ-বিপাশা। বস্তুত 'রাজা ও রানী'তে অপরাধটা এই ঘটছে যে ইলা-কুমার উপাখ্যান প্রায় অভিমন্যুর মতো প্রবেশ করছে কাহিনীবৃত্তে, পথ পাচ্ছে না আর বেরিয়ে আসবার।

ফলে এসব রচনার সমস্যা ঠিক তত্ত্বে নয়, বিভিন্ন কয়েকটি চরিত্রে নয়। সমস্যা এই মনে হয় যে পদ্যভাষার সুযোগ নিয়ে অন্যায়রূপে কবিতাই আত্ম-প্রকাশ করতে চায় এ-যুগের অধিকাংশ চরিত্রে। অল্প বিশ্লেষণ করলে ধরা পড়ে যে এই নাটকগুলিতে প্রায় প্রতিটি মানুষ নিজস্ব গুরুত্ব অর্জনে উন্মুখ, নাট্যবৃত্তের যে-ভিতরকেন্দ্রে চরিত্রাবলির মুখ ঘুরিয়ে দেবার প্রয়োজন ছিল, অনেক

সময়ে তা সংগতরকমে ঘটে না এখানে   কথাটিকে একটু বিশদ করবার জন্য নিচের ছবিদুটিকে ব্যবহার করতে চাই।



[এক]



[দুই]

ক ব এবং চ যদি কোনো নাট্যকাহিনীর চরিত্র হয়, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-নাটকে এরা প্রায়ই প্রথম ছবির ধরনে মূল কাহিনীবৃত্তকে স্পর্শ করে থাকে, পরস্পরকেও স্পর্শ করে—কিন্তু তা যেন সেই বৃত্তের বাইরে। ফলে ঘটনা-চরিত্র এবং চরিত্র-চরিত্রের সংঘাতে প্রতিমুহূর্তে যে নাট্য-অভিঘাত সৃষ্ট হতে পারত, তার সম্ভাবনা হয়ে আসে ক্ষীণ। দ্বিতীয় ছবিতে চরিত্রগুলির অংশমাত্র দেখতে পাই বৃত্তের ভিতরে, বাকিটা ধরা পড়ে দূরাভাসে, আর এদের সঞ্চার কেন্দ্রমুখী বলেই চূড়ান্ত মুহূর্তে পৌঁছবার আগেও অনেকবার তারা ঢেউ তুলে দেয় বৃত্তের অন্তশ্চাঞ্চল্যে। 'রাজা ও রানী'তে এই সংঘাত-চঞ্চলতা যেন উপযুক্ত রকম গড়ে তুলতে পারেন না রবীন্দ্রনাথ।

তখন প্রশ্ন ওঠে, এমন কেন হলো? প্লটনির্মাণে তিনি পারংগম নন, এই বহুশ্রুত কথাটিকে যথেষ্ট সারবান্ বলে বোধ হয় না। অন্ততপক্ষে 'রাজা ও রানী' বা 'বিসর্জন'-এ কাহিনীর কী অভাব ছিল? এখানে সমস্যা দেখা দিচ্ছে কাহিনীর নয়, চরিত্রের, এবং চরিত্রগুলি এই যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার প্রবণতায় কিছু-পরিমাণে উৎকেন্দ্র হয়ে পড়ছে, কবিতার প্রবেশই তার একটা বড়ো কারণ।

কী অর্থে কবিতার প্রবেশ? লক্ষ করলে দেখতে পাব এই কালপরিবেশের মধ্যে রচিত অনেক চরিত্রই আত্মকথনে ব্যাপৃত এবং স্মৃতিচারণ এই নাট্যাবলির এক সামান্যলক্ষণ। বিক্রম-সুমিত্রা তো বটেই, এমন-কী শংকর বা দেবদত্তও সেই স্মৃতির আবেগ প্রকাশ করবার সুযোগ সহজে ছাড়ে না। প্রতিটি ব্যক্তির

এই নিজস্ব স্মৃতিচিন্তা, আত্মপ্রক্ষেপের এই অর্গলহীন স্বাধীনতা লিরিকের একটি গুণ নিশ্চয়, কিন্তু নাটকের পক্ষে তা কতটা ব্যবহার্য? এই অর্থেই লিরিকের প্রবেশ রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যের পক্ষে ক্ষতিজনক হয়ে দাঁড়ায়।

এই আত্মপ্রক্ষেপ, দীর্ঘবিস্তার বর্ণনাবলি এবং স্বগতকথন যে রচয়িতার পক্ষেও সর্বৈব সুখের ছিল না তার একটা প্রমাণ নাটকগুলির ইংরেজি অনুবাদে, অন্য প্রমাণ পরবর্তী নাট্যচর্চায়। ইংরেজি অনুবাদে 'বিসর্জন' মূলের প্রায় অর্ধেক, 'রাজা ও রানী' এমন-কী 'মালিনী'ও বহুল পরিমাণে সংক্ষেপিত। এবং নূতন রূপে এই সম্পাদনার আদর্শ যদি আমরা খুঁজি তো দেখতে পাব ঠিক সেই-সেই কবিত্বমণ্ডিত বিবরণ, দীর্ঘ স্মৃতিচিন্তা অথবা ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসই এখানে নির্মম-ভাবে বর্জিত।

অনুমান করা অন্যায় নয় যে এই অস্বস্তিই রবীন্দ্রনাথের চেতনায় সচল থেকে তাঁর নাটকের আয়তন ক্রমে কমিয়ে আনল। 'রাজা ও রানী' বা 'বিসর্জন'-এর তুলনায় 'চিত্রাঙ্গদা'-'মালিনী'র ক্ষীণাবয়ব লক্ষণীয়, কিন্তু কাহিনীর জটিলতা কমিয়েও ভাষার এই মূল সমস্যা দূর হলো না, রচনা হলো আরো সংক্ষেপ, পৌঁছল 'কাহিনী'র রচনাগুলিতে। কাব্যনাট্য অবশেষে নাট্যকাব্যের সান্ত্বনায় এসে বিরাম নিল, ব্রাউনিঙ যেমন এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর নাটকীয় একোক্তিতে।

দীর্ঘ নীরবতার পরে আবার যখন রবীন্দ্রনাথ নাট্যচর্চায় নিবিষ্ট তখন দেখি গদ্যই তাঁর ঐকান্তিক ভাষা। এ-যুগের প্রথম নাটক 'শারদোৎসব' 'গোরা'-উপন্যাসের সমকালীন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে 'গোরা'ই বাংলার প্রথম উপন্যাস যা সুরেলা অথচ ওজোময় চলিত সংলাপ অর্জন করতে পেরেছে।

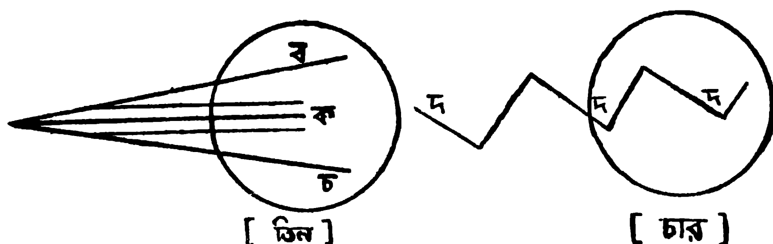
২

আশ্চর্যের বিষয় এই যে গদ্যকে যখন নির্ভরযোগ্য ভাবলেন রবীন্দ্রনাথ, ইওরোপে তখন কাব্যনাট্যের পুনর্জাগরণ ঘটছে এবং তাঁর নিজেরও ভাব-প্রকৃতিতে তখন ভিন্নতা তৈরি হয়ে গেছে। কবিতারচনার ইতিহাসে সেটা তাঁর 'গীত'ময় যুগ এবং নাটকেও প্রত্যক্ষ জীবনস্তরকে আর তিনি লক্ষ্যভূমি ভাবছেন না, জীবনের অন্তর্গত রহস্যসন্ধানে এখন তাঁর কৌতূহল। সে-রহস্যের পরিচয় যাই হোক না কেন, অন্তর্ভেদের এই সচেতন আকাঙ্ক্ষা তাঁর রচনাকে সুরময় করে তুলতে চায় এখন, ঠিক এই সময়ে পদ্যভাষার ব্যবহার হয়তো বিস্মিত করত না আমাদের।

কিন্তু পরিবর্তে, গদ্য এখন তাঁর বন্ধু হলো তো বটেই, এমন-কী পূর্বতন অভিজ্ঞতাগুলির স্মৃতিতে পদ্য বিষয়ে ঈষৎ হঠকারী মন্তব্য করলেন 'তপতী' রচনাকালে, স্পষ্টই জানালেন যে পদ্যে সম্ভব নয় বিচিত্র রকমের মেজাজ সৃষ্টি।

এই নূতন বন্ধু কী-রকম ব্যবহার করল নাট্যকারের সঙ্গে? এই যুগের যোগ্য স্বরসন্ধান যে গদ্যের সাহায্যে সম্ভব ছিল না তা নয়, বিদেশে মেটারলিঙ্ক বা সিঙ-এর মতো নাট্যকারেরা ইতিমধ্যে তার একটা ধরন দেখিয়েছেন। কিন্তু যেমন স্পন্দিত গদ্য ব্যবহার করলেন তাঁরা, রচনার মধ্য থেকে চাপা মেঘের যে-দ্যুতি বেরিয়ে এল ওইসব গদ্যে, রবীন্দ্রনাথ তাকে কতটা আবিষ্কার করলেন তাঁর এই নূতন চেষ্টায়? প্রচলিত নাট্যমুহূর্তের ধারণা থেকে এখনকার নাট্যমুহূর্ত স্বতন্ত্র চরিত্রের, দ্বন্দ্ববোধেরও পরিবর্তন ঘটে গেছে অনেক, কিন্তু এসবের মধ্যেও একটা অভ্যন্তরীণ নাটক থেকে যায়। কোমল মেঘে মেঘে সংঘাত থেকে বজ্রেরই সৃষ্টি। অথচ যে-গদ্যকে এই মেঘের সঙ্গে তুলনা করা চলে, প্রথম মুহূর্তেই যে তাকে ধরতে পারছেন কবি এমন নয়। এই উপমাকে একটু অসংগতরকম দূরে নিয়ে হয়তো বলা যায় যে 'শারদোৎসব'-এর ভাষা শারদ মেঘের মতোই, নয়ন-ভুলোনো, কোনো প্রবলতার আলোড়ন বেজে ওঠে না তার মধ্যে। এ এক রূপকথার ছড়ানো জগৎ, আর 'প্রায়শ্চিত্ত'তে আছে পার্থিব কাঠধুলো। 'রাজা' আর 'অচলায়তন'-এ কোনো কোনো মুহূর্ত উদ্দীপক হয়ে উঠেছে—বিশেষত 'রাজা'য় —কিন্তু সাধারণভাবে এখানেও একটা বড়ো অংশের গদ্য স্পন্দনহীন, গূঢ়তাহীন, তারই জন্যে হয়তো এসব রচনায় স্বতন্ত্রভাবে গানেরও আতিশয্য। অভিনয়-প্রযোজনায় কোনো পরিচালক বিপন্ন বোধ করতে পারেন এদের পৃথক স্পন্দ-রীতিকে একটা সামঞ্জস্যের মধ্যে আনতে, কখনো কখনো সেই কারণে হয়তো অনেকটা সম্পাদনারও প্রয়োজন ঘটে যায়। 'রাজা ও রানী' আর 'বিসর্জন'-এ পদ্যভাষা গদ্যভাষা স্বতন্ত্র দুটি ভঙ্গি নির্মাণ করে রেখেছিল, তার থেকে একরকম মুক্তি মিলল 'চিত্রাঙ্গদা'-'মালিনী'র পদ্যৈকময়ী ভাষায়। কিন্তু এখন আবার দেখা দিল স্পষ্টই দুই ভিন্ন রীতির গদ্যের সমস্যা—একদিকে সাধারণ, অন্যদিকে তারই পাশাপাশি এক উদ্‌বেল আবেগ। দুয়ের মধ্যে যাওয়া-আসার পথ খুব স্বচ্ছন্দ হলো না বলেই একটা নূতন প্রকৃতির জটিলতা তৈরি হলো এখন। পূর্বতন যুগে কবিতার প্রয়োগে যে-বিপদ দেখা দিচ্ছিল এ-সমস্যা তারও চেয়ে বড়ো। কেননা গদ্যের দ্বারাই যদি কবিতার অন্তর্জগৎ স্পর্শ করতে হয় তবে তার মাত্রা এমন নিপুণভাবে নিবিষ্ট হওয়া চাই যার থেকে নেমে এলেই পরিবেশ

ভেঙে পড়বার আশঙ্কা, আবার একটু উঠে গেলেই সুসজ্জিত নির্মাণের ফলে ভাষার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও হয়ে যেতে পারি কেন্দ্রচ্যুত।



[তিন]   [চার]

ভাষার দায়িত্ব এখন কেবল নাট্যবৃত্তকে স্পর্শ করা নয়, তাকে এখন একেবারে কেন্দ্রেরই কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এই দায়িত্বের জন্য কী-রকম শব্দবিন্যাসের প্রয়োজন, তা ভাববার বিষয়। অতি অলংকৃত ধরন 'ব'-রেখার মতো উর্ধ্বগামী হয়ে সরে যায়, আবার একেবারে চাপহীন গদ্যের শিথিলতা তাকে 'চ'-এর মতো অধোবর্তী করে রাখে, এই সংকট নাটকে থেকেই যায়। কখনো কখনো, এই দ্বন্দ্বের কারণেই হয়তো, ভাষা বিপরীতক্রমে তুচ্ছতা-তুঙ্গতার মধ্যে কোণ সৃষ্টি করতে করতে চলে 'দ'-রেখাবলির মতো। এই হিসেবমতো বলতে ইচ্ছে হয় যে 'প্রায়শ্চিত্ত'র গদ্য 'চ'-রেখার অনুবর্তী হয়ে চলেছে, 'রাজা'-'অচলায়তন'কে বলতে পারি 'দ'-এর মতো, কখনো কখনো সেখানে প্রবেশ করে 'লাভ্স্ লেবর্স্ লস্ট'-এর এক লর্ডের বর্ণনামতো 'Taffeta phrases silken terms precise, threepiled hyperboles', কিন্তু পরমুহূর্তেই তার দ্রুত পতন ঘটে নিতান্ত নির্জীবনের মধ্যে।

তাহলে, প্রাত্যহিকতার সাধারণ গদ্যকেই গূঢ়তামর্মী এবং সঞ্চারী করে তুলতে না পারলে রবীন্দ্রনাথের ঐ-কালীন নাট্যমুহূর্তের সঙ্গে নাট্যভাষার সামঞ্জস্য সম্ভব ছিল না। আর সে-সার্থকতার চাবি লুকোনো আছে স্তরান্বিত গদ্যের নির্মাণে, 'ক'-রেখাগুচ্ছের মতো,—নিছক অলংকৃত রীতি এই এষণার যোগ্য পথ নয়। যখন মেটারলিঙ্ক তাঁর 'দৃষ্টিহীন' নাটকের অন্ধ চরিত্রগুলির মুখে ভাষা দেন এইভাবে :

'ঝড় উঠছে মনে হয়'

'আমার মনে হয় ওটা সমুদ্র'

'সমুদ্র? এটা সমুদ্রগর্জন? কিন্তু এ যে দু পা দূরেই!'

'এ তো পাশেই আমাদের। আমার চারদিকেই শুনতে পাচ্ছি। নিশ্চয় অন্য কিছু হবে'

'আমি কিন্তু পায়ের কাছেই ঢেউ শুনতে পাচ্ছি'

'আমার মনে হয় ওটা শুকনো পাতায় বাতাস'

তখন নিরাভরণ এ-গদ্য তার চল্‌তি চালের মধ্যেও প্রতিটি কথায় অন্য এক বা একাধিক স্তর লুকিয়ে রাখে, যোগ্য সহৃদয়ের মনে সে অস্পষ্টভাবে আঘাত তুলে যায়। অজিতকুমার চক্রবর্তী জানিয়েছেন এ-নাটক পড়ে যে-অর্থ তাঁর মনে এসেছিল, হেনরি রোজের সমালোচনায় তার সমর্থন নেই। তাহলে কি অজিত-কুমারের পাঠ ছিল ব্যর্থ? মনে হয় না, কেননা এরও চরিত্র হয়ে ওঠে কবিতারই মতো নানাত্বমণ্ডিত। এ-গদ্য 'কবিত্ব' মাখানো নয়, কিন্তু সেইজন্যেই কবিতার খুব কাছাকাছি।

নাট্যাদর্শের উপযোগী এই গদ্যসন্ধানে অবশেষে রবীন্দ্রনাথ চরিতার্থ হন 'ডাকঘর' নাটকে। 'ডাকঘর'-এর ভাষা স্বাভাবিকতা বা প্রাত্যহিকতা থেকে দূরবর্তী নয়, তবু সে দূরগামী। বাইরের প্রবাহে তাকে লক্ষ করে গেলেও এক-রকম তৃপ্তি পাওয়া সম্ভব, আবার অনুভবশীলের কাছে এই প্রবাহ স্তরের পর স্তর খুলে দিতে পারে নূতন নূতন বোধে :

১. বিছানায় জেগে উঠে দেখি ঘরের প্রদীপ নিবে গেছে, বাইরের কোন্ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং ঢং।

২. আমি বরঞ্চ তোমার এই আধখানা দরজা বন্ধ করে দিই।

৩. এখনো সময় হয় নি।—কেউ বলে সময় বয়ে যাচ্ছে, কেউ বলে সময় হয় নি। আচ্ছা তুমি ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেই তো সময় হবে।

মাঝখানে কেবল একবার 'শরৎ হরকরা বাদল হরকরা' শুনে চম্‌কে যাই, মনে মনে অল্প আপত্তি করি এতটাই স্পষ্ট রূপকের কোনো প্রয়োজন ছিল না ভেবে, সেই ঋতুগুলির আনন্দময় দৌত্য কি ইতিমধ্যেই আমরা বুঝে নিইনি? কেন তবু শরৎ আর বাদলকে উল্লেখ করা হলো চরিত্ররূপে? নাট্য-পরিণামে রাজ-কবিরাজ ইত্যাদির আবির্ভাবেও একটু যেন বেশিমাত্রায় প্রকাশিত হয় অপ্রকাশ্য। কিন্তু কত সুন্দর অনায়াস এই শান্ত কথাটি 'বোলো যে, সুধা তোমাকে ভোলে নি'। ভাবতে ভালো লাগে যে নাটকের এইটে শেষ কথা।

'মুক্তধারা'-'রক্তকরবী'র যুগেও ভাষার এই চলন আছে, কিন্তু একটু ভিন্ন অর্থে। 'ডাকঘর'-এর গদ্য একটা বিষণ্ণ দূরত্বের আবহ রচনা করেছে, বাসনার সঙ্গে

বস্তুর সংঘাতে তা একরকম মায়াময় মূর্তি ধারণ করে। কিন্তু 'মুক্তধারা' বা 'রক্তকরবী'তে নাট্যাদর্শ ঈষৎ পরিবর্তিত। এইখানে, বিশেষত 'মুক্তধারা'য়, বজ্রবিদারণ মুহুর্মুহু! যে-প্রলয়গোধূলির মেঘের উল্লেখ 'রক্তকরবী'তে শুনেছি, তার সমস্ত আভা ছড়িয়ে আছে 'মুক্তধারা'র দপ্‌দপে সংলাপগুলিতে। ভাষার আয়োজন এখানে তুলনায় বেশি বলে একটা ক্ষীণ আপত্তি উঠতে পারে, যদিও মনে রাখতে হবে যে এর ঘটনাভূমির মধ্যেই একটা আপেক্ষিক উচ্চতা আছে। 'আকাশে ওটা কী গড়ে তুলেছে? দেখতে ভয় লাগে' এই সংলাপে যে-নাটকের শুরু তা শেষ পর্যন্ত একটা জোরালো তারে বাঁধা থাকবে এটাই সংগত। বরং অল্প সময়ের জন্য নাগরিকেরা এসে স্বর একটু নামিয়ে দেয় পুরোনো ধরনে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখি যে একরকম অচলায়তনিক বিদ্রূপবাচনের সঙ্গে উত্তরকূটীয় সংলাপরীতির বেশ মিলও হয়।

'মুক্তধারা'-'রক্তকরবী'র জোরালো আয়োজন প্রসঙ্গে আরো একটি কথা ভাববার আছে। একথা আমরা জানি যে 'গীতাঞ্জলি'র যুগভূমিতে চলে আসার পর রবীন্দ্রনাথের মন একরকমের পরমতা অর্জন করেছিল, তাঁর ব্যক্তিত্বে গড়ে উঠেছিল এক সাংগীতিক সামঞ্জস্য। এরই ফলে বিচিত্র উদ্দেশ্যবাহী চরিত্র বা কাহিনী -গত জটিলতায় তাঁর উৎসাহ তুলনায় প্রশমিত হয়ে আসছিল। 'ডাকঘর'-এর অমল-সর্বস্বতা এবং সেই অমলের মধ্যেও তাঁর নিজস্ব স্বরক্ষেপণের জন্য ওই রচনা যে-স্বস্তি পায়, 'রাজা' বা 'অচলায়তন'-এ জটিলতার বুহ্নি সে-স্বস্তি দেয়নি। কিন্তু অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই যেমন বিশ্বজীবন তেমনি তাঁর ব্যক্তিজীবন নানা চিন্তার সংঘাতে চূর্ণ হতে শুরু করেছে বলে আশঙ্কা হয়। এতদিন তিনি রচনা করে তুলেছিলেন তাঁর নিহিত ব্যক্তিকে, এইবার সংগঠিত সেই ব্যক্তি এসে দাঁড়াচ্ছে সংকটময় ইতিহাসের প্রত্যক্ষতায়। 'কবিতার তিন স্বর' বক্তৃতায় এলিয়ট দেখিয়েছিলেন কীভাবে নাট্যকার তাঁর প্রতিটি চরিত্রের মধ্যেই বীজরূপে ছড়িয়ে দেন নিজ অস্তিত্বের এক এক কণা, সেই বীজ থেকে অবয়ব পেয়ে জাগতে থাকে চরিত্রগুলি। ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিচিত্র জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল বলে রবীন্দ্রনাথেরও মন থেকে নানা টুকরো অস্তিত্ব নাট্যচরিত্রে এখন রোপিত হতে পারছে, সংঘাতের সম্ভাবনাও হচ্ছে তীব্র, ভাষাও তার উপযোগী শক্তি অর্জন করছে। যদি কোনো নূতন সমস্যা না দেখা দিত এই পর্বে, তবে অনুরূপ নাট্য-রচনা এখন হয়তো আরো বেশি প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু বহুল অলংকরণের অভ্যাস এবার তুলে আনল আরেক সমস্যা।

ইতিমধ্যে প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাব, সাহিত্যে বাস্তবতার চাপ এবং নূতন যুগের তরুণ কল্লোল রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষায় অনভিপ্রেত এক জৌলুশ রচনা করেছে। নাটকের ইতিহাসে ঠিক 'রক্তকরবী'তেই তার সূচনা নয়, সেখানে দু-চারটি লক্ষণ দেখা দিচ্ছিল মাত্র। বিশু যখন তির্যক ভাষায় কথা বলে, আমরা তাতে আপত্তি কার না এই ভেবে যে কথার আভরণে সে তার ব্যক্তিত্বের উপর একটি আবরণরচনায় উৎসুক, তার ব্যর্থ প্রেমের প্রদাহ গোপন করা চাই। অধ্যাপকের ভাষা বৃত্তিগুণেই শীলিত, আর প্রেম শক্তি ও দাহ রাজার সংলাপে শব্দের অগ্নিগিরি রেখে যায়। নন্দিনী প্রত্যেকের সঙ্গে পৃথকরূপে কথা বলতে পারে বলে এ-নাটকে উক্তিগুলি চরিত্রের সঙ্গে কোনো বিরোধ করে না মনে হয়। কেবল হয়তো রাজাকে একটু বেশি শুনেছি আমরা, এই যেন অতিকথনের পুনঃসূচনা।

নাট্যঅভিঘাতের আরো একটি উল্লেখযোগ্য কৌশল পাই 'মুক্তধারা'-'রক্তকরবী'তে, যে-কৌশলে দ্রুত ভঙ্গিল অসম্পূর্ণ পারস্পরিক উক্তিপরম্পরার ভিতর দিয়ে একটা ছন্দ গড়ে তোলা যায়, যেমন 'মুক্তধারা'র এই অংশে :

> এ তো স্পষ্টই জলস্রোতের শব্দ।
>
> প্রথম নাচ আরম্ভের ডমরুধ্বনি।
>
> শব্দ বেড়ে উঠছে যে, বেড়ে উঠছে—
>
> এ যেন—
>
> বোধ হচ্ছে যেন—
>
> হাঁ, হাঁ, সন্দেহ নেই। মুক্তধারা ছুটেছে। বাঁধ কে ভাঙলে? কে ভাঙলে? —তার নিস্তার নেই।

নাট্যসংঘাত এখানে চূড়ান্তে পৌঁছয় এবং বিভূতির ওই শেষ দীর্ঘ দ্রুত উচ্চারণ, অনেকগুলি ভাঙা ভাঙা কথার পর, হঠাৎ যেন মুক্তধারার মতোই বিপুল স্রোতে বেরিয়ে যায়, তার ধাবমান উত্তেজনাও আমরা কথার থেকেই দৃশ্যমান করে তুলতে পারি।

অবশ্য 'রক্তকরবী'তে এই ছিপ্‌ছিপে চলন তুলনায় কম, যদিও সুযোগ ছিল অনেক। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে 'তপতী'-'বাঁশরি'তে অনেকখানি ফেঁপে উঠল ভাষা, তৃতীয় ছবির অনুসরণে এদের ভাবতে পারি 'ব'-রেখার মতো, আর ব্যাপারটিকে একেবারেই আকস্মিক মনে হয় না যদি আমরা তৎসাময়িক কবিমনের প্রকৃতি লক্ষ করি। 'শেষের কবিতা'য় অমিতের মুখে রবীন্দ্রনাথ

ধরিয়ে দিয়েছেন নিজের সঙ্গে তাঁর নিজের সংগ্রাম, উপন্যাসের বিষয়ের পক্ষে তার গুরুত্ব যাই হোক, তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব বুঝবার পক্ষে সেটা খুব সাহায্য করে। কখনো কখনো এতটাই মনে হয় যে সাম্প্রতিকের সঙ্গে নিষ্পত্তির প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ দু-এক সময়ে নিজেই অমিত-উল্লেখিত মুখোশটি ধারণ করতে রাজি হচ্ছিলেন। 'যোগাযোগ'-এর প্রায় সমকালেই পাই 'শেষের কবিতা', প্রায় একই সময়ে এ-দুই উপন্যাস ছাপা হচ্ছিল দুই পত্রিকায়—এই তথ্য আমাদের স্মরণীয় ; ওই সঙ্গে স্মরণীয় এদের বহিরবয়বগত মেরুপরিমাণ ভিন্নতার কথা।

এই ভিন্নতা, বস্তুত, ওই দ্বন্দ্বেরই সূচক। মুখ আর মুখোশের দ্বন্দ্ব। এই সময় থেকে শুরু করে তাঁর জীবনের শেষ দশ বৎসর নানা বিরোধী ব্যক্তিত্বে আলোড়িত রবীন্দ্রনাথ। এরই সংঘর্ষ থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে অনেক তীব্র রচনাও যেমন পেয়েছি আমরা, তেমনি কখনো কখনো তাঁকে দেখতে পাচ্ছি শূন্যতার চতুর্দিকে ঘূর্ণ্যমান। ভাষা সম্পর্কে অত্যধিক সচেতন চর্চাও এই সংগ্রাম থেকে জাত, এ-রকম মনে ভাবা কি অন্যায় ? এই সচেতনতা 'তাসের দেশ'-এর মতো নাটকে হয়তো অকস্মাৎ এ-রকম অকারণ শব্দের খেলায় পৌঁছতে পারে :

> কৃষ্টি, কৃষ্টি, কৃষ্টি।
> তোমার পত্রে সম্পাদকীয় স্তম্ভ আছে তো ?
> দুটো বড়ো বড়ো স্তম্ভ।···
> বাধ্যতামূলক আইন চাই।
> ওটা আবার কী বললে ? বাধ্যতামূলক আইন !
> কানমলা আইনের নব্য ভাষা। এও নবতম অবদান।

এর পরে, সমকালীন সাংবাদিকতার প্রতি এই মৃদু পরিহাস করে নিয়ে, 'আচ্ছা পরে হবে' বলে রাজা যখন জিজ্ঞেস করেন 'বিদেশী, তোমার কোনো আবেদন আছে' তখন আমরা বুঝতে পারি যে মধ্যবর্তী অপ্রাসঙ্গিককে ছেড়ে নাটক আবার নতুন করে এবার চলতে শুরু করল।

যেমন 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে, তেমনি 'বাঁশরি' নাটকে, উপরোক্ত এই সংগ্রাম প্রায় আক্ষরিকই ধরা দেয়। 'বাঁশরি'তে একটা প্রধান ভূমিকা ক্ষিতীশের, কিন্তু কতটা প্রধান ? সে বাঁশরির দ্বারা ব্যবহৃত মাত্র এবং সে-ব্যবহারে যখন এই-সব শাণিত বচন শুনতে পাই বাঁশরির মুখে, আধুনিক সাহিত্যের পটভূমিকায় :

> সাহিত্যে তুমি নূতন ফ্যাশানের ধূমকেতু···পুরোনো কায়দাকে
> ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলেছ আকাশ থেকে।

> চিটেগুড় মাখিয়ে কথাগুলোকে চট্‌চটে করে তোলা এখানে চল্‌তি নেই।
>
> লেখো লেখো, দেরি কোরো না, লেখো এমন ভাষায় যা হৃৎপিণ্ডের শিরাছেঁড়া ভাষা…ঝোড়ো মেঘের বুকভাঙা সূর্যাস্তের রাগী আলোর মতো।

তখন, ক্ষিতীশকে 'আধুনিক' লেখকের প্রতিনিধি করে সামনে রাখা হয়েছে বলেই, এ-কথার তাৎপর্য বুঝতে দেরি হয় না। আবার এরই অন্য পিঠে বাঁশরির এই কথার মধ্যে সাধনা ও সিদ্ধির সমন্বয় বিষয়ে কবির উত্তেজিত ব্যাকুলতা সঙ্গে সঙ্গেই ধরতে পারি :

> এমন লেখা লেখবার শক্তি কেন আমাকে দিলেন না বিধাতা, যার অক্ষরে অক্ষরে ফেটে পড়ত রক্তবর্ণ আগুনের ফোয়ারা।

কেবল তাঁর চিত্রাবলিই নয়, এই আগুনের ফোয়ারা বা বুকভাঙা সূর্যাস্তের রাগী আলো তাঁর অন্য রচনাতেও অনেকসময়ে দেখেছি আমরা, কিন্তু তবু এইসব প্রদাহী উচ্চারণ থেকে ভাষাসমস্যায় বিক্ষত এক রবীন্দ্রনাথ মুহূর্তমধ্যে আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়ান।

আর, 'বাঁশরি'র প্রকাশ তেরোশো চল্লিশে, 'চিত্রাঙ্গদা'কে নিয়ে তাঁর নৃত্য-নাট্যের সূত্রপাত তেরোশো বিয়াল্লিশ সালে। পরে নৃত্যনাট্যেরই কৈফিয়ৎ প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীকে তিনি লিখেছেন, ভাষার আদর্শ বিষয়ে কত লোকের কত মত, বাক্যের সৃষ্টির উপর এই দীর্ঘ জীবনের অবসানে এখন সংশয় জাগল তাঁর : 'এত রকম চলতি খেয়ালের উপর তার দর যাচাই হয়, খুঁজে পাই নে তার মূল্যের আদর্শ'। কিন্তু বাস্তব সাহিত্যের পাহারাওয়ালারা যখন তাড়া করে তখন 'পালাবার জায়গা আছে আমার গান', তাই এখন নাট্য-সংলাপে তিনি নিলেন তাঁর তৃতীয় ভাষা, সংগীত।

৩

কথার ভিতরকার সুর আবিষ্কার করে বক্তব্যকে সংহত রূপ দেওয়াই রবীন্দ্রনাথের বহুদিনের অভিপ্রায়, কিন্তু ভাষার বহিরঙ্গ সমস্যা তাঁকে বারংবার সেই লক্ষ্য-ভূমি থেকে বিচলিত করেছে দেখতে পাই। কিন্তু এখন গানের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করতে পারবার নিঃসংশয় আত্মস্থতায় পৌঁছলেন তিনি। ফলে অন্তঃস্থিত জটিলতাও যেমন তিনি দেখাতে পারছেন নৃত্যনাট্যের চরিত্রাবলিতে, তেমনি

সুরের সাহায্যে আমাদের বিষয়ের গূঢ় মর্মে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব হলো তাঁর অন্ত্যযুগের নাট্যচর্চায়। এই রচনাগুলিতে যে ক্রমেই তিনি বেশি স্বস্তি পাচ্ছিলেন আর জীর্ণ বয়স সত্ত্বেও অধিকতর অধিকার অর্জন করে নিচ্ছিলেন, 'চিত্রাঙ্গদা'র পর 'চণ্ডালিকা'-'শ্যামা'র অগ্রগতি সে-কথা প্রমাণ করে। প্রথম যুগের গীতিনাট্য-গুলির সঙ্গে এর একটা প্রধান ভেদ এই দেখা গেল যে গান এখানে সূত্রমাত্র নয়। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' আর 'মায়ার খেলা' যেমন 'গানের সূত্রে নাট্যের মালা' কিংবা 'নাট্যের সূত্রে গানের মালা' ছিল, নূতন বিন্যাসে সেটা আর রইল না। এখানে ভাষা কেবল গানের নয়, উপযোগী নাচেরও ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্তে এখন। পারস্পরিক এক নিগূঢ় মিশ্রণের দ্বারা নৃত্য ও গীত এখন কথাকে অধিকার করতে পারছে বলে এর নাটকীয় সম্ভাবনা হলো তীব্র, তাকে 'লিরিক্যালের চেয়ে ড্রামাটিক বেশি' বলে মনে করতে পারলেন রবীন্দ্রনাথ, এখন যেন তিনি নাটকের জগতে অনেক বেশি নিজের মতো।

'নাট্যকাব্য-বিষয়ক সংলাপ' প্রবন্ধে একটি চরিত্রের মুখে এলিয়ট বলিয়ে-ছিলেন যে নাটকের—বিশেষত কাব্যনাটকের—ভবিষ্যৎ নিহিত আছে ব্যালে-নির্দেশিত পথে। কিন্তু তবু এই ব্যালে প্রসঙ্গেও ঈষৎ অস্বস্তি ছিল সেই ব্যক্তির, যেহেতু নাটকে প্রত্যাশিত সবকিছুই আছে এই শিল্পরূপে, নেই কেবল 'কবিতা'। রবীন্দ্রনাথও কি অবশেষে তাঁর নাট্যপরিণামে এলিয়ট-উদ্দিষ্ট সেই লক্ষ্যে পৌঁছলেন? হয়তো তাঁর এই নৃত্যনাট্যগুলিতে এলিয়টের ওই চরিত্র আরোই তৃপ্তি পেত, কেননা 'it had a form' এ-কথাও যেমন সত্যি এখানে, তেমনি এ-ও সত্যি যে তার সঙ্গে এখানে এসে যুক্ত হয়েছে 'poetry'। সম্পন্ন হয়েছে তাঁর অভিপ্রেত নাট্যসম্পূর্ণতা।

১৯৬১

সংগত প্রতিমা

'রক্তকরবী' নাটকে নন্দিনী জানিয়েছিল যে তার রঞ্জন শঙ্খিনী নদীর মতো, 'সে যেমন হাসতেও পারে তেমনি ভাঙতেও পারে'। সন্দেহ নেই যে রঞ্জন-চরিত্রের এই বর্ণনা নাট্যবিষয়ের একটি বড়ো সূত্র, কিন্তু তার জন্যে কি প্রয়োজন ছিল শঙ্খিনী নদীর সঙ্গে আকস্মিক এই তুলনা ? এ কি নিতান্ত সাজিয়ে বলা নয় ? এই প্রশ্ন খানিকটা থমকে যায় পরিণতির দিকে অনেকটা এগিয়ে, যখন ওই একই শব্দগুচ্ছ আবার ফিরে আসে অধ্যাপকের মুখে। পুরাণবাগীশকে বুঝিয়ে দেন অধ্যাপকমশাই যে রাজার চরিত্রে এখন এসে গেছে এক ভাঙনমুহূর্ত, তার 'সঞ্চয়-সরোবরের পাথরটাতে চাড় লেগেছে' এবং রাজার এই চরিত্রমুক্তি বর্ণনার জন্য বস্তুবাগীশ অধ্যাপককে বলতে হয় : 'আমাদের ওই পাহাড়তলা জুড়ে একটা সরোবর ছিল, শঙ্খিনী নদীর জল এসে তাতে জমা হত। একদিন তার বাঁ দিকের পাথরের স্তূপটা কাৎ হয়ে পড়ল, জমা জল পাগলের অট্টহাসির মতো খল্‌খল্‌ করে বেরিয়ে চলে গেল।' এই যে বর্ণনাভঙ্গি এল অধ্যাপকের মুখে, তার গহনে হয়তো ক্রিয়াবান ছিল নন্দিনীর কাছে শোনা পুরোনো সেই বর্ণনা। উপরন্তু এখন, কথাটি শুনবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি ভিতরদিক থেকে এক মস্ত ব্যাখ্যা সংহতভাবে রূপ নিয়ে নিল এই শব্দপ্রতিমায়, উল্লাসময় রঞ্জনের যৌবনচারিত্র যে অল্পে অল্পে রাজার ব্যক্তিত্বের আবরণ ভেঙে বেরুচ্ছে তা বুঝতে পারেন দর্শক। তখন আর বলা যায় না যে প্রতিমার এই প্রয়োগ কেবল কবিজনোচিত অলংকরণ, তখন মানতে হয় যে পরস্পর এই দুই ব্যবহারের মধ্যে এখানে একটা নাটকীয় পরিণাম এগিয়ে আসছে। এই নাটকীয়তাকে সংযমের মধ্যে বিন্যস্ত করবার কৌশল হিসেবে আসে বলে তাকে সংগত নাট্যপ্রতিমা রূপে গণ্য করা যায়।

অথবা যেমন 'কালের যাত্রা'য় আছে রথটানা রশিটির প্রসঙ্গে ব্যাকুল সব উৎপ্রেক্ষা। কখনো শুনি সে অজগর সাপ, কখনো-বা 'যেন যুগান্তের নাড়ী / সান্নিপাতিক জ্বরে আজ দব্‌দব্‌ করছে'। ছোটো এই নাটকটিতে আরো অনেক

বর্ণনাই দেখা যাবে দড়িটির। একদিকে, 'পথের বুক জুড়ে পড়ে আছে তার অসাড় দড়িটা' 'যেন একজটা ডাকিনীর জটা' 'যেন বাসুকি মরে উঠল ফুলে', অন্যদিকে সে যেন 'যমুনানদীর ধারা' 'যেন নাগকন্যার বেণী' 'যেন গণেশঠাকুরের শুঁড় চলেছে লম্বা হয়ে / দেখে জল আসে চোখে'। এই বহুল উল্লেখের মধ্যে মানসিকতার স্পষ্ট ভিন্নতা আছে। শেষ ছবিগুলি ধরা পড়ছে ভক্তিকাতর ত্রস্ত নারীদের চোখে, সৈনিকরা দেখছিল কেবল এর আক্রমণকারী বীভৎস চেহারা। এমন-কী প্রথম আবির্ভাবে যে-মেয়েটির মনে হচ্ছিল দড়িটি পড়ে আছে যেন ভয়াবহ অজগর সাপের মতো, সে-ই যে অল্প পরে তার রূপবন্দনা করে যমুনানদীর প্রতিমায়—এর করুণ কৌতুকটুকু লক্ষ করা নাট্যবোধের জন্যই প্রয়োজন। প্রয়োজন এইটেও বুঝে নেওয়া যে মেয়েদের সংলাপে আছে এক অবোধ ভঙ্গি, সর্বনাশকে তারা দেখতে পাচ্ছে অনেকটা বাইরের দিক থেকে, কিন্তু পুরুষ নাগরিকদের কথায় দেখি যুগযুগান্তকে বুঝে নেবার চেষ্টা আর তাই তারা ব্যাধিটা লক্ষ করে আত্ম-শরীরের ভিতরদিক থেকে। তাদের কাছে এ আর বাইরের অজগর হয়ে থাকে না, হয়ে ওঠে সান্নিপাতিক জ্বরে দব্‌দব্‌ করে-ওঠা যুগান্তের নাড়ী। সশঙ্ক আভাসে তারা বুঝতে পারে যে এর জন্য প্রয়োজন ঘটবে আত্ম-চিকিৎসার।

তাই রবীন্দ্রনাথের নাটকে, অথবা যে-কোনো নাটকেই, প্রতিমাবাহী ভাষাস্রোতকে বিচার করতে হয় ধৈর্যের সঙ্গে, দেখতে হয় তার নাট্যঅভিপ্রায়। অবশ্য 'অভিপ্রায়' শব্দের তাৎপর্য এই নয় যে, সব মুহূর্তেই রচয়িতা সতর্ক বুদ্ধির দ্বারা সাজিয়ে তুলছেন এমন বাক্যবিন্যাস, অসম্ভব নয় যে অনেকসময়ে এসব প্রয়োগ মূল্যবান হয়ে উঠেছে লেখকের নিজেরও অগোচরে। যদি মনের দীক্ষা থাকে স্থির, এবং যদি সেই মন একাগ্র নিবিষ্ট থাকে বিষয়ের তীব্র অন্তর্মোচনে, যদি তাঁর অভিজ্ঞতা হয় সত্য—তাহলে লেখকের অলক্ষ্যেও রচনায় গড়ে ওঠে এক সর্বত-সামঞ্জস্য। রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিমায় এই ধরনের নাটকীয় সামঞ্জস্য নিতান্ত বিরল নয়।

২

কেবল যে নাটকীয়তার বিশ্লেষণেই ব্যাপারটা আমাদের লক্ষণীয় হয় তাও নয়, এর থেকে খানিকটা জেনে নেওয়া যায় তাঁর জীবন চিনবার ধরনটাও। এই শুনে আমরা অভ্যস্ত যে তাঁর নাটকের চরিত্রাবলি প্রায় সব সময়েই কথা বলে রাবীন্দ্রিক

ভাষায়, কবিজনোচিত চিত্রবহুল সংলাপে। তাঁর জনচরিত্র কখনোই আমাদের চেনাজানা জনতা নয়, কেননা সত্যিকার জনশ্রেণী কি এমন সূক্ষ্ম রঙ্গময় হয়ে উঠতে পারে, যেমন কৌতুকে বিভান্বিত 'রাজা ও রানী' বা 'রাজা' বা 'মুক্তধারা'র পথিকজন ? তারা কি বুঝতেও জানে এমন বাঁকিয়ে-ধরা কথামালা ?

বস্তুত এসব প্রশ্নের সময়ে আমরা লক্ষ করি না যে বুঝতে না পারার ফল হিসেবে বিহ্বল উচ্চারণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর চরিত্রের মুখেই রেখে দিচ্ছেন কত সময়ে। যেমন 'ঋণশোধ'-এ শেখরের সাহচর্য পাবার পর লক্ষেশ্বর বলে 'লোকটা যখন কথা কয় সব ঝাপসা ঠেকে', যেমন 'ফাল্গুনী'র রাজা থেকে-থেকেই বলেন 'ওহে কবি, আরেকটু স্পষ্ট ভাষায় কথা কও', অথবা যেমন 'রক্তকরবী'তে চন্দ্রা : 'বেয়াই, অমন উলটিয়ে কথা কও কেন ?' এবং ফাগুলাল : 'বিশুদাদা, পষ্ট করে কথা বলো, নইলে রাগ ধরে।' এসব সংলাপে একদিকে যেমন চরিত্রগুলির বাস্তবতা পেয়ে যাই, আমাদের অস্পষ্ট বোধের ক্লান্তিতে ভর্ৎসনাই যেন শুনতে পাই ফাগুলালের স্বরে, অন্যদিকে তেমনি জানতে পারি রবীন্দ্রনাথ ভাষার এই পরিশীলন-জনিত বিঘ্নবিষয়ে কতটাই সচেতন। তবুও যে কবি বা বিশু কথা সাজায় একটু তির্যক-ভঙ্গে তার হয়তো অন্য কোনো চারিত্রিক প্রয়োজন থাকতে পারে।

তার মানে এ নয় যে রবীন্দ্রনাথের অল্পবুদ্ধি এই মানুষেরা কখনোই কেঁপে উঠছে না অন্য স্তরে, কখনো কখনো পালটে যাচ্ছে না তাদের ভাষা। 'রক্তকরবী'র গোকুলকেও বলতে হয় 'দেখে মনে হচ্ছে তুমি রাঙা আলোর মশাল', 'রাজা ও রানী'র সৈনিকও বলে 'দেখলুম চোখের চেয়ে তার কঙ্কণ ভয়ানক'। কিন্তু এই স্বরোন্নয়নকে কি বলব অবাস্তব ? বহুরূপীর অভিনয়ে গোকুলের ওই কথাগুলিকে যখন সহজ টানেই চলে আসতে দেখি তখন এ-প্রসঙ্গে নিশ্চয় আরো খানিকটা ভাববার দরকার হয়। প্রশ্ন করতে হয়, পথচল্‌তি মানুষের রসকল্পনার কোনো প্রকাশ কি কখনোই আমরা দেখতে পাই না জীবনে ? প্রাত্যহিক বাঁচার আটপ্রহরও কি বাঁধা থাকে কেবল প্রাত্যহিকেরই নির্জীবনে ? তার মধ্যেই থেকে-থেকে কি স্ফুলিঙ্গ দেখা দেয় না কোনো ? 'মার্ক্সবাদ ও কবিতা' বইতে জর্জ টমসন দেখিয়েছিলেন কীভাবে তিনি জানতে পেরেছিলেন সহজ জীবনের বাক্‌ছন্দ। কুয়ো-থেকে-জল-তোলা এক গ্রামীণ বৃদ্ধার সমস্ত শরীর কীভাবে দুলে উঠল আবেগময় বর্ণনার আবেশে, কীভাবে অল্পে অল্পে তার ভাষা উঠে এল এক সমুচ্চ গ্রামে, টমসন শুনতে পেলেন যেন কথা জেগে উঠেছে কবিতার মন্দ্রে। এই অভিজ্ঞতা শুনতে শুনতে কারো মনে পড়তে পারে সিঙ-এর নাট্যাবলি, স্পন্দিত

আইরিশ জনজীবনের একেবারে ভিতর দিক থেকে তুলে-আনা তাঁর চরিত্র, তারা যেন কথনো কথনো কথা বলে ওঠে এম্নি ঘোরের মধ্যে, এম্নি চিত্রে-ছন্দে উজ্জীবিত ভাষায়। এই ঘোর লেগেছিল বলেই চণ্ডালিকা-প্রকৃতিরও কথা আর বুঝতে পারে না তার মা: 'তোর মুখের কথা সুদ্ধু বদলে গেছে যে! জাদু করেছে তোর কথাকে'। প্রথম দৃশ্যেই তার কথা জাদুময় হয়ে উঠেছে ঠিক, আর দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখি তার মুখে শব্দ যেন এসে যায় আরো বেশি স্বপ্ন-চালিতের মতো, অনর্গল প্রবলতায়, ভরাট অলংকারে। কেননা এই দ্বিতীয় দৃশ্যে তার আপন আবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আনন্দকে বশ করবার যোগ্য সত্যিকার জাদুমন্ত্রের চাপ। আমাদের সমস্ত শরীরযন্ত্রের মধ্যে যে-ছন্দ লুকোনো আছে তাকে আমরা প্রকাশ করতে পারি না সমস্ত সময়ে, বাস্তবের সেই টুকরো প্রকাশই হলো গদ্যের জগৎ, আর আমাদের সমগ্রের স্ফুরণই হলো কবিতা, সেই প্রস্ফুরণে আমরা কেঁপে উঠি ছবিতে ছন্দে। জীবনের ভিতর থেকে ক্ষণে ক্ষণে এই সমগ্রের চকিত বিকাশকে যিনি লক্ষ করেন তিনি অবাস্তবকে ধরেন না, তুলে আনেন গাঢ়তর বাস্তবেরই অবয়ব।

উপরন্তু শিল্পবিচারে স্বাভাবিকতার মাত্রাই বা স্থির হবে কোন্ নিরিখে? কতটাই-বা শিরোধার্য করা উচিত ন্যাচারালিজ্ম আন্দোলনের দাবি? হয়তো-বা এরই কোনো পরোক্ষ তাপে এমন-কী শেক্সপীয়রকে অভিযুক্ত হতে হলো টলস্টয়ের দরবারে। অজ্ঞাতকুল কোনো জনচরিত্রের কথা নয়, টলস্টয় জানতে চাইলেন, ডেনমার্কের রাজপুত্রই কি তেমন ভাষায় কথা বলতে পারতেন যে-ভাষায় বলেন শেক্সপীয়রের হ্যামলেট? শেক্সপীয়রের চরিত্রগুলি কি, টলস্টয় প্রশ্ন তুললেন, শেক্সপীয়রেরই ভাষায় কথা বলে না? এদিক থেকে কি খর্ব নয় তাঁর নাটক? স্বাভাবিকতার দাবি পরিহাস্যতার কোন্ সীমা স্পর্শ করতে পারে, এখান থেকে তার একটা ছোটো ইঙ্গিত হয়তো পাওয়া যায়।

৩

বিচার তাহলে এদিক থেকে নয়। বিচার এ নয় যে প্রতিমাপ্রয়োগের ফল হিসেবে ভাষা তার সম্ভবপরতা লঙ্ঘন করছে কি না, যদিও প্রতিটি লেখক তাঁর আপন বিবেচনা-মতো এর একটা সীমান্তর রচনা করে রাখেন। বিচার এই যে, নাটকে প্রযুক্ত প্রতিমাবলির কতটাই নাটকীয় প্রতিমা আর কতখানি তাকে বলা যাবে কেবল কাব্যপ্রতিমা।

কিন্তু সত্যি কি এমন কোনো ভিন্নতা আছে কাব্যপ্রতিমায় নাট্যপ্রতিমায় ? কবিতার দ্বারা প্রাণিত ভাষা নাটকে উঠে এলেই কি কবিতার প্রতিমা হয়ে ওঠে না নাট্যপ্রতিমা ? হয়তো তা নয়, হয়তো তার পরেও এ-দুয়ের মধ্যে আমরা মাত্রার ভেদ খুঁজতে চাই। বলা যায় না যে শেক্সপীয়র এবং শেলি তাঁদের নাটকে একই ভঙ্গিতে প্রয়োগ করেছিলেন অলংকার, অথবা একেবারে একই মানে বিচার হতে পারে ইয়েট্স আর সিঙ-এর রচনাবলি। শ্রীমতী স্পার্জেন স্থির করে নিয়েছিলেন এক সরল প্রভেদসূত্র : কবিতার প্রতিমা আসে কবির অভিজ্ঞতা থেকে, আর নাটকে সেটা ঘটে চরিত্রের নিজস্ব অভিজ্ঞতায়। এই সূত্র গ্রহণ-যোগ্য নিশ্চয়, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে গূঢ়তর অর্থে চরিত্রের অভিজ্ঞতাও কবিরই অভিজ্ঞতা, কবিই তাঁর নিজের মধ্যে ধারণ করে রাখেন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত মূর্তি। তাই ওথেলোর সংলাপ থেকে আমরা একই সঙ্গে ওথেলো আর শেক্সপীয়রকে পেয়ে যাই। অথবা শ্রীমতী এলিস-ফার্মার যেমন বিবেচনা করেন, কবিতায় অলংকার কেবল সাজিয়ে-তোলা কথা, নাটকে তা কোনো-না-কোনো অর্থে ক্রিয়াশীল। সে-ক্রিয়ার ধরন হতে পারে অনেক। হয়তো তার প্রয়োগ থেকে ধরা যেতে পারে নাট্যগত জগতের সঙ্গে তার বহির্মণ্ডলের যোগ, তা সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে নাটকের অভ্যন্তরীণ বিষয়সত্তাকে, ব্যবহৃত প্রতিমা-সংকেত থেকে বুঝে নেওয়া যায় চরিত্রাবলির ভিতর-রহস্য, কখনো-বা তার থেকেই আমরা পেতে পারি কোনো নাটকীয় ক্রমিকতা, কখনো সে উন্মোচন করে আনে আত্মিক উপলব্ধির রহস্যময় জগৎ। এই বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিকতা স্বীকার করেও মনে রাখতে হবে যে কবিতায় সাজিয়ে-তোলা কথাও কেবলই সাজিয়ে তোলা নয়, যদি তার দ্বারা কোনোই উন্মোচন না ঘটত তবে নষ্ট হয়ে যেত তার অনেকখানি তাৎপর্য।

নিছক কাব্যপ্রতিমাও তুলে আনে অভিজ্ঞতাগত অনেক সংহত জটিলতা, কিন্তু তবু মনে হয় নাট্যপ্রতিমা থেকে তার চলন কিছু ভিন্ন। কবিতার প্রতিমাকে যদি বলা যায় অনুলম্ব (vertical), তবে নাটকে সে চলে অনুভূমিক (horizontal) চালে। যোগ্য নাটকীয় প্রতিমা কখনোই ছেড়ে দেয় না সময়ের পরম্পরা। কেবলমাত্র সময়ের প্রবাহেই যে তারা পরস্পর যুক্ত থাকে তা নয়, এর মধ্যে তৈরি হয় একটা প্রচ্ছন্ন কার্যকারণ সূত্র। পূর্ববর্তী পরবর্তী অভিজ্ঞতার সংঘর্ষে মিলিয়ে দেখলে মধ্যবর্তী কোনো বর্ণনা জ্বলে ওঠে নূতন দ্যুতিতে। এইটেকেই বলা যায় নাটকীয় দ্যুতি, হয়তো এই অর্থেই কোনো

সমালোচক একে ভাবতে পারেন dynamic বা গতিময়। এর বিপরীত দিকে যাকে বলা যাবে static বা স্থাণু প্রয়োগ, যাকে বলব কাব্যপ্রতিমা, তার মধ্যে কি নেই কোনো সময়ের ব্যবহার? তা নিশ্চয় নয়। কিন্তু সেখানে সময় আসে ভিন্ন অর্থে, কবির অন্তর্গত অভিজ্ঞতাসূত্র সেখানে ত্রিকালকে একত্র বেঁধে রাখে একটি বিন্দুতে, তারপর এই বিন্দুটি যেন হয়ে থাকে স্থির। 'বিসর্জন' নাটকে যখন অপর্ণা বলে 'ব্রাহ্মণেরে বড়ো ভয় করি। / কী কঠিন তীব্র দৃষ্টি! কঠিন ললাট / পাষাণসোপান যেন দেবীমন্দিরের'—তখন পাষাণসোপান খুব যোগ্য ছবি হয়েও স্থির থাকে ওই একই বিন্দুতে, যদি-না আমরা লক্ষ করতে শিখি অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে এর অনুভূমিক চলন। এই নাটকের সূচনাতেই ব্যথিত অপর্ণা দেখেছিল আরেকটি সোপান: 'এই-যে সোপান বেয়ে রক্তচিহ্ন দেখি / এ কি তারই রক্ত?' দেবীমন্দিরের এই পাষাণসোপানের সঙ্গে রঘুপতির ললাটের সাদৃশ্যবোধ একই সঙ্গে অপর্ণা আর রঘুপতির মন অনেকখানি চিনিয়ে দেয়, আর এ-ছবিটি মুক্তি পেয়ে যায় নাটকের অন্ত্য পর্যায়ে যখন রঘুপতিকে তার স্বভাবকারা থেকে বার করে আনে অপর্ণা: 'পিতা, চলে এসো', যখন রঘুপতি বলতে পারে 'পাষাণ ভাঙিয়া গেল, জননী আমার…'

অথবা যেমন 'রক্তকরবী'তে: যক্ষপুরীর যন্ত্রধ্বস্ত ছিন্ন মানুষগুলির প্রসঙ্গে পতঙ্গাদির তুচ্ছ ছবি অনেকবারই গড়ে তোলা আছে, কিন্তু কখনো কখনো তার ব্যবহার ঘটে চমৎকার নাটকীয় ধরনে। প্রথমে আছে খোদাইকরের দল, যারা 'কীটের মতো সুড়ঙ্গর ভিতর থেকে উপরে উঠে আসছে,' অল্প পরেই অধ্যাপক নিজেদের ভাবছেন 'নিরবকাশ-গর্তের পতঙ্গ', এইভাবে শ্রমজীবী আর বুদ্ধিজীবী এসে দাঁড়াচ্ছেন একই ভূমিতে। প্রতিতুলনায় নন্দিনীকে অধ্যাপকের মনে হচ্ছিল 'ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে'। হয়তো মনে পড়ে 'desire of the moth for the star'; নাটকের এই সূত্রপাতে কেবল ডানার চঞ্চলতাই আমরা জানতে পাই। কিন্তু পরিণামের মুখে ওই একই পতঙ্গের ছবি আবার প্রয়োগ করে সর্দার: 'এতদিন কীটের মতো নিঃশব্দে মাটির নীচে গর্ত করে সে চলেছিল, তাকে মরবার পাখা মেলতে শিখিয়েছ তুমিই, ওগো ইন্দ্রদেবের আগুন'। এখন আর সন্ধ্যাতারা নয়, এখন পুড়ে মরবার আগুন, এই ঈষৎ বৈষম্যের মধ্যে ঘটে গেছে অনেকখানি নাটকীয় অন্তর্ঘাত, এর ঘটনা এবং চরিত্র-পরিণতির ইঙ্গিত। আবার রাজার প্রশ্নের উত্তরে বিশু জানায় 'না রাজা, আমি রঞ্জনের ও-পিঠ, যে-

পিঠে আলো পড়ে না — আমি অমাবস্যা' তখন কেবল এইটুকু জানাই যথেষ্ট নয় যে কত ভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ অমাবস্যার প্রতিমায় জেনেছেন দুঃখকে এবং বিশু এ-নাটকে বহন করে আনে সেই দুঃখেরই সাধনরূপ। ওরই সঙ্গে এ-ও আমাদের লক্ষ করতে হয়, নানা অবসরে কেমন করে রঞ্জনের নামোচ্চারণ করে বিশু, কেন নিজের বিষয়ে তাকে বলতে হয় 'তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয়, মরীচিকা তখন সহজে ভোলায়', কেন নন্দিনীর 'কোথায় তুমি গেলে বলো তো' এই প্রশ্নের উত্তরে তাকে গেয়ে উঠতে হয় 'ও চাঁদ চোখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে।' কোনো কল্পমূর্তি নিয়ে নয়, দুঃখ তখন আসে একেবারে বাস্তব অভিজ্ঞতার আকৃতি নিয়ে। 'তোমার স্বপনতরীর নেয়েটি কে সে আমি জানি' চন্দ্রার এই বাঁকা কথাকে তখন একেবারে সরাসরি রিপুজাত বিভ্রম বলে গণ্য করা যায় না।

এর বিপরীত দিকে আছে, ধরা যাক, 'মুক্তধারা'র বাঁধটির পর্যায়ক্রমিক বর্ণনা। নাটকটির আদ্যন্ত জুড়ে দেখতে পাই এই বর্ণনার ঘটা, কখনো সে 'অসুরের মাথার মতো··· মাংস নেই, চোয়াল ঝোলা', কখনো-বা 'স্পর্ধার মতো' 'দানবের উদ্যত মুষ্টির মতো' 'আকাশের বুকে যেন শেল' 'সূর্যাস্ত-মেঘের বুক ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন উড়ন্ত পাখির বুকে বাণ বিঁধেছে' 'আকাশে লোহার দাঁত মেলে অট্টহাস্য করছে' 'যেন মস্ত একটা লোহার ফড়িং, আকাশে লাফ মারতে যাচ্ছে' 'রোদ্দুরের মদ খেয়ে যেন লাল' 'ভূতের মতো' অথবা 'যেন একটা বিকট চিৎকারের মতো'। 'কালের যাত্রা'য় রথের রশিটির বিচিত্র বর্ণনা এখানে মনে পড়ে হয়তো, কিন্তু সে-ব্যবহার থেকে এই প্রতিমাপুঞ্জ কতই পৃথক। এ কেবল একটি ছবির ওপর আরেকটি ছবি পরম্পরায় সাজিয়ে যাওয়া, অনুলম্বভাবে, এর মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছে না বা ভেঙে পড়ছে না কোনো নূতন অনুভূতির আঘাত। বিচ্ছিন্নভাবে ছবিগুলি চমৎকার, কিন্তু সমবেতভাবে তা সমাহারের চেয়ে বেশি কিছু নয়, তার মধ্যে নেই কোনো ক্রমিকতা অথবা বিষমতা। একমাত্র সঞ্জয়ের সংলাপে, যন্ত্রটিকে 'উড়ন্ত পাখির বুকে বাণ' হিসেবে লক্ষ করবার ফলে বর্ণনার চেয়েও একটু অতিরিক্ত আবহ যেন লাগল, যেন তার প্রিয় যুবরাজের বেদনাবিদ্ধ মূর্তির সঙ্গে সে মিলিয়ে নিতে পারল এই ছবি, নাট্য-অবসানে যাকে আমরা মনে করতে পারছি আয়রনি রূপে। কিন্তু অন্য ছবিগুলি এ-রচনায় আসে কবিতারই প্রতিমা হিসেবে, নাটকের নয়।

বলা যায় না যে নাটকে ব্যবহৃত সব প্রতিমাকেই হয়ে উঠতে হবে এই

অর্থে নাটকীয়, আবার কবিতাতেও অনেকসময়ে দেখা দিতে পারে নাটক। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' শবানুগামী রাবণের বর্ণনায় যখন শুনি 'বিশদ বস্ত্র বিশদ উত্তরী / ধুতুরার মালা যেন ধূর্জটির গলে' তখন তা নাট্যগুণান্বিত হয়ে ওঠে পূর্বতন দুই সর্গের সামঞ্জস্যে। মেঘনাদের মৃত্যুমুহূর্তে 'সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শংকরে' এবং সে-মৃত্যুর সংবাদ পাবার পর 'দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘজটাবলী / ভীষণ ত্রিশূলছায়া'। শিবাশ্রিত রাবণের উক্ত মূর্তিটি তখন আরেকটা ব্যাপক ক্রমানুসরণ পেয়ে যায়। তেমনি, নাটকেও অনেকসময়েই লঘুচালে ভেসে আসে কবিতার প্রতিমা।

তা আসে, কিন্তু এ-ও ঠিক যে এর অতিপ্রয়োগ থেকে রচয়িতা মুক্তির পথ খোঁজেন ভিতরে ভিতরে। রবীন্দ্রনাথের রচনা-ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, অল্প বয়সে তাঁর নাটকে অবিরল দেখা দিয়েছে অলংকরণস্বভাবী কাব্য-প্রতিমা, অনেক ক্ষেত্রেই যার কোনো স্পষ্ট অভিঘাত ছিল না। 'রাজা ও রানী'তে বিক্রম আবেগভরে বলেন :

নয়নপল্লবে লজ্জা ফুলদলপ্রান্তে
শিশিরবিন্দুর মতো, অধরের হাসি
নিমেষে জাগিয়া ওঠে, নিমেষে মিলায়
সন্ধ্যার বাতাস লেগে কাতরকম্পিত
দীপশিখাসম—

এমনি আরো সব। এ-কথাগুলি যেন আসে-যায় আপন খুশিতে এবং কুমার-সেনের এইসব সংলাপের থেকে তাকে স্বতন্ত্র করাও দুরূহ হয়ে ওঠে :

যেন মিশে রব
সুখস্বপ্ন হয়ে ওই নয়নপল্লবে।
হাসি হয়ে ভাসিব অধরে। বাহু দুটি
ললিত লাবণ্যসম রহিব বেড়িয়া,…

এমন-কী, বোঝা যায় না কী করে বিক্রম 'রমণীর প্রেম' প্রসঙ্গে এখনো বলতে জানে :

সেই নদী দেশের কল্যাণপ্রবাহিণী
সেই বায়ু জীবের জীবন।

চরিত্রগত ভিন্নতা অথবা কোনো চরিত্রের বিশিষ্ট পরিচয়, কোনোটাই আয়ত্ত হয়নি এই ধরনের নির্বিচার ব্যবহারে।

তাই, কাব্যনাটক থেকে অতিক্রান্ত হয়ে আসবার প্রথম মুহূর্তে এই একটা লক্ষণ খুব স্পষ্ট হলো রবীন্দ্ররচনায়: প্রতিমারই প্রয়োগ এল কমে। 'শারদোৎসব' 'ডাকঘর' বা 'ফাল্গুনী'তে যে ভাষা হয়ে এল অনেকটাই উপমাবিহীন তা নিতান্ত আকস্মিক ছিল না। অলংকরণ ছিল অবশ্য 'অচলায়তন' বা 'রাজা'য়, আর 'মুক্তধারা'-'রক্তকরবী'র উপপর্বে আবার এর প্রয়োগ দেখা দিল প্রগল্ভ উত্তেজনায়। কিন্তু এসবের মধ্যে বাহুল্যদোষ কখনো কখনো দেখা দিলেও বলা যায় না যে পুরোনো ধরনে সাজিয়ে-বলাই এর প্রধান লক্ষণ।

বিন্যাসের অন্তত একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করলে বোঝা যাবে কাব্যনাটকগুলির প্রতিমারীতি থেকে কোথায় এরা স্বতন্ত্র। এসব নাটকে ছবির যে-সমাহার তৈরি হয় তার মধ্যে অন্য এক ধরনের সামঞ্জস্য গড়ে উঠেছে অলক্ষ্যে। আপাতবিচ্ছিন্ন চিত্রমালার মধ্যে প্রায়ই থেকে যাচ্ছে নিহিত এক ঐক্য, হয়তো ধরা পড়েছে সমস্তটা অবয়ব জুড়ে একটি-দুটি প্রতিমার অনর্গল আবর্তন এবং সে-দিক থেকে সাজিয়ে নিতে পারলে অনেকসময়ে ওই সব ছবির মধ্যেই পাওয়া যায় নাট্যাবলির বিষয়সূত্র।

যেমন 'অচলায়তন'-এ ঘুরে ঘুরে আসে পাথর আর আকাশ। এই হচ্ছে তার দুই প্রধান প্রতিমা যা কেবলই শুনতে পাই সংলাপে, বর্ণনা হিসেবে নয়, অন্য বিবরণের প্রয়োজনে অভিজ্ঞতা হিসেবে। আর, এই প্রস্তরীভূত জড়তাকে আকাশব্যাপী মুক্তির সন্ধানে বিচলিত করে তোলাই তো নাটকটির অভিপ্রায়। সংগতি কেবল এটুকু নয় যে উপমান হিসেবে বারংবার মিলছে আকাশ পাথর শব্দদুটি। এই পাথরের ছবি যে কেবলই আসে আচার্যের দ্বন্দ্বাতুর বেদনায় আর আকাশের আনন্দ যে উদ্‌বেলিত হয়ে ওঠে পঞ্চকের নির্ভার অনায়াস স্বভাবে, তা থেকে দুই চরিত্রের ভিতরে প্রবেশ করাও সহজ হয়।

অথবা যেমন 'রাজা' নাটকে অন্ধকার আর আগুন। ঠিক যে এই ছবিদুটিই সবসময়ে পাওয়া যাবে তা হয়তো নয়, কিন্তু পাওয়া যাবে এই দুই শ্রেণীর সমান্তরাল বিন্যাস। আর এ-নাটকের ভাবনা অনুযায়ী অন্ধকার এখানে হয়ে ওঠে গাঢ়তর জীবনের সূচক, এই তার ধ্রুব আশ্রয়, তুলনায় আগুন বা তীব্র আলোকের আভা হয়ে দাঁড়ায় অধ্রুব বিপন্নতার সংকেত। সুরঙ্গমার 'যেন ছুঁচ ফোটাত, আগুনে পোড়াত' থেকেই শুরু হয়ে যায় সেই সংকেত এবং ততক্ষণ পর্যন্ত সুদর্শনার মুক্তি নেই যতক্ষণ সে দেখে 'পূর্ণিমার আলো মদের ফেনার মতো চারিদিকে উপচিয়ে পড়ছে' বা রোহিণীর চোখে 'চারদিকের দিগন্ত মাতালের

চোখের মতো' লাল। আগুনের মতো লজ্জা, ধূমকেতু-ওঠা আকাশ, রাগের আগুন জ্বলে ওঠা, নক্ষত্রের পতনের মতো অগ্নিময়—এই হচ্ছে সুদর্শনার ভাষা। 'অন্ধকারের মতো কথা, অর্থই বোঝা যায় না' এই উচ্চারণ থেকে যখন সে বউকথাকও পাখি 'কেবলই ডেকেছে—সে যেন অন্ধকারের কান্না' বলবার যোগ্যতায় পৌঁছল, কেবল তখনই তার অব্যাহতি।

'রাজা'র অন্ধকার ধ্রুব অন্ধকার, 'রক্তকরবী'তে তা নষ্ট দক। 'রাজা'র অন্ধকার চরিত্রের নিভৃত কেন্দ্র, 'রক্তকরবী'র অন্ধকার সমাজের ধ্বস্ত গহ্বর। তাই মুক্তিসংকেত 'রাজা'তে আসে অন্ধকার ঘরের রূপে, 'রক্তকরবী'তে তা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে উন্মোচিত ফুল। তাই 'রক্তকরবী'র প্রতিমা-প্রয়োগে উলটে যায় আলো-অন্ধকারের ধরন। এর সঙ্গে খানিকটা যোগ তৈরি হয় বরং 'অচলায়তন'-এর, যেখানে আচার্য বিষয়ে বলতে পারে পঞ্চক, 'যেন বাইরের আকাশটাকে তিনি আমার মুখের মধ্যে দেখে নেন'। সেইরকমই, 'নীল চাঁদোয়ার নিচে খোলা মদের আড্ডা' হারিয়ে গেছে যক্ষপুরীতে, কেবল বিশু-নন্দিনীর 'মাঝখানটাতেই একখানা আকাশ বেঁচে আছে'।

৪

'ভালো নাটকের প্রতিটি কথা যেন বাদাম বা আপেলের মতো ভরে-ওঠা' এই ছিল নাটকবিষয়ে সিঙের সংজ্ঞা। কিন্তু তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন একদিকে ইবসেনের মনীষাময় রচনার শীর্ণতা, অন্যদিকে সাংগীতিক কমেডির মিথ্যা বিলাস। কোথায় পাওয়া যাবে এর মধ্যপথ? আমাদের দেশেও রুগ্‌ণ বাস্তবতা আর নির্দায় গীতিপ্রমোদের মধ্যবর্তী অনুরূপ সংকটেই ছিল রবীন্দ্রনাথের নাট্যচর্চা। তাঁকে কাজ করতে হয়েছে একলা, এক জীবনেই তিনি পরিক্রমা করে নিয়েছেন এলিজাবেথীয় নাটকের ধরন থেকে বিশশতকী প্রকাশবাদী নাটকের জগৎ পর্যন্ত। এই প্রগতির ফলে তাঁর নাটকের সামগ্রিক অবয়বে সঞ্চারিত হয়ে গেছে এক নূতন বিন্যাস, একেবারেই তাঁর নিজস্ব ধরনে। এই 'নিজস্ব' ধরনটিকে লক্ষ্যে রাখলে বুঝতে পারব কেন মেটারলিঙ্কের সঙ্গে সর্বাংশে তিনি তুলনীয় নন। চরিত্র বা ঘটনায় প্রচলিত দ্বন্দ্বগতির অভাব গণ্য করে রবীন্দ্রনাটককেও যদি মেটারলিঙ্কের সংজ্ঞামতো স্থাণু নাটক হিসেবে বিচার করি তো ভুল হবে. যেমন ভুল হবে প্রথানুগত নাটকবিচারের পদ্ধতি তাঁর ওপর আরোপ করা। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ অর্জন করে নিচ্ছিলেন স্থিতি ও গতির দ্বন্দ্বে জাত এক বিশেষ ধরন, বাস্তবে

আনন্দে মেলানো এক গড়ন। তাই একই সঙ্গে তিনি প্রকাশ করতে পারেন শেক্সপীয়রের জগৎ ছেড়ে আসবার ইচ্ছে, আবার তাঁর সৃষ্ট কোনো চরিত্রের সঙ্গে লেডি ম্যাকবেথের তুলনার ভাবনা।

এইজন্যেই মেটারলিঙ্ক বা স্ট্রিণ্ডবের্গ, কাইজার বা ও'নিলের তুলনায় তাঁর নাটকে ভাষা হয় অনেক বেশি চিত্রময়, অলংকারবহুল। স্ট্রিণ্ডবের্গের 'স্বপ্ন নাটক' মনে করিয়ে দেয় বটে 'রক্তকরবী'র নাট্যবিষয়, দুয়ের সাদৃশ্য অনেকটাই কিন্তু কত বেশি ভারহীন চলনে এগোতে চায় স্ট্রিণ্ডবের্গের সংলাপ। পৃথিবীতে এসে ইন্দ্রকন্যা প্রশ্ন করছে আত্মরচিত দুর্গে বন্দী অফিসারকে : 'আমার মধ্যে কী দেখছ ?' উত্তরে অফিসার বলেন : 'দেখছি সুন্দরকে, যা এনে দিচ্ছে বিশ্বের ছন্দ। তোমার শরীরের রেখায় আমি দেখতে পাই নক্ষত্রের চলা, তারের ঝংকার, আলোকের স্পন্দন। তুমি স্বর্গের নন্দিনী।' আমাদের নিশ্চয় এরই সঙ্গে মনে পড়বে 'রক্তকরবী'র সমান্তরাল সংলাপকটি :

নন্দিনী। আমার মধ্যে কী দেখছ ?

নেপথ্যে। বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে-ছন্দ বাজে সেই ছন্দ।

নন্দিনী। বুঝতে পারলুম না।

নেপথ্যে। সেই ছন্দে বস্তুর বিপুল ভার হালকা হয়ে যায়। সেই ছন্দে গ্রহনক্ষত্রের দল ভিখারি নটবালকের মতো আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই নাচের ছন্দেই, নন্দিনী, তুমি এমন সহজ হয়েছে, এমন সুন্দর।

খুবই সদৃশ, কিন্তু প্রভেদ এই যে 'স্বপ্ন নাটক'-এ এদের পারস্পরিক সংলাপ ওই একবার উদ্‌বেল হয়ে ওঠে প্রতিমাবিন্যাসে, 'রক্তকরবী'তে এ-উদাহরণ অনেকের একটিমাত্র।

তেমনি প্রভেদ মেটারলিঙ্কের 'ত্যাঁতজিলের মৃত্যু' আর রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'য়। মেটারলিঙ্কের নাটকটিতে রানীকে দেখা যায় না কোথাও, রবীন্দ্রনাথে যেমন রাজাকে, এঁদের বুঝে নিতে হবে কেবল দৃষ্ট চরিত্রাবলির সংলাপে।

আমি কি ওঁকে দেখতে পাব না !

কেউ ওঁকে দেখতে পায় না।

কেন কেউ দেখতে পায় না ?…খুব কি কুৎসিত উনি ?

শোনা তো যায় সুন্দর নন, একটু কিম্ভূত আকৃতির। যারা দেখেছে তারা কথা বলতে সাহস পায় না। আর, দেখেছে কি না তাই বা

কে জানে। আমরা কেউ বুঝতে পারি না এমন একটা ক্ষমতা ওঁর আছে।

বোন দুটির এই কথাবার্তা শুনে 'রাজা' নাটকের অনেক অংশই মনে পড়ে, একটি যেমন :

সুদর্শনা। আচ্ছা সুরঙ্গমা, মাথা খা, সত্যি করে বল্ আমার রাজাকে দেখতে কেমন। আমি একদিনও তাঁকে চোখে দেখলুম না।··· সবাই যেন কী একটা লুকিয়ে রাখে।

সুরঙ্গমা। আমি সত্যি বলছি রানী, ভালো করে বলতে পারব না। তিনি কি সুন্দর—না, লোকে যাকে সুন্দর বলে তিনি তা নন।

সুদর্শনা। বলিস কী! সুন্দর নন?

সুরঙ্গমা। না রানীমা! সুন্দর বললে তাঁকে ছোটো করে বলা হবে।

সুদর্শনা। তোর সব কথা ওই একরকম। কিছু বোঝা যায় না।

সুরঙ্গমা। কী করব মা, সব কথা তো বোঝানো যায় না।

এইরকম আরো অনেক। কিন্তু ওই সঙ্গে লক্ষণীয় যে মেটারলিঙ্কে আছে রানীর ভয়, মৃত্যুর ভয়; রবীন্দ্রনাথ দেখান রাজার রহস্য, জীবনের রহস্য। তাহলেও, এই যে একই গোপনীয়তার বিবরণ গাঁথা হয় দুই নাটকে তার ব্যবহারভঙ্গি কতই পৃথক। 'Tintagiles'-এর চরিত্রগুলি শাদা কথায় বলে যায় তাদের ভয় ভাবনা, কিন্তু ঠিক একই ধরনের কৌতূহল আর জিজ্ঞাসায় রাজা-প্রসঙ্গে উঠে আসে কত ছটাময় বাক্‌বিন্যাস, তাঁর অদৃশ্য রূপকে বুঝে নেবার কত বহুল আয়োজন : 'নববর্ষার দিনে জলভরা মেঘ' 'ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো' 'ঝড়ের মেঘের মতো, কূলশূন্য সমুদ্রের মতো' 'পর্বতের মতোই চিরদিন কঠিন' 'কালবৈশাখীর মতো'। এই রাজাকে দেখে 'দেশসুদ্ধ লোকের আত্মাপুরুষ বাঁশপাতার মতো হী হী করে' কাঁপে না কেন, কারো-বা এই ভাবনা।

এসব অলংকরণে, অন্তত 'রাজা' নাটকে তো বটেই, বিবৃত উপমার কিছু প্রাধান্যই দেখি। সিঙের নাটকে অনুরূপ পক্ষপাত থেকে সমালোচকেরা ধরতে চান, শেক্সপীয়রের নাটকীয়তা এবং তাঁর রীতির ব্যবধান কতটা। কিন্তু স্ট্রিণ্ডবের্গ-মেটারলিঙ্কের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের এই অভ্যাস বরং আমাদের রোম্যাণ্টিক উত্তরসাধনারই চিহ্ন দেখিয়ে দেয়। সিঙ তাঁর ডায়েরিতে ভাবছিলেন 'romance of reality'র আদর্শ, একটু ভিন্ন চালে রবীন্দ্রনাথও খুঁজে নিচ্ছিলেন

এক বাস্তবের রোম্যান্স, তারই আভাস ছড়িয়ে থাকে তাঁর নাট্যময় প্রতিমা-পুঞ্জে। এর একটা বড়ো সফলতা এই ঘটে যে কখনোই এক অনতিচিহ্নিত তত্ত্ব-আবেগের প্রবলতা আমাদের বুক চেপে ধরে না, যেমন ধরতে পারে মেটারলিঙ্কের শ্বাসরোধী জগৎ। জীবনের নির্যাসস্বরূপ কোনো ভাবনাকে নাটকের কেন্দ্র করে তুলেও তার পরিধিতে যেমন তিনি জুটিয়ে নেন বহুল চরিত্র ও ঘটনা, তেমনি সংলাপে রাখা উপমানগুচ্ছে তিনি অলক্ষ্যে গড়ে তোলেন চিত্ররূপময় আমাদের এক পরিচিত জগৎ। তবে এতটা নিশ্চয় বলা যাবে না যে এমন কোনো কথাই আনেন না রবীন্দ্রনাথ যা তিনি নিত্য শোনেননি পথচলতি মানুষের মুখে, ভাষার কাঠামোতে ততদূর পর্যন্ত বাংলাদেশের গ্রাম-জীবনের মধ্যে আত্মস্থ নন তিনি।

কেন নন? আইরিশ জাতীয়-থিয়েটার প্রতিষ্ঠার জন্য সিঙ ইয়েট্স বা লেডি গ্রেগরি যে-ধরনের উত্তেজনা বোধ করছিলেন, স্পেনে যে-চেহারা ধরা ছিল লোর্কার নাটকে, রবীন্দ্রনাথের রচনাতে আছে তার আভাস। দেশের আত্মাকে স্পর্শ করবার জন্য এঁরা ভেঙে দিলেন বাস্তবপন্থী মধ্যবিত্ত নাটকের ধরন। পরিকল্পনার দিক থেকে সিঙ বা লোর্কার মতো ঠিক ততটাই হয়তো সুবিন্যস্ত নয় রবীন্দ্রনাথের নাটকচর্চার ইতিহাস, কিন্তু আমাদের ছেলেমানুষি মঞ্চক্রীড়ার পাশে পাশে তাঁর চেষ্টাও অনেকটা ওঁদের ধরনের প্রচ্ছন্ন জাতীয় সত্তাকে আবিষ্কার করবারই সাধনা। তবু, বিষয়ে বা প্রতিমাবিন্যাসে ওঁরা যেভাবে তুলে আনেন বহতা জীবন, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তা ততটাই সম্ভব হয় না খানিকটা ঐতিহাসিক কারণে। লোর্কা ভুলেই গিয়েছিলেন যে তাঁর 'অবিশ্বাসিনী রমণী' কবিতার প্রথম তিন লাইন হুবহু লোকবচন থেকে তুলে নেওয়া, ভাগ্যক্রমে এতটাই ঐক্যময় এক সংস্কৃতিতে ছিল তাঁদের শিকড়। আর রবীন্দ্রনাথ, যদিও এই শিকড়ের সন্ধানী, তবু আর অনেকের মতো তাঁকে জীবনযাপন করতে হলো এক বহু-স্তরে-ভাঙা সংস্কৃতির বিপন্নতায়। তাঁর ভাষা তাই সরাসরি নিয়ে আসে না মৌখিক স্পন্দ, তাকে ধরতে চায় একটু ঘুরোনো পথে। সেই পথে তাঁর চিত্রজাত অভিজ্ঞতার নানাত্বে জীবনের এক প্রত্যক্ষতাই সঞ্চারিত হতে থাকে নাটকে প্রযুক্ত প্রতিমাবলি থেকে।

যদিও, কখনো কখনো 'নাটকে প্রযুক্ত প্রতিমা' বলবার আর কারণ থাকে না, কখনো তাঁর গোটা নাটকটাই হয়ে ওঠে যেন এক বিশদ প্রতিমা। যাকে ঠিক ঠিক প্রতিমা রূপে চিহ্নিত করা সম্ভব, এক অভিজ্ঞতা দিয়ে আরেক

অভিজ্ঞতাকে বুনবার জটিলতা, তেমন কোনো প্রয়োগ অল্পই আছে 'শারোদৎসব' 'ডাকঘর' বা 'ফাল্গুনী'তে। 'তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে যেন সকাল-বেলাকার তারা'—এ-রকম যে দু-চারটি ছবি মেলে 'ডাকঘর'-এ, তার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি হয়ে থাকে তার প্রাত্যহিক কথোপকথনের স্বচ্ছন্দলীলা। কেন এমন ঘটেছে ? একটা কারণ এই হতে পারে যে 'শারদোৎসব' থেকে শুরু হলো তাঁর নূতন নাটকের যুগ, তার গড়ন ভিন্ন, তার চলন গদ্যে। মনে হতে পারে যে কবিতাময় আবহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আসবার এক আকাঙ্ক্ষাই এই বিশিষ্টতা তৈরি করে। কিন্তু সেটা সে সম্পূর্ণ সত্য নয় তা বুঝতে পারি এর বিষয় লক্ষ করে, এর গদ্যের চাল দেখে। কবিতা থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার ইচ্ছেয় নয়, হয়তো কাব্যিকতা থেকে অবসরের জন্য এই স্বাতন্ত্র্য, কিন্তু তারও চেয়ে বড়ো কথা এই যে উক্ত তিন নাটকে বিস্তীর্ণ প্রকৃতি এবং জীবনভূমি প্রত্যক্ষ বর্ণনাতেই চলে আসে আমাদের সামনে, এইখানে বরং বাংলাদেশের গ্রামীণ সংলগ্নতা প্রকাশ পেতে থাকে অনায়াস স্ফূর্তিতে। প্রকারান্তরে সেইটেই হয় নাটকগুলির উপজীব্য, তাই এসব নাটকে জীবন আর প্রকৃতি সহজেই একটা কাঠামো তৈরি করে নেয় দর্শকের চোখের সামনে। এই কাঠামোকে যে মঞ্চের উপর দৃশ্যগোচররূপে সব সময়ে সাজিয়ে তুলতে হয় তাও নয়, খুব সহজেই শোনা থেকে দেখায় পর্যবসিত হয়ে যায় এর কথামালা।

আর তারপর, 'মুক্তধারা' থেকে 'বাঁশরি' পর্যায়ের পরে, ভাষায় কিছুটা অলংকরণ কিছু-বা চমকচাপল্যের পরে, তৈরি হয় নৃত্যনাট্যের বিন্যাস। বলা যায় না যে এই অন্ত্যকালীন 'চিত্রাঙ্গদা' 'চণ্ডালিকা' 'শ্যামা'র সংলাপ অংশ 'ডাকঘর'-এর মতোই নির্ভার হয়ে এল, কিন্তু এ-ও ঠিক যে পুরোনো 'চিত্রাঙ্গদা' 'চণ্ডালিকা'র তুলনায় নতুন এই নৃত্যনাট্যগুলি বিবৃত বিস্তার ছেড়ে ভাষাকে করে নিতে পারল অনেক বেশি ক্ষিপ্র। এখানে ব্যবহৃত প্রতিমাগুলি তাদের সঙ্গে নৃত্যাভিনয়ের সহযোগ পাচ্ছে বলে এবার অন্য এক নাটকীয় সংঘর্ষ তৈরি হতে থাকে মঞ্চে। 'ডাকঘর'-এ যেমন গোটা নাটকটিই, এইখানে এসে তেমনি যেন সমস্ত প্রযোজনাটিই চোখের সামনে গড়ে তুলছে এক সম্পূর্ণ প্রতিমা, যার প্রাণ জেগে উঠতে থাকে ভাষায় পাওয়া ছবিকে সচল নৃত্যের মধ্যে ধরে দেওয়ায়। দেখা আর শোনায় নিরন্তর যাওয়া-আসার মধ্য দিয়ে ছবিগুলি মুক্তি পেতে থাকে স্পন্দনময় জীবনের দিকে।

১৯৬৯

পথ : প্রতীক ও পটভূমি

রচনার সময়ে 'মুক্তধারা' নাটকটির নামই যে ছিল 'পথ' বা 'পথমোচন', তার একটা কারণ বোঝা যায় এর বিষয় থেকে। অভিজিৎ বলেছিল দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়ে ভাবীকালের পথ দেখতে পাচ্ছে—দূরকে নিকট করবার পথ। নামের ভিতরেই তাহলে ধরা ছিল এই সত্য জীবনের দিকে পথ খুলে দেবার এক ইঙ্গিত।

কিন্তু পরিকল্পিত ওই নামটির আরেক সূত্র আছে দৃশ্যসংস্থানের মধ্যে। উত্তরভৈরব মন্দিরে যাবার একটিমাত্র পথের উপর এই নাট্যঘটনার সম্পূর্ণ পরিণাম, এর একমাত্র পটভূমিই পথ। ওই সঙ্গে আবার ভেবে দেখতে হয়, এই পটভূমিকেই কতদূর বিষয়ের প্রতীক করে তোলা হলো এ-নাটকে। বস্তুত রবীন্দ্ররচনায় 'পথ' যে-ভাবে ব্যবহৃত, তার ভঙ্গি ত্রিমুখী। কখনো তা আসে নিছক দৃশ্যপট হিসেবে, কখনো তা নাটকের বিষয়ও বটে, আবার কখনো প্রতীক : পটই হয়ে ওঠে বিষয়ের প্রতীক। তাঁর নাট্যচর্চার ইতিহাস অনুসরণ করলে এই তিন ভঙ্গিরই বিকাশ লক্ষ করা যায়। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, এ-তিনটিকে একত্র সমন্বিত করে নেবার সম্ভাবনাকেও কতটা তিনি ব্যবহার করেন।

টমসনই সম্ভবত প্রথম লক্ষ করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাট্যকলায় বাংলাদেশের একটি নিজস্ব জীবনমান তৈরি আছে, কেননা তাঁর নাটকের কোনো কোনো দৃশ্য রচিত হয় মেলার কাঠামোয়। 'মেলা' শব্দটিতে হয়তো খানিকটা আতিশয্য লাগে, আসলে প্রতিদিনের চলচ্ছবিকে তিনি স্পর্শ করেছেন কেবল জনচরিত্রের ভিড়ে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ সন্ন্যাসীর গুহা-আশ্রয় সরে গেলেই তাঁর চোখের সামনে দেখা দিতে থাকে ভিন্ন ভিন্ন জনতাপুঞ্জ, তারা মঞ্চের ভিন্ন ভিন্ন কোণ জুড়ে একই সঙ্গে দাঁড়িয়ে থেকে জ্ঞানচর্চা কিংবা পরচর্চা করে, পরিহাসে কিংবা ষড়যন্ত্রে মাতে। এই আদিকাল থেকে শুরু করে 'শারদোৎসব' 'ডাকঘর' 'মুক্তধারা' প্রায় সর্বত্রই নাট্যপথের দুমুখ থাকে খোলা, যেন

জীবনের বিচিত্র অঞ্চল থেকে উঠে-আসা মানুষগুলি চলাচলের মধ্য দিয়ে ক্ষণকালের জন্য এখানে মিলিত হয়ে চলে যায়। এরা ঠিক শেক্সপীয়রের জনতার তুল্য নয়, অথবা গিরিশচন্দ্রের গণচরিত্রের চেয়েও এরা ভিন্ন। নাটকের প্রয়োজনে নিবিড় সংযমে এদের গ্রথিত বলে সব সময়ে বোধ হয় না। বরং একটু হেলাফেলা আপাতশিথিল ভঙ্গিতেই এরা ছড়ানো থাকে যেন জীবনরঙ্গের এক ব্যাপক আভাস দেখাবার জন্যে। দর্শকেরও সঙ্গে এদের পরিচয় সম্ভব কেবল দু-দণ্ডের পথে। লৌকিক বাংলাদেশ যে রবীন্দ্রনাটকের আশ্রিত বিষয়, তার একটা বড়ো লক্ষণ আছে এইখানে।

পথের এই ছবি প্রসঙ্গে মনে পড়ে পশ্চাপট বিষয়ে ব্রেখ্‌টের ভাবনা, মিলিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয় তাঁর প্রয়োগরীতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ধরন। ব্রেখ্‌ট নাটকে তুলে আনতে চেয়েছিলেন পথচল্‌তি প্রবাহ, কেননা তিনি ভেবেছিলেন যে এর সাহায্যেই আভিনয়িক মায়া অনেকটা সরিয়ে দেওয়া যাবে। রাস্তার কোণ থেকে তুলে-আনা এই ব্রেখ্‌টীয় এপিক থিয়েটারের ভঙ্গি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নয়। অবশ্য শান্তিনিকেতনে 'ফাল্গুনী' নাটকের প্রযোজনায় (অথবা অন্য নাটকেও) কখনো রবীন্দ্রনাথ এমন-কী বিধিসম্মত মঞ্চ পর্যন্ত বাঁধেননি। দর্শকদের সঙ্গে অবাঞ্ছিত ব্যবধান কমিয়ে আনবার জন্য খোলা গাছ-মাঠ-পথের পটকেই তিনি করে নিয়েছিলেন অভিনয়ভূমি (তুলনীয়: 'দেয়ালের সামনে যে-কোনো খোলা জায়গাই হতে পারে রঙ্গমঞ্চ' ইয়েট্‌স)। এ-পদ্ধতি আসলে দর্শককেও নাটকের অঙ্গীভূত করে নেবার পদ্ধতি, উলটো পক্ষে ব্রেখ্‌ট চান নাটককেই দর্শকের অংশ করে নিতে। তবে অন্যদিক থেকে ভাবতে গেলে ব্রেখ্‌ট-প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাটকবিচারে অনেকটা কাজে লাগে। জার্মান এই নাট্যকার যেমন দেশীয় নাট্য-ঐতিহ্যের অভিজাতচর্চা আর লৌকিক রীতির দুই বিপরীত দিককে একত্র মেলাতে চেয়েছিলেন তাঁর নাটকে, স্পেনীয় নাটকে যেমন লোর্কা, রবীন্দ্ররচনার মধ্যেও তেমনি বাংলার যাত্রা-স্বভাব এবং গুরুতর মননমূল নাট্যরীতির এক নবীন সমন্বয় তৈরি হচ্ছিল ক্রমশ।

অর্থাৎ যাত্রার অনেক ব্যবহার্য রীতিকে রবীন্দ্রনাথ পরিশীলিত শুদ্ধতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন, তাকে উন্নীত করে নিয়েছেন স্বতন্ত্র এক দেশীয় রীতিতে। তাঁর পথের ব্যবহারেও জটিল এই দোটানা আছে বলে বোঝা যায়। সেইজন্যে একদিকে যেমন তিনি বিভিন্ন গোত্রের ছোটো ছোটো হাসি-খুশি দলগুলি পাঠিয়ে দেন নাট্যচরিত্র হিসেবে, মনে পড়ে যাত্রাস্বভাব, তেমনি অন্যদিকে এই

পটভূমি পথের সাহায্যে ক্রমে তিনি তৈরি করেন এক ধরনের গাঢ়তর স্থানিক সংহতি। পরিণতির অভিমুখে একদিকে যেমন তিনি বেঁধে নিয়েছেন কালের সংযম, তেমনি ওরই সঙ্গে গড়ে তুলেছেন স্থানেরও ঐক্য। এ-ঐক্য নিশ্চয় সর্বার্থে গ্রীক ঐক্য নয়, তবু এর ফলে সদৃশতার একটা আভাসও যে এসে যায়, তা-ও ঠিক। গ্রীক নাট্যকলার সঙ্গে যে রবীন্দ্রনাটকের তুলনা কোনো কোনো পশ্চিমি সমালোচকের মনে আসে, তার কারণ তখন খানিকটা বোঝা যায়।

ক্রমিক এই সীমাসংহতির ইঙ্গিত স্পষ্ট হয় যখন দেখি উত্তরপঞ্চাশ বয়সে 'বিসর্জন'-এর ইংরেজি অনুবাদে পাচ্ছি এক ছেদবিহীন ধারাবাহিক ঘটনাক্রম। 'রাজা ও রানী' আর 'বিসর্জন'-এর পঞ্চাঙ্ক-বিন্যাস ভেঙে গেল 'চিত্রাঙ্গদা' বা 'মালিনী'তে পৌঁছে, এবং 'শারদোৎসব' থেকে শুরু হলো নাটকের যে-নতুন গড়ন তার মধ্যে দৃশ্যসংখ্যা নিয়মিতভাবেই কমে এল, ব্যতিক্রম কেবল 'রাজা'। 'শারদোৎসব' আর 'ফাল্গুনী'তে দেখা দিল প্রকৃতিময় পথ, 'অচলায়তন' 'রাজা' আর 'ডাকঘর'-এ আছে ঘর-পথের যমক দৃশ্য। 'অচলায়তন' আর 'রাজা'য় এরা পর্যায়ক্রমে আসে বিবাদ নিয়ে, কখনো ঘর কখনো পথ, কিন্তু 'ডাকঘর'-এ যেন এরা মুখোমুখি থাকে একবিন্দুর সংঘাতে। 'মুক্তধারা' আর 'রক্তকরবী'তে পথই চলে এল সামনে, ঘর হলো আড়াল।

এ কোন্ পথ? এ কি প্রতীকী পথ? সমস্ত নাট্যঘটনাকে ক্রমে একটি পথপ্রবাহের মধ্যে সংকলন করে কবি নিশ্চয় শিল্পসংহতির পরিচয় রাখছিলেন। কিন্তু তাঁর গূঢ় ভাবনাস্বরূপকেও কি ওরই সাহায্যে তিনি ধরতে পারছেন? অর্থাৎ ওখানে পথ কি কেবল দৃশ্যরূপ মাত্র, নাকি ওইসঙ্গে তত্ত্বরূপও বটে?

২

রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছেন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সন্ন্যাসী, কিন্তু তিনি বিচ্ছিন্ন বোধ করেন তাঁর পুরোবর্তী জীবনপ্রবাহ থেকে, বলে ওঠেন :

পথ দিয়ে চলিতেছে এরা সব কারা!
এদের চিনি নে আমি, বুঝিতে পারি নে
কেন এরা করিতেছে এত কোলাহল।
কী চায়? কিসের লাগি এত ব্যস্ত এরা?

যেন তার উত্তর দেবার জন্যেই তখন পরম্পরায় আসে কৃষকদের 'হেদে গো নন্দরানী' গান আর জীবনযাপনে মত্ত স্ত্রী-পুরুষের দল। এই একই প্রসঙ্গ

আরেকটু পরিণত হয়ে ওঠে 'বিসর্জন' নাটকে, যখন জয়সিংহ তার কারাতুল্য মন্দিরপ্রাঙ্গণ থেকে নেপথ্যে দৃষ্টিক্ষেপ করে বলে :

> কোথা যাও ভাই-সব ? মেলা আছে বুঝি
> নিশিপুরে ? কুকীরমণীর নৃত্য হবে ?
> আমিও যেতেছি···

যেতে অবশ্য সে পারে না, কিন্তু এখানে দৃশ্যের অন্তরালবর্তী যে পথের ভাবনা কাজ করে, তারই প্রতীকরূপ দেখতে পাই 'অচলায়তন'-এ দর্ভকপল্লির পথে অথবা 'রক্তকরবী'র দূর থেকে ভেসে আসা মাঠের বাঁশিতে। জয়সিংহেরই বেদনা নন্দিনী সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছিল রাজার মনে, সেই মুহূর্তে তা সে পারেনি যদিও। আর 'মুক্তধারা'য় এই আহ্বানের ভাষা শোনা যায় দিগন্তবর্তী পাহাড়ের উপর মূর্ছিত নীল পথে। তাহলে জয়সিংহের ওই সংলাপেরই পরিণতি হিসেবে একদিন আমরা পাই পঞ্চকের 'এ পথ গেছে কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে' অথবা আরো পরে আরো একটু সংবৃতভাবে 'রক্তকরবী'র 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' গান। 'বিসর্জন' থেকে 'রক্তকরবী' পর্যন্ত পৌঁছতে নাট্যরীতির যে-বিবর্তন ঘটে গিয়েছে, তারই ফল হিসেবে ওই বিভোর সংলাপ শেষ পর্যন্ত সংহত হয় আত্মস্থ সংগীতে।

খোলা পথে মুক্তির আহ্বান 'বিসর্জন' নাটকে দৃশ্যরূপ নিয়ে সামনে আসে না, 'অচলায়তন'-এ কখনো কখনো আসে। তবে কি 'মুক্তধারা' আর 'রক্তকরবী'তে দৃশ্যের সেই চরিতার্থতা অর্জিত হলো ? পথের তত্ত্বকে পূর্ণ দৃশ্যমান করবার জন্যই কি এখন এক-দৃশ্য এক-আয়তনে সংকলিত হচ্ছে সমস্ত ঘটনা ?

না, 'মুক্তধারা'য় দৃশ্যরূপ পথ প্রতীক-পথ নয়। লক্ষ করতে হবে যে কালের দিক থেকে এ-নাটকের সংহতি যেমন বিশেষভাবেই বাস্তব সংহতি, মঞ্চকাল ও নাট্যকালকে সমতাময় করে তুলবার সাধনায় যেমন কবি এখানে সফল, স্থানের দিক থেকেও তেমনি বাস্তবতার চেহারাই এখানে নিপুণভাবে ধরা আছে। পটভূমি নির্মাণে কোনো ন্যায়বিন্যাসের অভাব নেই এখানে, মঞ্চনির্দেশ এখানে অনেকটাই বিশদ :

> উত্তরকূট পার্বত্য প্রদেশ। সেখানকার উত্তরভৈরব-মন্দিরে যাইবার পথ। দূরে আকাশে একটা অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথাটা দেখা যাইতেছে এবং তাহার অপরদিকে ভৈরব-মন্দির-চুড়ার ত্রিশূল। পথের পার্শ্বে আমবাগানে রাজা রণজিতের শিবির। আজ অমাবস্যায়

ভৈরবের মন্দিরে আরতি, সেখানে রাজা পদব্রজে যাইবেন, পথে শিবিরে বিশ্রাম করিতেছেন।...

তাঁর প্রায় কোনো নাটকেই পটনির্মাণের এমন বিস্তৃত চেষ্টা দেখি না এবং সেই-জন্য যেমন সময়ের ব্যবহারে পরিচালক 'মুক্তধারা' নাটকে অনেকটা আঁটোসাঁটো বাঁধা থাকেন, দৃশ্যবিষয়েও তেমনি তাঁর স্বাধীনতা অল্প। এর সঙ্গে তুলনা করলে সহজেই ধরা পড়ে যে, নাট্যপ্রযোজনায় 'রক্তকরবী'র ক্ষেত্রে যে-কল্পনার সাহায্য নেওয়া যায় 'মুক্তধারা'য় তার অবকাশ ক্ষীণ।

নির্দেশ কি 'রক্তকরবী'তেও নেই? এক অর্থে নেই, অন্য হিসেবে আছে। 'মুক্তধারা'য় সময় বাস্তব, স্থানও বাস্তব। 'রক্তকরবী'তে কালের ব্যবহারে যেমন বাস্তবের মধ্যেই লাগে পরাবাস্তবের টান, আপাতবাস্তব কালকে ভেঙে নেওয়া যায় অন্তহীন কালের মধ্যে—স্থানবিষয়েও তেমনি সেখানে সত্যপট আর চিত্ত-পট মিলে এক জটিল দৃশ্যসংস্থান তৈরি হয়। 'ফাল্গুনী'র কবি যে বলেছিল তার চিত্রপটের প্রয়োজন নেই, দরকার চিত্তপটের, সেটা 'রক্তকরবী' প্রসঙ্গেও ভাববার। কেননা জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট নাট্যকারদের মতো রবীন্দ্রনাথেরও এখানে অন্বিষ্ট হলো সত্যের এক পৃথক মাত্রা, 'the most fantastic truth'; এঁরা সবাই নাটককে গড়ে তুলছেন পরানাটক বা সুপারড্রামা হিসেবে। 'মুক্ত-ধারা'র চেয়ে 'রক্তকরবী' এক স্তর এগিয়ে আছে এই পরানাটকের দিকে।

দু-নাটকের তুলনা করে দেখলে এ-কথা বোঝা যায়। 'মুক্তধারা'য় যেমন সহজে বলা যায় 'উত্তরকূট পার্বত্য প্রদেশ। সেখানকার 'উত্তরভৈরবমন্দিরে যাইবার পথ', 'রক্তকরবী'তে তা আর সম্ভব নয়। এখানে 'ঘটনাস্থানটির প্রকৃত নামটি কী সে-সম্বন্ধে ভৌগোলিকদের মতভেদ থাকা সম্ভব'। কেবল তাই নয়, 'মুক্তধারা'র অভিনয়ভূমি 'পথ', কিন্তু 'রক্তকরবী'তে 'নাট্যঘটনার যতটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার সমস্তটাই এই রাজমহলের জালের জানলায় বাহির-বারান্দায়'।

বাহির-বারান্দা? এই মঞ্চনির্দেশের উপর পরিচালক কতটা নির্ভর করতে পারেন তা ভেবে দেখতে হবে। নাট্যঘটনা অল্প এগিয়ে এলে এ-কথাটিকে আমরা খুব-একটা গণ্য করতে পারি না আর। এই নির্দেশের প্রতি স্পষ্টত কোনো অভিযোগ আসে না বটে, কিন্তু অলক্ষ্যেই, যা ছিল বারান্দা তা যেন ক্রমে ব্যাপকতর পথের আকার নিয়ে প্রসারিত হয়ে পড়ে। একদিকে জালাবরণের অন্তরালে রাজা এবং অন্যদিকে যক্ষপুরীর মানুষগুলির মধ্যে সংযোগ রচনার সেতু

হিসেবে ওই বারান্দায় নন্দিনীর অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু তারপর যখন ফাগুলাল-চন্দ্রার জীবনখণ্ড অথবা সর্দারদের চক্রান্ত বা মোড়লদের স্তাবকতা ঘটতে থাকে ওই একই ভূমিতে, তখন অন্তত বারান্দার 'লজিক'টা নষ্ট হয়ে যায়, মনে আসতে পারে বড়োজোর প্রাসাদসমীপে কোনো টানা-পথের ছবি।

'মুক্তধারা'র বাস্তব পথ এইভাবে হয়ে ওঠে 'রক্তকরবী'র কাল্পনিক পথ। কিংবা অন্যভাবে বলা যায় যে অনেক টুকরো টুকরো সময়ের খণ্ড নিয়ে যেমন 'রক্তকরবী'র একটি ঐক্যময় আপাতসময়, তেমনি অনেক টুকরো টুকরো পট নিয়ে তার ঐক্যময় পথ, আপাতপথ। তাই 'এক'-এর ধারণা মনে রেখেও 'রক্তকরবী'তে আমরা স্থাননির্দেশের লজিক খুঁজি না, রাজার জালের ঠিক বাইরেই যদি সর্দারদের আস্ফালন বা চক্রান্তচর্চা চলে তো কল্পনায় জালটিকে সরিয়ে নিতে দর্শকের কোনো অসুবিধে ঘটে না।

কিন্তু কালের বিষয়েও 'রক্তকরবী' যেমন অন্তময় এবং অন্তহীনের সম্মিলন, স্থান বিষয়েও কি তেমনি? অর্থাৎ পথের এই পটভূমি কি মুক্তিরও আভাস দিতে পারে, যে-মুক্তি এর নাট্যবিষয়? তা যদি পারত তাহলে দৃশ্যরূপ বিষয়রূপ আর প্রতীকরূপ সর্বাঙ্গীণ সমন্বয় পেত এখানে। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে বরং 'মুক্তধারা'র সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যের চেয়ে সাদৃশ্যই এর বেশি।

'বিসর্জন'-এ মুক্তিপথ ছিল নেপথ্যের আভাসে। 'অচলায়তন'-এ কোনো কোনো দৃশ্য পথপ্রতীকে নাট্যবিষয় ধরে আছে, আর 'রাজা'র প্রহরী তো বলেই-ছিল 'এখানে সব রাস্তাই রাস্তা।' কিন্তু আমরা দেখেছি যে শেষ পর্যন্ত এসব নাটকে একটিমাত্র দৃশ্যরূপে আনা যায়নি এই পথকে। উলটোপক্ষে 'মুক্তধারা' আর 'রক্তকরবী'তে পথের একক দৃশ্য আছে, নাটকের বিষয় হিসেবে আছে মুক্তিপথের সন্ধিৎসা, কিন্তু দৃশ্যপথই সেই মুক্তিপথের প্রতীক কখনো নয়। কেননা 'রক্তকরবী'তে সব সময়েই আমরা সচেতন থাকি কোনো এক অলক্ষ্য দূরবর্তী প্রাচীর-প্রাকারের ধারণায়, যক্ষপুরীকে যা ঘিরে রেখেছে চতুর্দিকে। তারই বাইরে থেকে রঞ্জন বা নন্দিনী আসে মুক্তির আভাস নিয়ে, এসেও দেখিয়ে দেয় দূরের পথ: 'পাগলভাই, দূরের রাস্তা দিয়ে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিল, শুনেছিলে?' এদিক থেকে বরং অচলায়তনিক রুদ্ধতার সঙ্গেই 'রক্তকরবী'র পটভূমির এক দূরাগত সাদৃশ্য। কিন্তু কেন এ-সাদৃশ্যের কথা সহসা মনে আসে না? তার একটা কারণ এই যে 'অচলায়তন'-এর রুদ্ধ অন্তর্গৃহের

বাস্তবিকতা এ-নাটকে নেই, উপরন্তু নন্দিনীর খোলামেলা মুক্তিতে নাট্যপরিবেশ আপনিই যেন ভরে ওঠে প্রত্যহাতীত আলোয়।

যক্ষপুরীর প্রাকার-বহির্গত খোলা মাঠের মুক্তি আছে আড়ালে। 'মুক্ত-ধারা'তেও তেমনি যে-পথচলার ব্রত নিয়ে অভিজিতের জীবন পূর্ণ তার ছায়া সে দেখতে পায় গৌরীশিখরের চূড়ায়, দুর্গম পাহাড়ের পথে, অথবা 'কোন্ আগুনের পাখি মেঘের ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেছে। আমার এই পথযাত্রার ছবি অস্তসূর্য আকাশে এঁকে দিলে' এই আকাশছবিতে। 'মুক্তধারা'র যে-পথটি দৃশ্যমান তার দু-মুখ যদিও খোলা এবং 'অচলায়তন' বা 'রক্তকরবী'র মতো কোনো নিকট বা দূর প্রাকারবেষ্টনে তার মধ্যে নেই কোনো রুদ্ধতা, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সংলাপে আমরা বুঝে নিয়েছি যে এ-ও এক অধ্রুব পথ, এর সেই 'না'-এর দিকটাই আমাদের আঘাত করে বেশি। মনে পড়ে বটুক পাগলের নিয়তিবাক্য 'যেয়ো না ও-পথে' অথবা অম্বার বিলাপবাচন 'আমাদের পূজো বাবার কাছে পৌঁছচ্ছে না—পথের থেকে কেড়ে নিচ্ছে'।

বস্তুত নাট্যনির্দেশ গণ্য করলে 'মুক্তধারা'র পথকে অনন্তপ্রবাহিত দেখাতেও তো বাধা আছে। 'দূর আকাশে একটা অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথা' এবং তার বিপরীত দিকে ভৈরবমন্দির চূড়ায় ত্রিশূল। প্রতিস্পর্ধী এই ত্রিশূল আর লৌহযন্ত্র তাহলে বেঁধে রেখেছে পথের দুই মুখ, তার মাঝখানে বসানো রণজিতের শিবির। লৌহযন্ত্রের প্রেরণা ছিল রণজিতেরই—তাই আমবাগানের শিবিরটি যেন অম্বার এই সন্দেহকে যথার্থ বলে মনে করিয়ে দেয় : দেবতার পূজা কে পথের থেকে কেড়ে নিচ্ছে। দৃশ্যসংস্থানের মধ্যেই নাটকের নিহিত চাপটা থেকে যায় এইভাবে।

মানসিক এই চাপ 'রক্তকরবী'র চেয়ে 'মুক্তধারা'য় বেশি, কেননা 'রক্ত-করবী'তে চরিত্রের মধ্যেই খোলা মুক্তির যে-আভাস তা এমন-কী অভিজিতেও নেই। অভিজিতের মূর্তি কান্না দিয়ে গড়া : 'আমারও বুক কান্নায় ভরে রয়েছে', নন্দিনী বা রঞ্জনের মতো সহাস উচ্ছলতা নয় এ-চরিত্রের। নন্দিনীর মধ্যেই পথ আছে, কিন্তু এ-কথা মনে করা যায় না যে অভিজিতের মধ্যেও তেমনি আছে পথ। নন্দিনী নিজেই পথ, কিন্তু অভিজিৎ পথ খুঁজে বেড়ায়, সে নিজে মুক্তি পেয়ে তবে মুক্তি দিতে পারে। তার প্রজারা তাকে চিরকালের মতো পেয়ে গেল মাত্র তখন, যখন মুক্তধারার বাঁধ ভেঙে 'সেই মুক্তিতে তিনি মুক্তি পেয়েছেন'।

সেইজন্য কি মঞ্চে এখানে অতিরিক্ত কোনো প্রতীকের প্রয়োজন? 'অচলায়তন' বা 'রক্তকরবী'র মতো মুক্তিপথের গান এখানে নেই, কেবল ধনঞ্জয়ের গানে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে বলা আছে 'পথ আমারে সেই দেখাবে যে আমারে চায়' আর আছে অভিজিতের স্বপ্নময় সংলাপ। হয়তো সেই সংলাপের ছবি দৃশ্যমান করে তুলবার জন্য দূর পশ্চাৎপটে গৌরীশিখরের ভঙ্গি নিয়ে আসা সম্ভব। না কি যন্ত্রদানব, মন্দির আর শিবিরের নির্দেশকেও লঙ্ঘন করে অনাবিল সরল মঞ্চ করে দেওয়াই ভালো? উপকরণবিহীন বিরলতার মধ্যে একটি বা দুটি ক্ষীণ চিত্রপ্রতীকের ব্যবহারে কেবল পথের পটটিকেই যদি সামনে রাখা যায়, তাহলে হয়তো অভিনয়ের সংলাপে একই সঙ্গে রুদ্ধতা আর মুক্তির ছবি ধরা দিতে পারে।

৩

'মুক্তধারা' আর 'রক্তকরবী'র পথ তাহলে প্রতীকপথ নয়। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও ঠিক যে যোগ্য অভিনয়বিন্যাসে তার মধ্যে প্রতীকের জোর এনে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু রবীন্দ্রনাটকে কোনো পথ কি পট প্রতীক আর বিষয়কে একসঙ্গে ধরেনি? 'ডাকঘর' নাটকে একবার অর্জিত হয়েছিল এই সমন্বয়, সেখানে দৃশ্যই প্রতীক হয়ে উঠে বিষয়ের ইঙ্গিত করে।

'ডাকঘর' দৃশ্যবিভাজিত নাটক, কিন্তু এক দৃশ্যের আয়তনে তাকে সংহত করে আনাও অসম্ভব নয়। 'ডাকঘর' সম্পূর্ণরূপে নির্দেশবিহীন নাট্যরচনা, তাহলেও স্থান ও সময়ের একটা ধারণা এর সংলাপ থেকে পাওয়া যায়, শরতের রৌদ্র-বাতাস-ভরা দিন থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে নাট্যঘটনা বাহিত হয়ে যায় রজনীর তারাভরা অন্ধকারে। 'পিসেমশায়, আজ আর আমার সেই জানলার কাছেও যেতে পারব না?' অমলের এই 'আজ' শব্দের ব্যবহার থেকে বোঝাও যায় যে দিনের একক এখানে স্থির নেই, কয়েকদিন অপসৃত হয়ে গেছে এর মধ্যে। তাহলেও হয়তো আলোর প্রয়োগে আর স্বল্পসাময়িক বিরতিতে সেই কালের ইঙ্গিত এনে একটি অখণ্ড প্রবাহে নাট্যাভিনয় সম্ভবপর হয়। আবার স্থানের দিকে দেখি অমল প্রতীক্ষা নিয়ে বসে আছে তার রাস্তার ধারের ঘরটিতে। নিছক-ঘর হিসেবে মঞ্চে একে উপস্থাপিত করা শক্ত, কেননা পথের পথিক দৃশ্য এ-নাটকের খুব জরুরি অংশ। কেবল যে অমলের চোখে দেখা দৃশ্যকেই মায়া-স্বরূপে সামনে আনা দরকার তাই নয়। দইওয়ালা প্রহরী সুধা আর

ছেলেরা ক্রমাগতই যে ঘুরে যায়, তাদের ঘরের মধ্যে এনে দেখালে অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায় নাট্যতাৎপর্য। তাদের দেখানো চাই পথের পটভূমিতে যুক্ত করে।

অর্থাৎ 'ডাকঘর'-এ পথ আর ঘরের সন্ধিমুখ খুব তাৎপর্যময়। দৃশ্যসংস্থান হিসেবেও তার ব্যবহার জরুরি, প্রতীক হিসেবেও সে-পথ সহজেই ক্রিয়াবান, কেননা ঘরের সঙ্গে লগ্ন থেকেই এই পথ চলে যায়, সে-পথের ইঙ্গিত 'অনেক দূরে যারা ঘরের মধ্যে বসে থাকে তারাও দুপুরবেলা একলা জানলার ধারে বসে ওই ডাক শুনতে পায়'। 'ডাকঘর'-এর পথ দৃশ্য-হিসেবেই দর্শকের সামনে থেকে এই ডাক শুনিয়ে যেতে পারে, ফলে বিষয়ের প্রতীক হয়ে উঠবার যোগ্যতা সে অর্জন করে—যে-বিষয়ের মূলে আছে এই অনুভব : 'রাজার ডাকহরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে…যতই সে আসছে দেখছি আমার বুকের ভিতরে ভারি খুশি হয়ে হয়ে উঠছে'। এ হলো কালবাহিত সৌন্দর্যের অনুভূতি সঞ্চার। এইখানে এসে বোঝা যায় যে পথ আর কেবল দেশবিস্তৃত হয়ে নেই, তারই মধ্যে এসে গেছে কালবিস্তারেরও আভাস। রবীন্দ্রনাথের পরিণত নাট্যকলায় এইভাবে কখনো দেশকাল এসে একত্র মিলে যায়।

'শারদোৎসব' 'ডাকঘর' 'ফাল্গুনী'তে ভাবনাবিকাশের বেশ একটি ক্রম লক্ষ করি। 'শারদোৎসব'-এ পথ আর বেতসিনীর বনপটভূমির অবশ্য বড়ো কোনো প্রতীকতাৎপর্য নেই, তা কেবল থেকে যায় শারদশোভন প্রকৃতির আধারভূমি হিসেবে। কিন্তু সেখানে সন্ন্যাসীর যে-বিস্ময় : 'আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করছে,' বিশ্বসৌন্দর্যের সেই বিহ্বলতাই 'শারদোৎসব'-এর উপনন্দকে ক্রমে 'ডাকঘর'-এর অমলে পরিণত করে দেয়, যে-অমল কত দিন কত রাত ধরে সৌন্দর্যের পথে কালের নেমে-আসা দেখতে পায় ঘরে বসে। ঘর-পথের নিত্যবিরোধী সংঘাতজাত বিষাদের পরিমণ্ডল 'ডাকঘর'কে 'শারদোৎসব' বা 'ফাল্গুনী' থেকে পৃথক করে রাখে ঠিকই, তবুও 'শারদোৎসব'-এর সৌন্দর্যই 'ডাক-ঘর' অতিক্রম করে 'ফাল্গুনী'তে এসে পৌঁছয়। চন্দ্রহাসের মুখে আমরা শুনতে পাই 'সময় জিনিসটাই যে খেলা, কেবল চলে যাওয়াই তার লক্ষ্য।' পথ ঘাট মাঠ গুহার চতুর্দৃশ্য-বিন্যাসে 'ফাল্গুনী'তে সময়ই হলো বিষয়, কিন্তু সময়ের বিষয় এবং পথের বিষয় এখানে এসে একাকার হয়ে যায়। 'ভাই, আমার ব্যবসা হচ্ছে পথ ঠিক করা—কাদের পথ, কিসের পথ সে আমার জানবার দরকার হয় না' মাঝির এই কথা শুনে বলা যায় 'পথগুলো পরখ করে দেখা যাক' এবং নাট্যাবসানে

দেখতে পাই এ-পথ কালেরই পথ, যে-কাল বারে বারেই প্রথম, ফিরে ফিরেই প্রথম। এই ঘাট মাঠ আর গুহামুখে একই পথ ব্যবহার করে এই নাটকের ভাবদ্যোতনা আনা সম্ভব, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখি দৃশ্যের সেই পথ প্রসারিত হয়ে যায় কালের মধ্যে, মনে করিয়ে দেয় কালের যাত্রা।

এইভাবে লক্ষ করলে বলা যায়, রবীন্দ্রনাটকে পথের ছবি একদিকে যেমন পথিক জনজীবনকে স্পর্শ করবার আগ্রহ থেকে উঠে আসে, যেমন দেশের মাটির স্পন্দন শুনতে পাওয়া যায় এই বিন্যাসের ধরনে, অন্যদিকে তেমনি দৃশ্য-সংহতির নিছক নাট্যপ্রয়োজনেও এই খোলা পথের দৃশ্য সাজানোয় তাঁর উৎসাহ। আর এই দুটি আগ্রহ তাঁর রচনায় ইঙ্গিতপূর্ণ হয়ে ওঠে এইজন্যে যে ওরই সঙ্গে পথ তাঁর রচনার বিষয় ও প্রতীক। ফলে রবীন্দ্রনাটক প্রসঙ্গে টমসন-কথিত মেলার উল্লেখ যদি-বা করা যায় তো মনে রাখতে হবে যে এ-মেলা ব্রেখ্‌টের ভিখারি-চোর-গণিকার সমবায়ে পরিপূর্ণ কোলাহলমুখর বাজার নয়, এর মধ্যে অন্তঃস্থ মুক্তির বিভা আছে বলেই তা একরকম শুদ্ধতা-প্রয়াসীও বটে। সেদিক থেকে রাবীন্দ্রিক পথিক-চরিত্রগুলিকে কিছু-বা ক্লেদশূন্য মনে হতে পারে। সুখেদুঃখে সূক্ষ্মেস্থূলে তারা পুরোই লৌকিক বটে, কিন্তু ওরই সঙ্গে যেন তারা কোনো অলৌকিকেরও পটে বসানো। বাস্তবের রূঢ়তাকে তারা ঠিক তেমন করে ধরে না, সেখানে যে-বাস্তবের অস্তিত্ব তা কেবল কবিতার বাস্তব।

৪

শেক্সপীয়র-প্রযোজনাতেও অনেক পরিমাণে স্বাধীনতাগ্রহণে উৎসুক ছিলেন স্তানিস্লাভ্‌স্কি। পরিচালকের ভূমিকা অভিনয়জগতে অধুনা এতই গরিমাময় হয়ে উঠছে যে নাট্যকারকে তাঁর জন্যে বেশ খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিতেই হয়। একে নিছক আধুনিক বলাও কোনো কাজের কথা নয়। মঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখেই রচনা লেখেন অনেক সেরা নাট্যকার, রচনাকালেই পরিবর্জনের একটা বড়ো ইতিহাসও রচিত হয়ে চলেছে সেই সঙ্গে। পরীক্ষার এই ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথও ব্যতিক্রম নন। কিন্তু শেক্সপীয়র বা রবীন্দ্রনাথের মতো নাট্যকারদের রচনার উত্তরকালীন প্রযোজনায় এ-সমস্যা অবশ্যই উঠবে যে তার ব্যবহারে পরিচালক আপন কোনো বিশিষ্ট ধারণার প্রয়োগ করতে পারেন কি না, অথবা কতটুকু পারেন।

নাট্যান্তর্গত সংলাপের কথা না তুলে কেবল দৃশ্যকল্পনার কথাই এখানে ভাবছি

আমরা। যদি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র নাট্যচর্চার ইতিহাস প্রমাণ করে যে ক্রমশ একদৃশ্যময় পথের এক বিরল আয়তনের মধ্যে তাঁর নাট্যঘটনাকে তিনি কেন্দ্রিত করতে চাইছিলেন, তাহলে অন্তর্বর্তী কোনো নাটকের অভিনয়ে তাঁর অভিপ্রেত উক্ত আদর্শের প্রয়োগ কি অসংগত? 'ডাকঘর' যদি ঘরপথের মিলনবিন্দুতে রাখা একই সেট্‌-এ বিরামবিহীন অভিনীত হয়, সময়াতিক্রমের সামান্য আভাসমাত্র রেখে? রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব প্রযোজনায় এ-অভিনয়ের যে-মঞ্চপরিকল্পনা জানি আমরা, সেখানে তৈরি করা হয়েছিল আস্ত একটি কুটিরের অভ্যন্তর। অবনীন্দ্রনাথ আর নন্দলাল খুব নিপুণ রুচিতে সাজিয়েছিলেন সেই ঘর:

> নন্দলালের সাধ্যমতো তো স্টেজকে পাড়াগেঁয়ে ঘর বানালে। তারপর হলো আমার ফিনিশিং টাচ। আমি একটা পিতলের পাখির দাঁড়ও এক পাশে ঝুলিয়ে দেওয়ালুম। নন্দলাল বললে, পাখি? আমি বললুম, না, পাখি উড়ে গেছে শুধু দাঁড়টি থাক্‌। দেখি দাঁড়টি গল্পের আইডিয়ার সঙ্গে মিলে গেল।

এইভাবে অবনীন্দ্রনাথ মিলিয়ে দিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু তবু মনে হয়, 'তক্তায় লাল রঙ, ঘরে কুলুঙ্গি, চৌকাঠের মাথায় লতাপাতা' এবং সবশেষে ফিনিশিং টাচ হিসেবে 'উইঙের গায়ে আঠা দিয়ে পট্টি'-লাগানো এক রঙচঙে পট: এতে তৈরি হয়েছিল বড়ো বেশি সাজানো-গোছানো এক ঠাসা ঘর, তাই হয়তো অতিরিক্ত প্রতীক হিসেবে পাখি-উড়ে-যাওয়া এক শূন্য দাঁড়ের প্রয়োজন ঘটেছিল। তার তুলনায় মঞ্চ অনেক স্বচ্ছন্দ হতে পারত সব সরিয়ে ওই জানলার পাশে পথটিকেই দেখাতে পারলে।

তেমনি, 'শারদোৎসব' বা 'ফাল্গুনী'রও দৃশ্যবিভাজনা অগ্রাহ্য করে তাকে যদি একই প্রবাহের অন্তর্গত করে নেওয়া হয়, খুব কি অসংগত? 'অচলায়তন'-এ অবশ্য এ-রীতির প্রয়োগ সম্ভব নয়। কেননা অচল প্রাচীরের সঙ্গে খোলাপথের প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব এ-নাটকে অবশ্য দেখাতে হবে। এদিক থেকে 'রাজা'র পটভূমি নির্মাণে বহুরূপী সম্প্রদায়ের সাম্প্রতিক কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য মনে করি। কেননা একটিমাত্র উঁচু পাটাতনের সরলরেখায় পরিচালক এখানে ঘর আর পথ দুয়েরই পরিবেশ যেমন তুলে আনেন, তেমনি 'এখানে সব রাস্তাই রাস্তা' নাট্যান্তর্গত এই সংলাপের রেশ যেন অলক্ষ্যে মনে মনে সব সময়েই সঞ্চারিত হতে পারে ওই দৃশ্যের সহায়তায়।

অনেকসময়েই আধুনিক নাটকের বাস্তব হলো কবিতার বাস্তব। রবীন্দ্র-

নাটকেরও গদ্যভাষার প্রচ্ছদে যে এমনি এক কাব্যনাটক লুকোনো আছে তা আমরা ভুলতে পারি না। এ-দিক থেকে লক্ষ করলে রবীন্দ্ররচনায় পথের ভূমিকা মনে রেখেই নাট্যপ্রযোজনা বা নাট্যপাঠ সংগত হয়, তাতে গণ্য করা উচিত সত্যের এক স্বতন্ত্র মাত্রা। তাঁর শেষতম চর্চা নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে এই মাত্রা অবশ্য স্বতই প্রকাশ পাচ্ছে। নাচগানের—বিশেষত নাচের—সুযোগ নিয়ে সেখানে প্রাত্যহিককে ছাড়িয়ে যাওয়া অনেকটা সহজ, বাস্তব পটের দাবি মন থেকে তখন অনেকটাই মুছে যায়। এ-প্রশ্ন সেখানে মনে জাগে না যে 'সহচরী-সহ শ্যামা'র প্রসাধনকালে শ্যামার সভাগৃহেই কেমন করে উদ্‌ভ্রান্ত বজ্রসেনের পশ্চাদ্ধাবন করে কোটাল 'ধর ধর ওই চোর ওই চোর' ধ্বনিতে ছুটে যায়। দৃশ্যভেদ লুপ্ত করা হয়নি নৃত্যনাট্যগুলির বেলায়, কিন্তু সে কেবল নিষ্প্রয়োজন-বোধে। নৃত্যগীতের যুগলসমবায়ে আপনি সরে যায় দৃশ্য, তাই দৃশ্যদৃশ্যান্তর অভিনীত হয়ে চলে এখানে একই পথের ভূমিকাতে।

১৯৬৫

কালের মাত্রা

নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'র মহড়া দেখে রবীন্দ্রনাথ প্রতিমাদেবীকে লিখেছিলেন 'সমস্ত জিনিসটি বেশ দ্রুত এবং সুঠাম হলে ভালো হয়। এ-নাটকটি লিরিক্যালের চেয়ে ড্রামাটিক বেশি।' লক্ষণীয় যে ড্রামাটিক প্রয়োজনেরই উপলব্ধিতে কবি এই সুঠাম দ্রুততার প্রত্যাশা করেন। তাঁর পরিণত বয়সের নাট্যকলায় এ-তথ্যটিকে বিশেষভাবে নির্ণায়ক মনে হয়। 'বহুশাখান্বিত ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য' থেকে মুক্তি নিয়ে রবীন্দ্রনাটক ক্রমশ যে এক 'বাহুল্যবর্জিত সুপরিচ্ছন্নতার সামঞ্জস্য' খুঁজে নিচ্ছে, সে কি অক্ষমতাজাত অথবা নিতান্তই অভিপ্রেত, নূতনতর কোনো নাট্যাদর্শ তাঁর পরিকল্পনাকে ভিতর থেকে সমৃদ্ধ করছিল কি : এইসব জিজ্ঞাসার উত্তরে ওই তথ্য হয়তো সহায়ক হয়।

সংকোচনের সূত্রপাত দেখি কাব্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' থেকে। পূর্বরচিত দুটি পাঁচ-অঙ্ক নাটকের পর 'চিত্রাঙ্গদা' ছিল স্পষ্টই প্রতিবাদ, কিন্তু সে যেন কবির প্রতিবাদ, যেন নাট্যকারের নয়। নাটকে কবিতার ব্যবহার ক্রমে যেন তাঁকে পরাভূত করে আনছে, কবিতায় নাটকের ব্যবহারই এখন লক্ষ্য। 'মালিনী'তে এমন-কী মিত্রাক্ষর পর্যন্ত চলে এল পুরোটা জুড়ে, আর তার পরেই বুঝতে বাকি থাকে না যে 'গান্ধারীর আবেদন' বা 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ'-এর সময় এখন আসন্ন, কাব্যনাট্য এখন আশ্রয় পাবে নাট্যকাব্যের সরলতায়।

গ্রীক নাটকের সঙ্গে তুলনার কথা ভেবে 'মালিনী'কে বলা হয়েছিল দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু ও-নাটিকার অবয়ব-সংহতি সত্ত্বেও তার নাট্যরূপকে গ্রীক বলে মনে করা শক্ত। ক্লাসিক্যাল নাটকের সূত্রানুযায়ী কালৈক্য এবং দেশৈক্যের কথা ওখানে কবির মনে ছিল, তবে মনে ছিল বিচারের সময়ে, রচনার সময়ে নয়।

ক্লাসিক্যাল এই ঐক্যগুলির প্রয়োজন অনেকটাই পরে ফুরিয়ে এসেছে। শেক্সপীয়র থেকে গত শতাব্দী পর্যন্ত এই ঐক্যধারণার তুচ্ছতা বারংবার

প্রমাণিত হলো এবং কর্নেই-এর এ-বিশ্বাসে কেউ বড়ো উৎসাহ দেখালেন না যে নাট্যকাল আর মঞ্চকালের সর্বসম হওয়া ভালো। দৃশ্যসংস্থান এবং কাল-প্রবাহের অবিচ্ছিন্ন ঐক্যের ভাবনায় আধুনিক নাট্যকার হয়তো তত বিচলিত নন, তিনি কেবল খুঁজে বেড়ান গাঢ়তর এক আত্মিক ঐক্য। তবু দ্বিতীয়বার ভাবতে হয় যখন দেখি বর্তমান শতাব্দী একাঙ্কিকার প্রতি অতিমাত্রায় আগ্রহী, কাব্যনাট্যের পুনর্জন্ম দিকে দিকে সরবে ঘোষিত হয় এবং অন্তত শ' ভাবছিলেন যে নাট্যকলায় আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠা পাবে গ্রীক আদর্শ। সাম্প্রতিক কালের পশ্চিমি নাটক হয়ে উঠছে, সার্ত্রের সংজ্ঞামতো, 'নিদারুণ অথচ ছোটো' —তার সংহত ঘটনাকাল অনেকসময়েই গুটোনো থাকে অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এবং তাই সার্ত্র আমাদের মনে করিয়ে দেন যে আবার এখন আমাদের ফিরিয়ে আনতে হচ্ছে নতুনরকম এক ঐক্যেরই বোধ : দৃশ্যের ঐক্য, কালের ঐক্য।

অবশ্য মনে রাখতে হবে, এ-ঐক্য আর পুরোনো ধরনে সরল নয়। কেননা দৃশ্যমান কাঠামোর মধ্যে সময়ের একাধিক চলন একই সঙ্গে ধরতে চান অনেক নাট্যকার, যার নমুনা আছে সার্ত্রেরই একটি নাটকে : 'দি কন্‌ডেম্‌ড্‌ অব্‌ আলতোনা'। দুই ভিন্ন তলে সাজানো হয়েছে নাটকটির ঘটনাভূমি। নিচুতলায় চলেছে আমাদের ঘড়িবাঁধা মাপা সময় আর ওপরতলায় দেখছি এক অন্তঃসময়ের ব্যবহার যা বাস্তবকে অতিক্রম করে স্পর্শ করছে আরেক সত্যকে। এই আত্মগত সত্যের অন্তহীন সময়ের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে নায়ক ফ্রান্‌ৎসের একাত্মবোধ ঘটে স্যামসনের সঙ্গে, মনে হয় শতাব্দীর পর শতাব্দী সে-ও বহন করে চলেছে প্রকাণ্ড এক ভার, আর জোহানাকে সে-ধিক্‌কার দেয় তার ঘরে টুকরো সময় টেনে এনেছে বলে। অন্তহীন সময় আর খণ্ড সময়ের যোগ তৈরি করে দেয় দুটি তলের মধ্যবর্তী দুয়ার, যা কেবল স্থানেরই সংযোগবিন্দু নয়, কালেরও। সময়ের এই দুই চলন একত্র জড়িয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক জটিল বিন্যাস, আর এ-বিন্যাসকে কেবল আঙ্গিকের খেলা ভাববারও কারণ থাকে না যদি মনে রাখি যে এর মধ্য দিয়ে সার্ত্র বুঝে নিতে চাইছিলেন ব্যক্তি এবং তার পরিবেশের ডায়ালেকটিক্‌স।

কালের এই নূতন জটিলতা আয়ত্ত করবার জন্য প্রয়োজন ঘটল নাটক ও কবিতার অন্তশ্চারী সমন্বয়ের। ইয়েট্‌স এক আঙ্গিক নির্বাচন করেছিলেন তাঁর পরিণত বয়সে, যার প্রেরণা ছিল জাপানি নো নাটক। 'ফোর প্লেজ ফর ড্যান্সর্‌স'-এর এক নির্দেশনায় তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে দেয়ালের সামনে

যে-কোনো ফাঁকা জায়গাই হতে পারে মঞ্চ। এর সঙ্গে তুলনীয় 'তপতী'র ভূমিকায় উচ্চারিত রবীন্দ্রাদর্শ, যেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট তুলবার অভ্যাসকে লেখক ছেলেমানুষি বলে গণ্য করছেন। ইয়েট্স-রবীন্দ্রনাথের এই সদৃশ ভাবনার সূত্র হিসেবে জাপানি জীবন ও শিল্পের অভিজ্ঞতাকে হয়তো অন্যতম মনে করা যায়। মনে পড়ে যে ১৯১৬ সালের জাপান-ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ গভীর অভিভূত ছিলেন এর জীবনযাত্রা আর শিল্পনির্মাণের পরিমিত সংযমে, তার 'হৃদয়ের মিতব্যয়িতা'র নিরলংকার সৌন্দর্যে। 'জাপানযাত্রী'তে খুশি হয়ে লেখেন তিনি : 'হৃদয়োচ্ছ্বাস আমাদের দেশে এবং অন্যত্র বিস্তর দেখেছি, সেইটে এখানে চোখে পড়ে না'। এ-কথা ঠিক যে কবি তাঁর গীতিপ্রতিভার যোগ্য এক নাট্যরূপ এরই মধ্যে অর্জন করে নিয়েছিলেন, সেখানে আর দেখা যায় না প্রথাগতের সঙ্গে আপসের ইচ্ছে, মিতব্যয়িতার আদর্শ তিনি আপন কল্পনাবলেই অধিকার করতে পারেন বলে বোঝা যায়। কিন্তু তবুও জাপানের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্র-সাহিত্যে উদ্দীপক হলো মনে হয়। মনে হয়, আত্মস্থ প্রবণতাগুলিকে প্রকাশ করবার কোনো একটা সহৃদয় সমর্থন তিনি খুঁজে পেলেন এইখানে এবং পরবর্তী নাট্যাবলিতে তাই শিল্পীর সচেতন দৃঢ়মনস্কতায় গড়ে নিলেন সংহতি। জাপান-যাত্রার কয়েকদিন আগেই 'ফাল্গুনী' অভিনয় প্রসঙ্গে গগনেন্দ্রনাথকে তিনি সতর্ক করেছেন যে অভিনয় শুরু হবার পর একবারও যবনিকা পড়বে না, তা সত্ত্বেও তো নাট্যদেহকে পথ-ঘাট-মাঠ-গুহার চতুর্বিধ দৃশ্যে স্তরান্বিত করে নিতে হলো। কিন্তু এর পরবর্তী দুই প্রবল নাট্যরচনা 'মুক্তধারা' আর 'রক্তকরবী'তে আধুনিক নাট্যশিল্পের অনুকরণীয় এক নতুন আদর্শে পৌঁছই আমরা। ক্লাসিক্যাল নাটককে প্রয়োজনের দাবিতে মানতে হয়েছিল এক সংহতির আদর্শ, সেখানে অর্জিত ছিল এক গীতিসংযম। আর আধুনিক নাট্যকলা সেই গীতিসংযমেরই লক্ষ্য ধরে পৌঁছল দেশকালগত সংহতিতে। সংহত এই নতুন নাট্যরূপে ক্রমশ রচিত হয়ে উঠল সময়ের এক স্বতন্ত্র বোধ।

রবীন্দ্রনাথও যে চলছিলেন এই লক্ষ্যে, তাঁর নাট্যচর্চার ইতিহাস সে-কথা প্রমাণ করে। 'রাজা ও রানী' 'বিসর্জন' 'চিত্রাঙ্গদা' 'মালিনী' অথবা এমন-কী 'শারদোৎসব' 'রাজা' 'অচলায়তন'ও যখন রূপান্তর পায় ১৯১৬ সালের সন্নিহিত বা পরবর্তী কালে, নাট্যরূপান্তর অথবা ভাষান্তর, তখন দেখি নাট্যকার অনিবার্য-ভাবে কমিয়ে আনেন দৃশ্যবহুলতা এবং সেই সূত্রে সময়। 'রাজা ও রানী' অবশ্য স্পষ্টত কালের নির্দেশ দেয় না, অন্তত এর প্রথমার্ধ অনির্দেশ্যের মধ্যে

ছড়ানো। কিন্তু পরে ইলা-কুমারের কাহিনীতে 'সপ্তমীর অর্ধচাঁদ ক্রমে পূর্ণশশী' হয়ে উঠবে, সে-পূর্ণিমাও নিষ্ফল করে দিয়ে আবার অবসানদৃশ্যে বিক্রম প্রতীক্ষা করে থাকবেন, কেননা 'পূর্ণিমানিশীথে আজ কুমারের সনে/ইলার বিবাহ হবে'। পূর্ণিমা থেকে পূর্ণিমার এই প্রসার 'তপতী'তে অবাস্তব। 'রাজা ও রানী'র পাঁচ অঙ্ক 'তপতী'র পাঁচ দৃশ্যে পর্যবসিত, তার প্রথম দুটিতে মীনকেতুর অর্চনাদিবস আর পরিণামে দূরে দেশান্তরে মার্তণ্ডের উপাসনা। 'বিসর্জন'-এ কয়েকদিনের ঘটনা : জীববলি নিবারণ, রঘুপতির ষড়যন্ত্র, ধ্রুবহত্যার আয়োজন এবং শ্রাবণের শেষ দুই দিন ভিক্ষে চেয়ে নেওয়া। ইংরেজি অনুবাদে ব্যাপ্ত এই সময়কে সংবরণ করে নেওয়া হলো একদিনের বিরামহীন এক দৃশ্যের আয়তনে এবং জয়সিংহের প্রতি রঘুপতির নির্দেশেও এল তাৎপর্যময় পরিবর্তন। তাকে রাজরক্ত এনে দিতে হবে মধ্যরাতের আগে : 'before it is midnight'। 'বিসর্জন'-এ শ্রাবণের শেষ দুই দিন 'দি স্যাক্রিফাইস'-এ কয়েক ঘণ্টা মাত্র। 'চিত্রাঙ্গদা'র সময় অন্তত এক বৎসর, এক বৎসরের জন্য ছদ্মরূপের আশীর্বাদ পেয়েছিল চিত্রাঙ্গদা। কাব্য-নাট্যে এগারো দৃশ্যে ছড়ানো এই বৎসর নৃত্যনাট্যের ছটি দৃশ্যে পরিণত। 'মালিনী'র চতুর্দৃশ্য-বিন্যাস অবশ্য অনেকটাই সংযমের ইতিহাস, কিন্তু 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ' জাতীয় রচনার ভূমিকা হিসেবেই তার কথা বিবেচ্য এবং সেখানেও যে কবি সম্পূর্ণ কালৈক্য ব্যবহার করেন এমন নয়। প্রথম তিন দৃশ্য এবং চতুর্থ দৃশ্যের মধ্যে সময়ের এতটা ব্যবধান যে ঘটনা এবং চরিত্র -গত অনেকখানি পরিবর্তন আমাদের অলক্ষ্যেই ঘটে যায়, অনেকসময় মনে হয় যে একজন গ্রীক নাট্যকার হয়তো বিষয়টিকে নিতে চাইতেন মাত্র চতুর্থ দৃশ্যেরই উপস্থাপন থেকে। এই কালখণ্ডের সংকোচন সম্ভব হয়নি, তবুও ইংরেজি 'মালিনী'তে চার দৃশ্য আঁটা হলো দুই দৃশ্যে, মধ্যে একটি সময়সেতু থেকে গেল মাত্র।

পৃথক কোনো নাট্যাদর্শই নিশ্চয় এই সর্বাত্মক পরিবর্তনের কারণ। আবার পৃথক নাট্যাদর্শও আন্তরিক কোনো চরিত্র থেকে অনুপ্রাণিত, এ-ও ঠিক। কী সেই আন্তরিক চারিত্র যার ফলে ক্রমে পৌঁছনো যায় 'মুক্তধারা' বা 'রক্ত-করবী'তে ? সে কি কেবল এই যে কবি এখানে হয়ে উঠতে চাইছেন 'নিদারুণ অথচ ছোটো', আধুনিক মানসের যোগ্য রূপের সন্ধানী ? সে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু এই হয়তো সব নয়। হয়তো এরই সঙ্গে আছে সময় বিষয়ে কবির ধারণাগত পরিণতি। 'শারদোৎসব' থেকে মানবনাট্যকে বলয়িত করে নিল প্রকৃতি আর আত্মিকতার নাটক এবং শরৎ-বসন্ত ঋতুগুলি এখন পটভূমির থেকে

পুরোভূমি পর্যন্ত হয়ে উঠতে চায়। এই পর্যায় থেকেই তাঁর নাটকে সময়ই ক্রমে হয়ে উঠছে বিষয় এবং ১৯১৬ সালে প্রকাশিত 'ফাল্গুনী' নাটকে দেখা দিল সেই বিষয়ের সম্পূর্ণ পরিণতি। বলা যায়, সময় সম্পর্কে এই ধারণাপ্রতিষ্ঠার পর রবীন্দ্রনাটকে দেখা দিল কালের এক স্বতন্ত্র মাত্রা।

'ফাল্গুনী'তে আছে অনন্ত সময়ের তত্ত্ব। তারও আগে 'ডাকঘর'-এ ছিল অনন্ত সময়ের চিত্র। এই কথাটি প্রথম পাঠেই ধরা পড়ে না হয়তো, কিন্তু প্রহরে প্রহরে যে-প্রহরী ডাকঘরের সামনে ঘণ্টা বাজিয়ে দেয় তার অনুরণন যে সমগ্র নাটকময় ছায়ার মতো অনুসরণ করে, এ-উপলব্ধিতে না পৌঁছলে 'ডাকঘর'-এর অনেকখানি করুণাব্যাকুল অনুভব অনায়ত্ত থেকে যাবে। নাটকের কয়েকটি সংলাপ এখানে মনে রাখা চাই :

> তুমি ঘণ্টা বাজাবে না প্রহরী ?
>
> এখনও সময় হয়নি।
>
> কেউ বলে সময় বয়ে যাচ্ছে, কেউ বলে সময় হয় নি। আচ্ছা তুমি ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেই তো সময় হবে ?
>
> সে কি হয়। সময় হলে তবে আমি ঘণ্টা বাজিয়ে দিই।

আবার :

> …তখন তোমার ওই ঘণ্টা বাজে—ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং! তোমার ঘণ্টা কেন বাজে ?
>
> ঘণ্টা এই কথা সবাইকে বলে, সময় বসে নেই, সময় কেবলই চলে যাচ্ছে।
>
> কোথায় চলে যাচ্ছে ? কোন্ দেশে ?

এর পর, সময়ের সঙ্গে সময়ের দেশে চলে যাবার যে-আকাঙ্ক্ষা জানায় অমল, তা যেন অস্ফুটভাবে দেশকালকে এক জায়গায় সন্নিহিত করে দেয়। প্রহরী যখন সতর্ক করে বলে 'সে-দেশে সবাইকে যেতে হবে বাবা' তখন তার মধ্যে আমরা কেবল 'ফাল্গুনী'র শ্রুতিভূষণের পারলৌকিক পরামর্শ শুনতে পাই না, তার অতিরিক্ত একটি প্রলেপন পাই ; সময়ের থেকে ছিন্ন হবার বেদনা নয়, সময়ের সঙ্গে যুক্ত হবার আকুলতা। সেইজন্য অমল যে কেবলই এই ঘণ্টা শুনতে পায় সেটা রাজার কানের কাছে ঘণ্টা বাজাবার মতো একেবারেই নয়। বিস্তারিত সৌন্দর্যজগতের বুকের ভিতর থেকে দীর্ঘশ্বাসে আসে এক শব্দ, বেলা একপ্রহরেও তার চোখে আচ্ছাদন নেমে আসে, আর 'দুপুরবেলা যখন রোদ্দুরে ঝাঁ ঝাঁ করে,

তখন ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং—আবার এক-একদিন রাত্রে হঠাৎ…ঘরের প্রদীপ নিবে গেছে, বাইরের কোন্ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং ঢং।' এর পর যখন শুনি যে পাহাড়ের উপর থেকে রাজার ডাকহরকরা 'কত দিন কত রাত ধরে সে কেবলই নেমে আসছে', যাকে অমল অনেকবার দেখেছে মনে হয় —সে অনেকদিন আগে—তখন প্রায় সংশয় থাকে না যে নিরন্তর সময়চলার পথ-ছবিটি জীবনসুন্দর রূপে তার দৃষ্টির সামনে উদ্‌ভাসিত হয়ে গেছে। তাই এখন সেই হালকা দেশের কল্পনা তার কাছে সহজ 'যেখানে কোনো জিনিসের কোনো ভার নেই, যেখানে একটু লাফ দিলেই অমনি পাহাড় ডিঙিয়ে চলে যাওয়া যায়।'

কিন্তু এখনো বিষয়টিকে দেখা হয়েছে কবিভাবনায়, সৌন্দর্যরূপে। দার্শনিকের তত্ত্বরূপে এইটেই প্রকট হয়ে উঠবে 'ফাল্গুনী'তে। 'গানের বিষয়টা কী'? 'শীতের বস্ত্রহরণ।' 'ফাল্গুনী'র ভিতরকার এই কথাটি বলতে গিয়ে জীর্ণতাহীন নীলিমা-নির্মল আকাশের উল্লেখ করেন কবি, 'প্রকাশ' অংশে নব-যৌবনের দল সুন্দরী এই প্রিয়া পৃথিবীর প্রতি তাদের হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করে দেয়। অন্ধ বাউলের সাহচর্যে তারা এখন এমন দেশে উপস্থিত যেখানে সবাই বলে 'যাই যাই'। এই চিরাগত প্রবাহ, এই অপরিম্লান সৌন্দর্য আর অনির্দেশ্য এই বিচ্ছেদব্যাকুলতার 'যাই যাই' উচ্চারণই 'ডাকঘর' নাটকের সমস্তটা ব্যাপ্ত করে ছিল, 'ফাল্গুনী'তে এটি পরিণতির এক অংশ মাত্র। এই অনুভূতির আদ্যন্ত চিত্রচিহ্ন আর ভাষ্য-ব্যাখ্যা নেবার জন্য পথ-ঘাট-মাঠ অতিক্রম করে যাত্রীসংঘ এইখানে এসে উপস্থিত আজ। চন্দ্রহাস অনেক আগেই জ্ঞানের দ্বারা বুঝেছিল যে সময় জিনিসটাই খেলা, চলে যাওয়াই তার লক্ষ্য। কিন্তু সমস্ত দেহমন দিয়ে এই উচ্চারণের সত্য উপলব্ধির জন্য তাকে গুহা পর্যন্ত প্রবেশ করতে হলো, সে-উপলব্ধি প্রকাশের কোনো ভাষা তার জানা নেই। শীতের বস্ত্রহরণ এই 'গানে'র বিষয়। সাম্প্রতিক কালখণ্ডের মধ্যে যাকে অবসান জরা মৃত্যু বলে দেখতে পাই তার সত্যরূপ আবিষ্কারে ধরা পড়ে যে জীবন অনন্তপ্রবাহিত, বসন্তই নূতন করে আত্মপ্রকাশের জন্য শীতের ছদ্মবেশ নেয়। সময়ের এই দুই রূপ : 'Facts-এর দিকে দেখি জরা মৃত্যু, Truth-এর দিকে দেখি অক্ষয় জীবনযৌবন'।

২

'মুক্তধারা'র উপস্থাপন-রীতি এই ফ্যাক্ট-এর দিক থেকে, 'রক্তকরবী'তে তার জায়গা নিয়েছে ট্রুথ। বিন্যাসের দিক থেকে গুরুত্বময় এ-দুই নাটকের অভ্যন্তরীণ

চরিত্রে এই একটি বড়ো ভেদ আছে এবং এরই ফলে সময়ের ব্যবহারে দুই নাটকে ভিন্নতা এসে যায়।

'মুক্তধারা'র এই ক্রমিক সংলাপকটি লক্ষ করা যাক :

১. সূর্য তো অস্ত যায়, আমার সুমন তো এখনও ফিরল না।

২. ওর পিছন্ থেকে সূর্য যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন।

৩. ওই দেখো সঞ্জয়, গৌরীশিখরের উপর সূর্যাস্তের মূর্তি। কোন্ আগুনের পাখি মেঘের ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেছে···ডানা ঝুলিয়ে রাত্রির গহ্বরের দিকে পড়ে যাচ্ছে···গোধূলির আলোটি ওই নীল পাহাড়ের উপরে মূর্ছিত হয়ে রয়েছে···।

৪. সূর্য অস্ত গেছে, আকাশ অন্ধকার হয়ে এল, কিন্তু··· রোদ্দুরের মদ খেয়ে যেন লাল হয়ে রয়েছে।

৫. ভৈরব মন্দিরের ত্রিশূলটাকে অস্তসূর্যের আলো আঁকড়ে রয়েছে যেন ডোববার ভয়ে।

৬. অন্ধকারের জন্যে অপেক্ষা করছিলুম, আমার চিঠি পেয়েছ তো?

৭. ভাই, অন্ধকার হয়ে এসেছে যে।

৮. ঠাকুর, দিন তো গেল, অন্ধকার হয়ে এল।

৯. গোধূলির আলো যতই নিবে আসছে, আমাদের যন্ত্রের চূড়াটা ততই কালো হয়ে উঠছে।

১০. কে আসে? কে হে? জবাব দাও না কেন? বুধন না কি?···উঃ, ঝিঁঝির ডাকে আকাশটার গা ঝিম্ ঝিম্ করছে।

১১. শিবতরাইয়ে? এই অমাবস্যা রাত্রে?

১২. অন্ধকারের বুকের ভিতর খিল খিল করে হেসে উঠল যে।··· প্রহর জাগে প্রহরী জাগে/তারায় তারায় কাঁপন লাগে।

অনতিদীর্ঘ এই নাটকটির অন্তত বারোটি উচ্চারণ পাওয়া গেল যেখানে স্পষ্টই সময়ের নির্দেশ আছে। এমন ইঙ্গিত আরো দু-একটি চয়ন করা সম্ভব। অর্থাৎ নাট্যপ্রযোজকের এখানে কোনো স্বেচ্ছাপ্রয়োগের সুযোগ নেই, সংলাপের সমতা-রক্ষার প্রয়োজনে কালবিন্যাস তাঁকে নিশ্চিতরূপে মান্য করতে হবে।

প্রথম সংলাপে অস্তায়মান সূর্য থেকে দ্বাদশ উদ্ধৃতির 'তারায় তারায় কাঁপন লাগে' পর্যন্ত সময়ের একটি সংগত ধারাবাহিকতা কত নিপুণভাবে সাজানো।

নির্বাণমুখী আলোর মুহূর্তে মুহূর্তে রঙ বদল হয়ে যায়, তারপর কখন সে ফিকে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে গাঢ় তমসায় চিহ্নহীন হয়ে পড়ে—এই প্রতিটি ছবি যেন লেখা আছে চরিত্রগুলির কথায়। প্রাক্-গোধূলির রক্ত-আলো থেকে গোধূলির মূর্ছিত আলোয়, আবার তার থেকে অন্ধকারের বুকের ভিতর সরে যাই আমরা। অন্ধকারও নয় এক রকম। প্রথম অন্ধকারে গোপন কথা সম্ভব হয়: 'আমার চিঠি পেয়েছ তো?' কিন্তু আর কিছু পরেই, যতই কালো হয়ে উঠছে সব, চরিত্রগুলি পরস্পরকে আর দেখতে পায় না, ভয়ে বুক কাঁপিয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকে 'কে আসে? কে হে? জবাব দাও না কেন?' অবশেষে অমাবস্যা রাত্রির অন্ধকারের বুকের ভিতর থেকে মুক্তধারার কল্লোল জাগে, উপরে আকাশে তখন 'তারায় তারায় কাঁপন' লেগেছে।

কতটুকু সময়ের এই ঘটনা? সন্ধ্যা থেকে রাত্রি পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টা মাত্র। অভিনয়ের জন্য কতটা সময়ের প্রয়োজন? এর চেয়ে কম নয়। নাট্যকাল ও মঞ্চকাল এখানে প্রায় সমন্বিত হয়ে গেছে। এখানে স্মরণীয় যে আধুনিক একাঙ্কিকা পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথের এই নাট্যদেহ নির্মিত নয়, কেননা চরিত্র ও ঘটনা -গত বাহুল্যে – এমন কী motif-এর বাহুল্যেও 'মুক্তধারা' আর 'রক্তকরবী' পরিকল্পিত, কিন্তু তারই মধ্যে সঞ্চালিত আছে ঐক্যময় কাল। এই আঙ্গিকের জন্য প্রয়োজন ছিল এমন এক ছোটো কালখণ্ড নির্বাচন করে নেওয়া যেখানে ঘটমান ক্রিয়া এবং লিপ্ত চরিত্রাবলি সংঘর্ষ-সম্ভাবনার চূড়ান্তে দাঁড়িয়ে আছে। 'মুক্তধারা'য় সেই সীমাবদ্ধ সময়টিকে কবি অর্জন করে নিয়েছেন: গোধূলি ও অন্ধকার।

গোধূলি কেন? সন্ধ্যার বিষণ্ন রক্তিমাভ মণ্ডল আতঙ্ক ও বেদনার উভয়তো-মুখ চেতনাকে স্পর্শ করতে পারবে বলে হয়তো। অন্ধকার কেন? এর উত্তরে একটু দ্বিধা লাগে। 'তা হলে তাঁকে কি আর পাব না' গণেশের উদ্‌ভ্রান্ত এই জিজ্ঞাসার উত্তরে ধনঞ্জয় যখন জানায় 'চিরদিনের মতো পেয়ে গেলি' তখন তার মধ্যে জীবনের যে স্থির প্রত্যয় প্রকাশ পায়, রবীন্দ্ররচনায় উষাই তো তার অভ্যস্ত পটভূমি!

কিন্তু এইখানে, আর কয়েকটি নাটক বা তার মৃত্যুঘটনার সঙ্গে 'মুক্তধারা'র অভিপ্রায়গত স্বাতন্ত্র্য বুঝে নিতে হয়। অভিজিৎ রঞ্জন নয়, বরং এক হিসেবে এ-দুই চরিত্রের বিপরীতমুখী গতি। 'আমারও বুক কান্নায় ভরে রয়েছে' এই হলো অভিজিতের পরিচয়, আর রঞ্জন হলো চন্দ্রহাসের মতোই 'বিধাতার হাসি', সে জানে না দুঃখের কোনো খবর। রঞ্জন বহির্জাগতিক খোলা আলোর অনুষঙ্গ

নিয়ে অনায়াসে যক্ষপুরীর বন্ধনসীমায় চলে আসে, আর অভিজিৎ রুদ্ধ প্রাসাদ-জীবন থেকে মুক্তি চায় গৌরীশিখরের দিকে যেখানে ভাবীকালের পথ রচিত হবে। সে যে রুদ্ধ, এই কথাটি নাটকে ভুলতে পারি না আমরা, জয়সিংহের আতুরতা মনে পড়ে কখনো কখনো। 'অভিজিৎ হচ্ছে সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ' রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা থেকে কথাটা আরো স্পষ্ট হয়, এ-চরিত্রে পীড়ার স্বরূপ উদ্ঘাটনই কবির প্রয়োজন ছিল। পীড়িত এই অনুভবের যোগ্য অনুষঙ্গ রচনা করতে পারে জয়সিংহেরই অবসান-দৃশ্যের মতো 'তিমিররূপিণী' রাত্রি।

মাত্র এই নয়। এরও পরে প্রশ্ন জাগে, অভিজিতের জন্মবৃত্তান্ত কেন জানতে দেওয়া হলো আমাদের। স্বল্পসময়ের মধ্যে অতীতের অনেকটা কেন আমাদের অভিজ্ঞতার মুঠোয় তুলে ধরা হলো? এর মধ্যে কি আছে নিয়তির ইঙ্গিত? 'তোমরা ভাবছ তোমরাই আগুন লাগিয়েছ? না, এ আগুন যেমন করেই হোক লাগত' বিশ্বজিতের প্রতি অভিজিতের এই উক্তি প্রথম যেন একটু কঠোর ও নিষ্ঠুর শোনায়, কিন্তু তার পরেই ঝরনাতলায় তার পরিত্যক্ত জন্ম, পশ্চিমের গৌরীশিখর, মুক্তধারার আহ্বান এবং অমাবস্যার অন্ধকারের সঙ্গে একে সংগতিপূর্ণ বলে বোঝা যায়। এর মধ্যে থেকে গিয়েছে এক অমোঘ নিয়তির অনিবার্যতা, ঘন গঠনের মধ্যে যা আরো রুদ্ধশ্বাস নিবিড়তা ভরে দেয়। হয়তো সিঙের কোনো কোনো রচনার ছায়া পাঠকের মনে ভেসে আসে, সেই fate, সেই মৃত্যুর হাতছানি, সেই সংহত কালখণ্ডে সুপ্রখর জীবনমর্ম।

'ফ্যাক্ট'-এর দিক থেকে এই হলো 'মুক্তধারা'। কিন্তু নিয়তি বা মৃত্যুর সিঙ-তুল্য ভাবনার দ্বারা নিশ্চিত হতে পারেন না রবীন্দ্রনাথ, এর থেকে এক নন্দিত উত্তরণও তিনি রেখে দিতে চান, উপস্থাপনকে তিনি সরিয়ে দিতে চান 'ফ্যাক্ট' থেকে দূরে। তখনই জরা বা মৃত্যুর অন্য দিকটা চোখের সামনে আসে, অক্ষয় জীবন যৌবন। তখনই 'মুক্তধারা'র পরবর্তী প্রয়াসে প্রয়োজন ঘটে 'রক্তকরবী'র। কিন্তু 'ফ্যাক্ট' থেকে সরিয়ে নেবার কোনো ইঙ্গিত কি নেই 'মুক্তধারা'য়? সে তো সম্ভবপর নয়। বস্তুত সেই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ রেখেই কাঁপনজাগা অন্ধকারের ভিতর থেকে ধনঞ্জয়ের সন্তকণ্ঠ ভাসিয়ে দিতে হয়েছিল: 'চিরকালের জন্য পেয়ে গেলি'।

শেষ এই সংলাপটির মধ্য দিয়ে, এমন-কী সমগ্রভাবে ধনঞ্জয় আর তার সম্প্রদায়ের উপস্থিতি দিয়ে, এক দ্বিস্তর অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয়েছে নাটকে। রচনা-রূপায়ণে এটা কতখানি সফল? নাট্যকাল আর মঞ্চকালকে মিলিয়ে দেবার

আদর্শে ধনঞ্জয়ের এই অংশগুলিকে একটু যেন প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। অনায়াস-সামঞ্জস্যে নাট্যদেহে তা লিপ্ত বলে বোঝা যায় না যেন। যেখানে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে, আর শিষ্যবর্গ নিয়ে গুরুর আবির্ভাবে যেখানে অচলায়তনিক সংলাপের খানিকটা রেশ মেলে, সেই অংশগুলি 'মুক্তধারা'র সময়সংহতিকে ঈষৎ মাত্রায় তরল করে দেয়, নিকট-সময় থেকে দূর-সময়ের দিকে তাকে প্রসারিত করে দিতে পারে না।

৩

তা পারে 'রক্তকরবী'। 'রক্তকরবী'র বহিরবয়বে স্থান ও কাল-গত ঐক্যের এক মায়া মাত্র রচিত আছে, আবার ওই সঙ্গে প্রচ্ছন্ন গড়নে এ-নাটক ছড়িয়ে আছে বৃহত্তর কালের মধ্যে। স্থানকালের ব্যবহার বিষয়ে দুই নাটককে সদৃশ মনে হয় কেবল আপাতবিচারে। বস্তুত, ইতিপূর্বে অর্জিত তাঁর নিপুণতা 'রক্তকরবী'তে নূতনতর একটি সম্ভাবনা সন্ধান করল।

ভাগ্যক্রমে, কালনির্দেশক বাক্যাবলি এ-নাটকেও অল্পস্বল্প আছে :

১. দেখছ না, পৌষের রোদ্দুর পাকা ধানের লাবণ্য আকাশে মেলে দিচ্ছে ?

২. ও কি কথা, সকাল থেকেই মদ ?

৩. বর্শার ডগায় যেন এক এক টুকরো সূর্যের আলো বিঁধে নিয়ে চলেছে।

৪. আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিল, শুনেছিলে ?

৫. তোমার কুঁদফুলের মালা পরব যখন ঘোর রাত হবে।

৬. তোমার কপোলে রক্তকরবীর গুচ্ছ আজ প্রলয়গোধূলির মেঘের মতো দেখাচ্ছে।

৭. দেখতে দেখতে সিঁদুরে মেঘে আজকের গোধূলি রাঙা হয়ে উঠল।

৮. সর্দার! সর্দার! দেখো, ওর বর্শার আগে আমার কুন্দফুলের মালা দুলিয়েছে।

যদিও বলেছি কালনির্দেশক, কিন্তু এসব নির্দেশ 'মুক্তধারা'র তুলনায় অনেক তির্যক। রৌদ্রের লাবণ্যবর্ণ প্রথমেই সকালের আভাস দিয়ে যায়। কিশোরকে নিয়ে নাটকের সূত্রপাতেও হয়তো সেই নবীন প্রভাতের উপযুক্ত পরিবহণ

আছে, আবার পৌষের গানটি যে সকালেই ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল তা জানা যায় বিশুর কাছে নন্দিনীর স্পষ্ট উল্লেখে। ‘সকাল থেকেই মদ’ চন্দ্রার এই ধিক্‌কারের সঙ্গে সঙ্গে প্রভাত তার লাবণ্য থেকে অনেকটা যেন সরে আসে, আর যখন অভিজ্ঞ এবং ঈষৎ রিপুমন্থর চন্দ্রা সর্দারনীদের দেখতে পাচ্ছিল ‘বর্শার ডগায় টুকরো আলো’র মিছিলে, তখন রৌদ্রঝলসিত মধ্যাহ্নের আভাস কাল-পরিবেশ এবং চরিত্র রচনায় একই সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে ধীরে ধীরে কখন সূর্য নেমে আসে, নন্দিনীর কপোলে রক্তকরবীকে প্রলয়-গোধূলির মতো দেখেন অধ্যাপক, সে-প্রতিমায় কি বাস্তব অস্ত-আভাও ছড়িয়ে ছিল না অনেকটা? অল্প পরেই তো নন্দিনীকে উচ্চারণ করতে হবে: ‘দেখতে দেখতে সিঁদুরে মেঘে আজকের গোধূলি রাঙা হয়ে উঠল’।

এর পরিণাম কোথায়? ‘মুক্তধারা’র মতো কোনো আগুনের পাখি অন্ধকারের গহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়েনি, তবু মনে হয় অন্ধকার ক্রমে অধিকার করে নিল ‘রক্তকরবী’রও সমগ্র নাট্যকালকে। শক্তিউপাসক রাজার ধ্বজা-পূজার জন্য আর কোন্ সময় প্রশস্ত? উপরন্তু, শেষ মুহূর্তে নন্দিনী সর্দারের বর্শার আগে তার মালাটিকে যে নিগৃহীত হতে দেখেছিল সে তো অন্ধকারেই সম্ভব। আমরা তো ভুলিনি সর্দারের প্রতিশ্রুতি: ‘তোমার কুঁদফুলের মালা পরব যখন ঘোর রাত হবে’। তার এই আস্ফালন নিষ্ফল ছিল না, নাট্যপরিণামে আছে এই অন্ধকারের আবহ।

কিন্তু এই পর্যন্ত এসে এবার আমাদের বিপন্ন হতে হয়। অন্ধকারের আবহ? যদি অন্ধকার তবে অবসানে কেমনভাবে সম্ভব দূরে ওই গানের ধুয়ো ‘ধূলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে’? সন্দেহ নেই যে এখানে মাত্র প্রথম দুই চরণের পুনর্ব্যবহার হলো, তাও তাৎপর্যময় দু-একটি শব্দের পরিবর্তনে, ফলে রোদের সোনা বা আলোর খুশি আর ফিরে আসে না। এমন-কী পৌষের ডালাভরা যে-ফসল ছিল, দিনশেষে এখন তা আছে ধূলার আঁচলে, এমন কল্পনাও সম্ভব। তবু সন্দেহ থেকে যায়। অন্ধকারের পটভূমিতে ও-গান যেন ঈষৎ সংগতিহীন।

বরং ‘রক্তকরবী’র পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত নাটকের অন্তিম গান হিসেবে বিশুর এই কথাগুলি যদি শুনতাম ‘আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়ো/ধরলি রে কে তুই’ তবে সময়ের সঙ্গে তার কোনো সংঘর্ষ হতো মনে হয় না। ‘পশ্চিমে ঐ দিনের পারে/অস্তরবির পথের ধারে/রক্তরাগের ঘোমটা মাথায়/পরলি রে কে তুই’—একে

মেনে নেওয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে শেষ পর্যন্ত সম্ভব ছিল না, কেননা তাহলে নাটকটির সমাপন চিহ্নিত হতো বিশু-নন্দিনীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের পরিধিতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হতে পারে যে নাট্যপরিণামকে সরানো দরকার ছিল অন্ধকার থেকে, সেইজন্যও গানের এই পরিবর্তন। 'মুক্তধারা'র সংহত নিদারুণ-তার সঙ্গে 'রক্তকরবী'র প্রসারিত সমগ্রতার আস্বাদনগত ভিন্নতা সহজেই অনুভব করি, অভিজিতের বিষাদবিধুর আত্মত্যাগ আর রঞ্জনের স্পর্ধিত মৃত্যুবরণ ভিন্ন-পরিপ্রেক্ষিতের প্রত্যাশা রাখে।

এটা সত্যি হলে আবার তবে নতুন করে ভাবতে হয়। এই শেষ মুহূর্তে কি নাট্যকার সময়ের খানিকটা স্বাধীনতা নিলেন? আদি থেকে উপান্ত্য মুহূর্ত পর্যন্ত সময়ের প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন রেখে অন্তিম এই স্বাধীনতা কি সংগত? 'মুক্তধারা'র মতো মঞ্চকাল ও নাট্যকালকে এক করে নেবার আগ্রহ এখানে নেই, কিন্তু তবু তো মনে হচ্ছিল যে সময়কে এখানে এক সমগ্র একক-এ গণ্য করে একটু ছোটো করে নেওয়া হয়েছিল, সমগ্রতায় কিন্তু হ্রস্বাকারে—কয়েক ঘণ্টায় অভিনীত এক পুরো দিনের ছবি।

আরেক দিক থেকে লক্ষ করলেও সময়ের এই একককে স্থির মনে হয়। নাটকের প্রথমে অধ্যাপক-নন্দিনীর সংলাপে জেনেছি 'আজ' রঞ্জন-নন্দিনীর মিলন হবে, তারপর বিশু সর্দার কিংবা রাজা সকলকেই নন্দিনী তার 'আজকের' দিনের আশার আনন্দ জানায়, এবং পরে সেই প্রতীক্ষাকে একটু ভিন্ন অর্থে পূর্ণ হতে দেখছি আমরা : ও আসবে বলেছিল, ও তো এল। তা হলে এ সেই একদিনের কথা যার সকাল এসেছিল নীলকণ্ঠ পাখির পালক বহন করে, আর রঞ্জনের মৃত-দেহ বহন করে এনেছিল যার সন্ধ্যা। এ সেই একদিন যার সূচনায় দেখেছি ধ্বজাপূজার উল্লেখ, পরিণামে দেখছি জাল থেকে বেরিয়ে আসছেন পূজার্থী রাজা।

তা-ও কি ঠিক? এ কি সেই একই দিন? তবে কেমন করে কুবেরগড়ে রঞ্জনের উপস্থিতির পরেই ক্রমান্বয়ী এই সংলাপগুলি সম্ভব?

> ওই-না রঞ্জন রাস্তা দিয়ে চলেছে গান গেয়ে?
> রঞ্জন এখানে এসেছে, যেমন করে পারিস···
> তাকে পাঁচ দিন আগে একবার দেখেছিলাম, আর দেখিনি।
> সেদিন রাতে শম্ভু-মোড়লের বাড়িতে দেখেছি।

তার প্রসঙ্গে দিনের এই উল্লেখমালা কি পরস্পরবিরোধী নয়?

যে-নগরকে আশ্রয় করে আছে শ্রমিক দল, তার নাম যক্ষপুরী। এরই অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি গড়: কুবেরগড়, বজ্রগড়, এমনি আরো। গড়গুলি আবার সাজানো কয়েকটি পাড়ায়, বর্ণানুক্রমে যাদের পরিচয়। নাট্যব্যাপার ঘটছে কুবেরগড়ের সেই পাড়ায় যেখানে আছে রাজমহল, যে-কেন্দ্র থেকে রাজা আর তাঁর 'অন্তরঙ্গ পার্ষদে'রা পরিচালনা করছেন স্বর্ণসংগ্রহ। এই কুবেরগড়েরই নানা পাড়ার বাসিন্দাকে নিয়ে আমাদের শ্রমিক দল, ভিতরে ভিতরে যারা বিদ্রোহের আয়োজনে তৎপর। 'করাতীরা যেন একটু খিটখিট শুরু করছে' ট-ঠ পাড়ায়, আর মূর্ধন্য-ণ-রা অনেকটা মধুর রসে মজলেও দন্ত্য-ন পাড়া 'এখনো নড়্‌নড়্‌ করছে'।

এরই মধ্যে এল রঞ্জন। কিন্তু রঞ্জন কি তাহলে রাজার তল্পিবাহীদের কথা-মতো পাঁচদিন আগেই এসেছে কুবেরগড়ে, তাকে দেখা গিয়েছে শম্ভু মোড়লের বাড়িতে? যার আবির্ভাবমাত্র খসে পড়ে সব চলতি কাজের ধরন, কথায় কথায় যে সাজ বদল করে, তাকে এরা সকলেই জানে কদিন ধরে, জানে না কেবল বিশু গোকুল বা ফাগুলালেরা? এমন-কী বিশু, যে-বিশু এই শ্রমিকদলের বিদ্রোহী অস্তিত্বকে জাগিয়ে তুলছে অল্পে অল্পে? সেটা সম্ভবপর মনে হয় না। মনে হয় রঞ্জন তাহলে একদিনের মধ্যে থেকেও অনেক দিনের সমাহার, সে আজই এসেছে এবং অনেক দিন হলো এসেছে: দুটোই সমান সত্যি। আবার, একজন অভিনেতা-সমালোচক যেমন লক্ষ করেছেন, আমাদের আলোচ্য দিনটি একই সঙ্গে ছুটির দিন আর কাজের দিন। কিশোর গেল কাজে, ফাগুলাল বলে ছুটি আর বিশু তার নন্দিনীর ছুটি থেকে 'নিজের কাজে' ফিরে যাবার চেষ্টা করে কখনো কখনো। ফাগুলাল বলেছিল আজ ধ্বজাপূজা তাই ছুটির দিন। নাট্য-শেষে সেই পূজা আসন্ন হবার অল্প আগে কিশোর বলে: 'আমি কাজ কামাই করেছি,···আমার পিছনে ডালকুত্তা লাগিয়েছে'। তবে কি একে বলব ফাগু-লালের ব্যক্তিগত ছুটির দিন মাত্র? কথার স্বরতাৎপর্যে তা আমাদের মনে হয় না, লক্ষ করুন এই বাক্‌বিন্যাস: 'আজ ছুটির দিন। কাল ওদের মারণচণ্ডীর ব্রত গেছে। আজ ধ্বজাপূজা, সেই সঙ্গে অস্ত্রপূজা।' উপরন্তু আছে অধ্যাপকের চোখে-দেখা এই ছবি: 'ওই চেয়ে দেখো। আমাদের খোদাইকরের দল পৃথিবীর বুক চিরে দরকারের-বোঝা-মাথায় কীটের মতো সুড়ঙ্গর ভিতর থেকে উপরে উঠে আসছে'।

এত সব বিপরীত ঘটনা, অথচ সংগত সুষম রেখাটিকেও প্রতি মুহূর্তে স্থির

ধরে রাখা আছে—এ কি অনভিপ্রেত শিথিলতা মাত্র? এ কি অসংযত স্বেচ্ছাচার? অথবা এর মধ্যে কোনো গূঢ়তর প্রবর্তনা 'রক্তকরবী'র নাট্যরীতিকে অন্যতর তাৎপর্যে দ্যোতিত করে তুলছে?

এই নাটকের মধ্যবর্তী অংশে হয়তো সেই দ্যোতনা আছে আরেকটু সূক্ষ্ম ধরনে। রাজা ছিলেন জালের আড়ালে আর সেখানে তিনি তাঁর প্রতিমান খুঁজে নিচ্ছেন কোটরগত এক ব্যাঙের মধ্যে, যার কাছে বেঁচে থাকার মন্ত্র নেই, আছে টিঁকে থাকার জাদু। 'এই ব্যাঙ একদিন একটা পাথরের কোটরের মধ্যে ঢুকেছিল। তারই আড়ালে তিন হাজার বছর ছিল টিঁকে। এইভাবে কী করে টিঁকে থাকতে হয় তারই রহস্য ওর কাছে থেকে শিখছিলুম।' 'শিখছিলুম' শব্দটির ঘটমান অতীত রূপ একটু চমকে দেয় আমাদের, কেননা আমরা দেখতে পাই যে ওই ব্যাঙের বয়স তিন হাজার বৎসর। ক্লান্ত পাহাড়, পর্বতের চূড়া অথবা হাজার বছরের পুরোনো বটগাছের চেয়েও বেশি কার্যকর হলো রাজার এই বর্ণনা, ব্যাঙের এই তিন হাজার বছরের অস্তিত্ব: কেননা ওই সময়ের কোনো বাস্তব সম্ভাবনা বিচার করবার জন্য এ-মুহূর্তে মন উৎসুক হয় না। অথচ আমাদের অগোচরেই রাজার অস্তিত্ব—অতএব সমগ্র 'রক্তকরবী'র অস্তিত্ব—সাম্প্রতিক কাল থেকে চিরন্তন কালে, রূপময় কাল থেকে কালহীনতায় প্রসারিত হয়ে যায় এবং নাটকীয় চরিত্রাবলির মধ্যে বিশেষ আর নির্বিশেষ পরস্পর নিগূঢ়ভাবে অন্তঃপ্রবিষ্ট হতে থাকে। এরা একই সঙ্গে বাঁচে দুই ভিন্ন অভিজ্ঞতায়, পরিবেশের মধ্যে এবং পরিবেশের বাইরে। তাই এ-নাটকে কোনো বাস্তব ক্রম নেই, পরাবাস্তব এর চলন।

আধুনিক একাঙ্কিকার ধরনে রবীন্দ্রনাথের নাট্যরূপ নির্বাচিত নয়। স্থান ও কালের সংহতি যেমন এর প্রার্থিত, তেমনি ব্যাপ্তির আকাঙ্ক্ষাও এর গভীরে জড়ানো। 'পঞ্চম হেনরি' নাটকের প্রস্তাবনায় শেক্সপীয়র বলিয়েছিলেন তাঁর কোরাসের মুখে: 'jumping o'er times/Turning the accomplishment of many years/Into an hour-glass' এবং এর জন্য তাঁকে দর্শকের সাহায্য চাইতে হয়েছিল 'on your imaginary forces'! এই hour-glass রবীন্দ্রনাথও ব্যবহার করলেন, কিন্তু দর্শকের সক্রিয় সাহায্যে বাইরে থেকে নয়, নাট্যগড়নেরই ভিতর থেকে। দর্শকের কল্পনা এখানে অলক্ষ্যে কখন এক স্তর থেকে অন্য স্তরে সরে যায় দূরবর্তী ভাসমান প্রবাহে, নিঃসময়ের দিকে।

রবীন্দ্রনাটক যেখানে মহত্তম সেখানে সময় এমনিভাবে নিঃসময়ে মিলিত

হয়ে যায়। 'আমার ভারি ইচ্ছে করছে ঐ সময়ের সঙ্গে চলে যাই—যে-দেশের কথা কেউ জানে না, সেই অনেক দূরে' : অমলের এই ইচ্ছে যেন চরিতার্থ হয় যখন নাটকের উক্ত সিদ্ধি আমাদের দূরের জগৎকে স্পর্শ করিয়ে আনে এবং একই সঙ্গে বহুতল অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। ট্র্যাজেডির খ্যাতনামা অভিনেত্রী সিবিল থর্নডাইক তাঁর অভিনয়ে পেতে চেয়েছিলেন এই নিঃসময়ের অনুভব, কেননা 'Get above it into Timelessness, into the realm of imagination, the mind of God, into a place of quiet knowledge where the two opposites namely, intense feeling and beyond feeling are co-existent !' নিবিড় অনুভব আর উধাও অনুভবকে এইভাবে মিলিয়ে নিয়েই শিল্পমহিমা। 'মুক্তধারা' তীব্র শাণিত আঙ্গিকের মধ্যে ধরে আছে intense feeling, কিন্তু সেইখানেই, সাম্প্রতিক যন্ত্রকাল এবং সাময়িক সমস্যার মধ্যেই তাকে নিহিত মনে হয়। সেই একই কাল এবং সমস্যাকে পটভূমিতে গণ্য করেও 'রক্তকরবী' যে তার থেকে উত্তীর্ণ হতে পারল তার একটি বড়ো কারণই এই যে, intense feeling এবং beyond feeling এখানে একত্র সংসক্ত হয়ে গেছে। 'মুক্তধারা' সময়বদ্ধ, 'রক্তকরবী' সময়হারা : 'মুক্তধারা'য় আছে আবেগের চাপ, 'রক্তকরবী'তে আবেগের মুক্তি। কোন্ পদ্ধতিতে এই মুক্তি অর্জন সম্ভব? থর্নডাইক অভিনেতাদের জানিয়েছিলেন, 'your technique : a flexible voice' ! রবীন্দ্রনাথও হয়তো ঐ লক্ষ্যের অভিপ্রায়ে বলতে পারতেন, 'your technique : a flexible sequence !'

৪

বলতে পারতেন নয়, বলেওছিলেন। একটু অন্য ভাষায় 'রক্তকরবী' রচনার প্রায় সমকালে অন্যত্র লিখছেন তিনি 'কালের বা দেশের মাত্রা বদল করবা-মাত্রই সৃষ্টির রূপ এবং ভাব বদল হয়ে যায়।' সমীপবর্তী কথা কয়েকটি পর পর এই রকম :

> দেশই বলো, আর কালই বলো, যাতে করে সৃষ্টির সীমা নির্দেশ করে দেয়, দুইই আপেক্ষিক, দুইই মায়া।
>
> বিশ্বসৃষ্টির বৈচিত্র্যও দেশকালের মাত্রা অনুসারে।
>
> কালের বা দেশের মাত্রা বদল করবা-মাত্রই সৃষ্টির রূপ এবং ভাব বদল হয়ে যায়।

'রক্তকরবী'তে কালের এই মাত্রাবদল ঘটে যাবার পর, সময়কে আবার কবি

বাইরের দিক থেকে ভেঙে দিতে পারলেন নতুন একটি শিল্পরূপের মধ্যে— নাট্যসৃজনে তাঁর পরিণত আঙ্গিক নৃত্যনাট্যের মধ্যে। আপাত-ঐক্যের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাকে ভরে দিয়েছিলেন 'রক্তকরবী'তে, আপাতবিচ্ছিন্ন কয়েকটি অংশের মধ্য দিয়ে ঐক্যকে স্পর্শ করলেন নৃত্যনাট্যে। 'চিত্রাঙ্গদা' 'চণ্ডালিকা' অথবা 'শ্যামা'য় দৃশ্যবাহুল্য নেই, কিন্তু একই দৃশ্যপ্রেক্ষিতের ধারাবাহিকতাও এখানে অনাবশ্যক হলো। 'চিত্রাঙ্গদা' ছয়, 'চণ্ডালিকা' তিন এবং 'শ্যামা' চারটি পর-স্পরায় সাজানো এবং তার মধ্যে সাম্প্রতিক কালের দ্রুত অপসারণও ঘটে যাচ্ছে। তিনটি নারীজীবনের দীর্ঘ দ্বন্দ্ববন্ধুর পথচলার পূর্ণ ছবি প্রকাশ পাচ্ছে এই তিন রচনায়, কিন্তু তার এক দ্রুত সুঠাম প্রবাহও রচিত দেখি শিল্পরূপে। তৃষাকাতর আনন্দের আবির্ভাবের অল্প পরেই প্রকৃতির যে-বিহ্বলতা, তাকে কালপ্রবাহে অবিচ্ছিন্ন বলেই ভাবতে অভ্যস্ত হই। তবু তো সত্যি যে মায়ের কাছে ইতিহাসের বিবৃতিতে প্রকৃতি যখন বলে 'সেদিন বাজল দুপুরের ঘণ্টা ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর' সঙ্গে সঙ্গে তখন একটা অনির্দেশ্য দূরত্ব পেয়ে যাই কালানুভবে। আবার অন্য দিকে, 'শ্যামা'র চতুর্থ দৃশ্যটুকুতেই বজ্রসেনের প্রেম উৎকণ্ঠা অভিজ্ঞতা ঘৃণা ব্যাকুলতা অনুতাপ পর্যায়ক্রমে বিচলিত করে যায় তাকে, শ্যামার প্রবেশ-প্রস্থানের মধ্যবর্তী একাধিক একাকিত্বে সংলাপমুখর শুনতে পাই বজ্রসেনকে। এখানেও ছড়ানো সময়কে অনায়াসে বেঁধে নেওয়া হয়েছে স্বল্পকালের সীমায়। কিন্তু এর দ্বারা কোনো অসংগতির বোধ জাগে না মনে, বরং সুষমার তৃপ্তিই জেগে ওঠে। এ কেমন করে হলো? আদ্যন্ত নৃত্যগীতের সুসমঞ্জস ব্যবহারেই কালসীমায় এই সীমাহীন কালের অনুভব সম্ভবপর মনে হয়। ১৯৩০ সালে আইনস্টাইনের সঙ্গে আলাপচারিতে কবি এমন এক মনের সম্ভাবনা জানিয়েছিলেন যার কাছে 'the sequence of things happens not in space, but only in time like the sequence of notes in music. For such a mind its conception of reality is akin to the musical reality…'। এই সাংগীতিক সত্যের সন্ধান 'রক্তকরবী'তে এক পদ্ধতি আশ্রয় করেছিল, নৃত্যনাট্যে পেল অন্য পদ্ধতি। কালের অংশগুলিকে যোজনা করে নয়, গান যে-ঐক্যকে দেখায় 'সে হচ্ছে রসের অখণ্ডতাকে সম্পূর্ণ করে' এ-কথা অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেন। এই গান আর তার অভিনয়-নৃত্যের মধ্য দিয়ে অখণ্ড সমগ্রের উপলব্ধি সহজে নিবিড়তর করে পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন কবি। 'রক্তকরবী' রচনার পরবর্তীকালে জাভাযাত্রার

অভিজ্ঞতা হয়তো তাঁর এ-বিশ্বাসকে আরো জোর দিয়েছিল। সেখানে তিনি অনুভব করেছিলেন যে নর্তকীরা সমস্ত দেহ দিয়ে কথা বলে, দেহ দিয়ে সময়ের উপর আলপনা রচনা করে যায় এবং 'এদের সংগীতই তাল, এদের নৃত্যই গান'। এই প্রেরণা দেখা দিল 'চিত্রাঙ্গদা' 'চণ্ডালিকা' 'শ্যামা'য় যেখানে রসের কিংবা সময়ের অখণ্ডতা সৃষ্টিতে নৃত্যগীতের যুগল সহায়তা রবীন্দ্রনাটকে একটি অন্যতর মাত্রার যোজনা করতে পারল। এর জন্য প্রয়োজন ছিল নৃত্যনাট্যগুলির মতো সুঠাম এক রূপের। কালের মাত্রাকে পরিবর্তিত করে নেবার সঙ্গে সঙ্গে ভাব ও রূপ যে কেমন করে বদল হয়ে যায়, এ হয়তো তার এক বহিরঙ্গ প্রমাণ।

এইভাবে মনে হয়, রবীন্দ্রনাটকে কালের ব্যবহারকে কয়েকটি পর্যায়ে সাজিয়ে দেখা সম্ভব। প্রথমে তা ছিল ধারণা বা নাট্যবিষয়, পরে এল তার রূপ বা নাট্যগড়ন। 'ডাকঘর'-এ ছিল সান্তকাল থেকে অনন্তকালের দিকে টান, 'ফাল্গুনী'তে আবদ্ধ সময়ের মধ্যে অনন্তকে বুঝে নেওয়া। এই ধারণাই রূপময় হলো পরের নাটকে। 'মুক্তধারা'য় দেখি আবদ্ধ কালের সংহতি, 'রক্তকরবী'তে আপাতসংহতির মধ্যে প্রসারিত মুক্তি। এরও পরে নৃত্যনাট্যগুলিতে ফিরে আসে বন্ধনমুক্ত এক গূঢ়তর সংহতির সন্ধান, সান্ত-অনন্ত মিলিয়ে কালের এই মুক্তি ঘটিয়ে দেয় নাচ। নটরাজের যে-চেলা 'মহাকালের বিপুল নাচে'ই 'বাঁধন খোলার সাধন' শিখছিলেন, এই শেষ শিল্পরূপটির মধ্যে কালের মুক্তি-প্রত্যাশা তাঁর পক্ষে ছিল খুব স্বাভাবিক।

১৯৬৪

২

রাজা : রহস্য ও প্রকাশ্য

একজন সন্দেহ প্রকাশ করলেন, আজকের দিনে হয়তো 'রাজা' অভিনয়ের কোনো মূল্য নেই আর। কথাটা তাই আরেকবার ভাবতে হলো। যে-নাটকের অভিনয় সমকালের কোনো উপলব্ধি ঘটায় না অথবা আজকের দিনে নিতান্ত তাৎপর্যহীন মনে হয়, তার জন্যে দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন কোনো শিল্পীগোষ্ঠী হঠাৎ কেন উন্মুখ হবেন? কেবল প্রমোদ-প্রয়োজনে? 'সামাজিক দায়িত্বজ্ঞানের প্রকাশ ও মহত্তর জীবনগঠনের প্রয়াস আছে' এমন নাটকেরই তাঁরা অভিনয় করতে চান, বহুরূপী সম্প্রদায়ের এই ঘোষণাও কি তবে আলংকারিক বাণী মাত্র?

ভেবে দেখতে গেলে 'রাজা' নাটকের মূল কথাটা কী? রাজা অরূপ কি কুরূপ সে তো কেবল প্লটের কথা, থীমের কথাটা এই যে রাজা ব্যাপ্তরূপ এবং আত্মরূপ। ব্যাপ্তি থেকে আত্ম-র এই আপাতবৈপরীত্যের সামঞ্জস্য করতে পারলেই রাজার উপলব্ধি সফল। *Sadhana*-র বক্তৃতা-মালায় এইটেই বলা হয়েছিল অন্য ভাষায়, এ হলো individual self আর universal self-এর সমন্বয়। 'সত্য তখনই পেয়েছি যখন তাকে অন্তরে বাইরে পাই। সব জায়গায় এই আনন্দ রয়েছে। নইলে আমার মধ্যে থাকত না' এ-কথা বলতে পারলে তবেই রাজাকে সম্পূর্ণ পাওয়া হলো। 'চোখ বুজে অন্তরেতে যদি তাঁকে পেতে চাও তবে বিশ্ব কি ফাঁকি? তবে তোমার মধ্যে যে ফাঁকি নেই বিশ্বাস কী?' সুদর্শনা অবশ্য চোখ বন্ধ করেনি, বরং সে বিশ্বকে দেখেছিল, কিন্তু সে-দেখায় আত্মার সংযোগ ছিল না কোনো—আত্মপরায়ণ বিভ্রমে তখন 'আলোতে অন্ধকারে বাতাসে গন্ধেতে মিলে আর-একটা কী' সে দেখেছিল। দেখা তার পূর্ণ হলো তখন, যখন আত্ম-পরায়ণতার পরাভবে দেখা দিল আত্মস্থতার জাগরণ। কেবল সুদর্শনার মধ্যেই নয়, নাটকের সর্বত্র ছড়ানো ছিল এক ধরনের অবিশ্বাস, আত্মদীনতা অথবা আত্মবঞ্চনা, এবং অসমীচীনের প্রতি মূঢ় প্রলোভন। এই লিপ্সা যখন শেষে প্রত্যাহত হয়, সফলতা এবং বিফলতার সমবায়ে জীবনের পরিপূর্ণতা যখন

লক্ষ্যগোচর হতে থাকে, যখন আত্মকেন্দ্রিক মোহ থেকে বিশ্বব্যাপী আত্মস্থতায় প্রত্যাবর্তন সম্ভবপর হয়ে ওঠে—তখনই ব্যাপ্তরূপ ও আত্মরূপ এই রাজার উপলব্ধি সার্থক। 'রাজা' নাটক তাই শেষ পর্যন্ত আত্মস্থতার উপার্জন।

এইটেই লক্ষ করতে পেরেছিলেন বলে নিউইয়র্কের সাম্প্রতিক এক নাট্য-সাংবাদিক *King of the Dark Chamber*-কে মিলিয়ে দেখেছিলেন ডিলান টমাসের নাটকের সঙ্গে। হয়তো ব্যাপারটা আকস্মিকই ছিল যে দু-রাত্রি পরম্পরায় অভিনীত হলো 'রাজা' এবং *Under Milkwood* এবং পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন এই দুই নাটকের মধ্যে বড়ো একটি সাদৃশ্য ধরা পড়ল সমালোচকের চোখে : **'both attempt to reconcile man to himself'** !

তাহলে কেন এ-নাটক সমকালোপযোগী নয়? বিমূঢ় উৎকেন্দ্রিকতায় বর্তমান সময় কেবলই প্রলোভনের টান জোগায়। এখন কোথাও একটা সুনিশ্চিত অন্ধকার ঘর নেই আমাদের—সব কিছুর অন্তরালে—যেখানে আপন মনে সর্বময়তার উপলব্ধি মেনে নেওয়া যায়, যেখানে বিশ্বের সঙ্গে আত্মযোগের কোনো নিবিড় সূত্র রচনা করে তোলা সম্ভব। এ এক বসন্তবিহীন কাল। বসন্তের আজ তাই নূতন উপলব্ধি চাই। আর 'রাজা'তে বসন্ত কেবল তো পটভূমি নয়, এক হিসেবে বসন্তই আবার পুরোভূমি। নাটকের অভিপ্রায় প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেছেন রবীন্দ্রনাথ

> তোমাদের মনের সঙ্গে বিশ্বের যোগ হয় এই ইচ্ছে ছিল। এই ইচ্ছেও কাজ করছিল যে বসন্তের আনন্দ ও তাৎপর্য এই নাটকের ছলে তোমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হবে।···ধরো, সুদর্শনার স্বামী বসন্ত। গাছের মজ্জায়, ধরণীর ধুলোয় রসসঞ্চার করে দিচ্ছে যে আনন্দ তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় করতে হলে কী করে দেখব। আমি বসন্তকে বললুম, তুমি আসো নিতি নিতি, তোমাকে আশেপাশে ইঙ্গিতে পাই, কিন্তু তোমাকে ধরব আমি। বসন্ত বলল, বেশ, আমি সব জায়গায় আছি, আমাকে ধরো। যে ফুল ঝরল, যে পাতা গজাল, সব জায়গাতেই বসন্ত। এখানে বসন্ত ঋতুর সঙ্গে রাজার প্যারালেল আছে।···তাঁকে ছিন্ন করে এক জায়গায় কন্‌ফাইন করে দেখতে পারি না।···কেউ টাকা জায়গা জমির মধ্যে তাঁকে পেতে চায়।···সুদর্শনা চঞ্চল। মনে করে আমার কত আদর তাঁর কাছে। তাই অহংকার।

এই আত্মাদরের পরিত্রাণই যদি 'রাজা' নাটকে অভিপ্রেত, তবে আত্মাদর-

পরায়ণ সাম্প্রতিক কালের পক্ষে তাকে অভিনয়যোগ্য নয় বলে ভাবা যায় না।

২

নাটকের অভিনয়ই নাটকের সর্বোত্তম সমালোচনা। একাধিক রবীন্দ্রনাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বহুরূপী হয়তো এখন এই জড় ধারণার অবসান ঘটিয়েছেন যে উক্ত রচনাবলি কেবলই পাঠযোগ্য, কোনোক্রমে অভিনয়সাধ্য নয়। অভ্যাস-গত আবেগার্দ্র উচ্চারণে 'রক্তকরবী' বা 'রাজা'য় চরিত্রাবলির ব্যক্তিস্বরূপ নিতান্ত প্রচ্ছন্ন থেকে যায়—কেন রবীন্দ্রনাথ নন্দিনীকে মনে করেন মানবীর ছবি অথবা সুদর্শনা প্রসঙ্গে বলেন লেডি ম্যাকবেথের নাম, তখন তা সহজে বোঝা যায় না। সেইজন্য 'রাজা' অথবা 'রক্তকরবী'র দশটি ক্লাসের চেয়ে একরাত্রি বহুরূপীর অভিনয় লক্ষ করা এমন-কী ছাত্রজনের পক্ষেও উপকারী। কেননা তার দ্বারা আপাত-অনড় রেখাসমষ্টির সচল বিন্যাস বোঝা যায়, কণ্ঠস্বরের বিচিত্র উত্থানপতনে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে মনের মধ্যে চিহ্নিত হতে পারে। খ্যাত একজন ইংরেজ অভিনেতা তাই বলেছিলেন, নাটকের শব্দগুলি নাটকের বীজ মাত্র। নাটকের অভিনয়ই নাটকের সমালোচনা এবং এই সমালোচনাতেই সমকালের সঙ্গে নাট্যকারের সেতুবন্ধন। এলিয়টের অনুসরণে হয়তো বলা যায় যে যেমন এর দ্বারা সাম্প্রতিক কাল নূতন রবীন্দ্রপ্রবর্তনা লাভ করতে পারে, তেমনি আবার রবীন্দ্রনাথও নূতন হয়ে উঠতে পারেন বর্তমানের দৃষ্টিরঞ্জনে। আধুনিক পাঠক তাই 'রাজা স্বয়ং ভগবান' অথবা 'সুদর্শনা সুরঙ্গমা ঠাকুরদা ভারতীয় সাধনার ভিন্ন ভিন্ন পন্থা'—এইসব সংজ্ঞাবাক্যে আর তৃপ্ত হতে পারেন না, বরং নৈর্ব্যক্তিকতার অনুভূতির মধ্যে রাজকীয় অন্ধকারের তাৎপর্য সন্ধানে তাঁর নবীন উৎসাহ জন্মায়।

অন্তত বহুরূপীর 'রাজা'য় এই আকাঙ্ক্ষা ছিল বলে অনুমান হয়। কেবল, এখানে মনে রাখা ভালো ওল্ড ভিক্-এর প্রযোজক-নট হার্কুট উইলিয়াম্‌সের এক সতর্কবাণী, যা তিনি ব্যবহার করেছিলেন নব্যযুগের শেক্সপীয়র-অভিনয় প্রসঙ্গে। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে আধুনিক দর্শকের কাছে আকর্ষণময় করে তুলবার জন্য শেক্সপীয়রকে নিজের মতো ব্যবহার করা কখনো কখনো হয়ে উঠতে পারে খুবই বিপজ্জনক। প্রথাকে ভেঙে দিতে হবে, সে-কথা ঠিক। নূতন দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রয়োগ দরকার। কিন্তু দেখতে হবে নাট্যকারের মূল অভিপ্রায়কে

যেন আমরা বিনষ্ট না করি নূতনত্বের মোহে। বহুরূপীর অভিনয় কি রবীন্দ্রনাথের নাট্যধারাকে ক্ষুণ্ন করে কোথাও? এই প্রশ্ন আজকের দর্শকের সামনে থাকবেই।

৩

দুটি অন্ধকারের নাটক তাঁরা মঞ্চ করবেন, এই ঘোষণা ছিল বলে কেউ যেন মনে না করেন 'রাজা' আর 'রাজা ঈডিপাস'-এ অন্ধকারের সমান তাৎপর্য। সুদর্শনা যখন বলেন 'কোথাও অন্ধকার কেন থাকবে', সে-কথা ঈডিপাসের আলোক-প্রত্যাশার মতো একেবারেই শোনায় না, সেই প্রবল অন্ধ পৌরুষের তুলনায় সুদর্শনার উচ্চারণ কিছু-বা ত্রস্ত, কিছু-বা লুব্ধ। সোফোক্লেসের নাটকে আছে আলোকের উন্মোচনে পরিত্রাণহীন এক ট্র্যাজেডি, আর রবীন্দ্রনাথ সুদর্শনাকে বিভ্রান্ত আলোর মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে আনেন কেবল আত্মত্রাণের পন্থা রচনার জন্যে, অবশেষে আত্মশুদ্ধির আলোকে যার উত্তরণ। তাই 'ঈডিপাস'-এ শম্ভু মিত্রের প্রচণ্ড কণ্ঠক্ষেপের সঙ্গে 'রাজা'য় তৃপ্তি মিত্রের আর্তনাদ শেষ পর্যন্ত তুলনীয় নয়। বরং পরিপূর্ণ অন্ধকার রঙ্গমঞ্চে অকস্মাৎ 'আলো, আলো কই' তৃপ্তি মিত্রের এই ধাতব কণ্ঠস্বর একটা পৃথক অভিজ্ঞতার মতন, মুহূর্তমধ্যে মনে হয়েছিল নাটকের সুর হয়তো বাঁধা হয়ে গেল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুদর্শনা-সুরঙ্গমাকে চোখে আনবার জন্য হঠাৎ স্পট লাইট জ্বলে ওঠে, ঘোর কেটে যাবার মতো। তখনই যেন ধরা পড়ে বহুরূপীর 'রাজা'য় অভ্যন্তরীণ এক দ্বৈধ। রহস্য ও প্রকাশ্যকে তাঁরা শেষ পর্যন্ত সংসক্ত করে তুলতে পারবেন কি না, মনে সেই সন্দেহ তৈরি হতে থাকে। 'রাজা' রচনার মধ্যেই থেকে গেছে এই দ্বিধা-দুর্বলতা, যে-কারণে পরবর্তী প্রয়াসে 'অরূপরতন' পর্যন্ত পৌঁছতে হলো। বহুরূপী কি তা অতিক্রম করতে পারবেন? রবীন্দ্রশতবর্ষে নিউইয়র্কে এই নাটকটির প্রযোজনায় কৃষ্ণ শাহকেও দাঁড়াতে হয়েছিল অনুরূপ সমস্যার সামনে। অন্য অনেক প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি পদ্ধতি তিনি নিয়েছিলেন এই যে অন্ধকার ঘরের দৃশ্যাবলি সব সময়েই রাখা ছিল সিলুটে, হয়তো-বা তার প্রয়োগ প্রথম থেকেই খানিকটা আলো-আঁধারি মায়া প্রস্তুত রাখতে পারে মঞ্চে।

দুই শব্দের ভিতরে কীভাবে নাটক লক্ষ করা যায়, 'রক্তকরবী'র অভিনয় আমাদের সেই অভিজ্ঞতা দিয়েছিল, 'রাজা'তেও তার ব্যবহার অল্প নয়। 'নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু' ধ্বনিত হবার অল্প পরেই আছে 'ঝরা ফুলে'র গান, এর মধ্যবর্তী মৃত্যুর প্রসঙ্গকে যে-নাটকীয় তীব্রতায় ব্যবহার করা হয়েছে, বৈপরীত্যরচনায়

যোগ্যতায় তা স্মরণীয়। অথবা যেমন করভোত্মানে আগুনের ভয়ে ত্রস্ত দলকে 'যে নদীর পাড়ি ভেঙে পড়বে সেই পাড়ি ছেড়ে যেমন জন্তুরা পালায়' এই সংলাপের উপযোগী আবহাওয়ায় বিন্যস্ত করা হলো, ষষ্ঠ-সপ্তম দৃশ্যকে সম্পূর্ণ মিলিয়ে দিয়ে প্রবলভাবে বাজিয়ে তোলা হলো অগ্নিময় নাট্যঘটনা এবং তার পরেই ছুটে এল অষ্টম দৃশ্যের অন্ধকার ঘর। সপ্তম থেকে অষ্টমে পৌঁছবার এই পরম্পরা ভোলা যায় না, মনে হলো যেন অদৃশ্য রাজা কোনো এক অতি সূক্ষ্ম ভগ্নাংশকালের জন্য বিদ্যুতের মতো দৃশ্যমান হয়ে চলে গেলেন, আগুন থেকে সুদর্শনাকে হাত ধরে কেউ ছিটকে এনে ফেলে গেলেন এই অন্ধকারের বুকে। অমনি দুই দৃশ্যের সংযোগ হয়ে উঠল গতিময়। দ্বাদশ দৃশ্যে সুরঙ্গমা বলেছেন, 'সুবর্ণ যুদ্ধের পূর্বেই গোপনে পালাবার চেষ্টা করছিল, কাঞ্চীরাজ তাকে শিবিরে বন্দী করে রেখেছেন' : উক্তিতে মাত্র না রেখে নাট্যাভিনয়ে পরিচালক একে ঘটনায় রাখেন। তাই একাদশ দৃশ্যের সমাপ্তিতে দেখি পলায়মান সুবর্ণের পশ্চাদ্ধাবনে কাঞ্চীরাজের সৈন্য। কিংবা ত্রয়োদশ দৃশ্যে

> কলিঙ্গ। কই শেষ হলো? বীরত্বের পুরস্কারটি গ্রহণ করবার পূর্বেই আর-একবার তো বীরত্বের পরিচয় দিতে হবে।
>
> কাঞ্চী। মহারাজ, এখানে তো আমরা জয়মাল্য নিতে আসি নি, বরমাল্য নিতে এসেছি।

আপাতসরল এই প্রাথমিক উক্তিদুটিকে ক্রূর করে তোলা হলো তলোয়ারের আস্ফালনে। সপ্তদশ দৃশ্যের বর্জন সর্বত-শোভন, কেননা, নাগরিকের মুখে সেই ব্যাখ্যামূলক নিষ্প্রাণ যুদ্ধবর্ণনার কোনো প্রয়োজন আর ছিল না—বিশেষত যখন আলো অন্ধকার এবং রণঝঞ্ঝনার কয়েকটি তাৎপর্যময় উদ্ভাসে রাজন্যবর্গের ধ্বংস দেখানো ইতিপূর্বেই সম্ভব হয়েছে। কেবল অভিনয়ের পক্ষেই নয়, মূল নাটকের পক্ষেও এ-দৃশ্যের দাবি সত্যিই কতটা তা ভাববার বিষয়।

কিন্তু নাটকীয়তা সত্ত্বেও এসব হলো বিচ্ছিন্নের সমষ্টি। স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করলে যেভাবে তৃপ্তি মিত্র মঞ্চের একক অভিনয়টুকু সম্পন্ন করেন তা-ও খুব বড়ো নৈপুণ্যের পরিচয়। এমন-কী এ-বিষয়ে 'রক্তকরবী'র থেকেও 'রাজা'য় তাঁর কৃতিত্ব বেশি। কারণ 'রক্তকরবী'তে রাজার অদৃশ্যতা জালের অন্তরালবর্তী বলে অনেকটা নির্দিষ্ট স্থলবর্তী, নির্দিষ্ট লক্ষ্যগত; কিন্তু এখানে অদৃশ্য রাজা সর্বময়, হয়তো-বা সুদর্শনার ঠিক পাশেই কি ঠিক সামনেই, তাই এর অভিনয় আরো পারস্পরিকতার প্রত্যাশী, নিবিড় এবং নিকটসঞ্চারী। উপরন্তু এখানে সুদর্শনাই

রাগ-অনুরাগ মান-অভিমানে নিত্যস্পন্দিত, নন্দিনীর সরলতা তার নয়। এই একক অভিনয়ের মায়ারচনাতে তৃপ্তি মিত্রের সফলতা আছে, সে-ও সামগ্রিকের বিষয় নয়। সামগ্রিকের সঙ্গে স্পন্দনে যুক্ত হয়ে ওঠে অভিনয়, যখন বহিরাগত গীতধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শনার দেহ অকারণ হিল্লোলিত হয়ে ওঠে 'পূর্ণিমার আলো মদের ফেনার মতো চারিদিকে উপচিয়ে পড়ছে' এই উক্তি যখন কেবল শ্রাব্যই থাকে না, সুদর্শনারই মধ্য দিয়ে তা দৃশ্যও হয়ে ওঠে এবং যখন নৃত্যের আভাস দিয়ে অকস্মাৎ পায়ের এক ঝংকারে থেমে যান তিনি—যে-পদপ্রহারে হয়তো অশোক ফুটে উঠত—তখন তার সঙ্গে সমস্ত নাট্যরস ভিতর থেকে যুক্ত হয়ে যায়। বিভোর পাগলের বেশে শোভেন আসেন তাঁর ভাঙা গলার গান নিয়ে অথবা রবীন্দ্রমায়ায় রচিত ঠাকুরদা তাঁর সজল কিন্তু কৌতুকভরা চোখের কোণে তাকান, তখন 'রাজা'র ভিতরকার বেদনা যেন স্পৃশ্য হতে থাকে অনেকখানি। পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তনকালে সুদর্শনার হাতে কেন দর্পণ? পরিচালকের কি মনে ছিল তখন রাজার সেই বর্ণনা 'নিজের আয়নায় দেখা যায় না, ছোটো হয়ে যায়'। বস্তুত গৃহত্যাগের পরেই সম্পূর্ণ ধরা পড়ল যে সুদর্শনার সমস্ত রূপ কেবল নিজের আয়নায় ধৃত, আত্মসংবৃতির 'একবার চেষ্টা করে' দেখলেন না তিনি, আর সেই অশুভেরই দ্যোতনা কান্যকুব্জরাজের কণ্ঠে: 'নারী যখন আপন প্রতিষ্ঠা থেকে ভ্রষ্ট হয় তখন সংসারে সে ভয়ংকর বিপদ হয়ে দেখা দেয়'। আবার যখন ঘরে ফেরার দিন, ভোরের অস্পষ্ট আভা, পথের মাঝখানে তখন সুদর্শনার উদ্‌বেল 'ঠাকুরদা' ডাক স্মরণীয় হয়ে থাকে। যতদূর মনে পড়ে, সম্ভবত 'রাজা'তেই বহুরূপীর মঞ্চ সর্বাধিক নিরাভরণ, মঞ্চের ওপর একটু ভিতর দিকে অল্প উঁচু টানা সরু এক প্লাটফর্মই কখনো ঘর, কখনো পথ, শেষ দৃশ্যে উঁচুতে-নিচুতে ঘরপথের যুগল প্রতিচ্ছায়া। ব্যঞ্জনার প্রয়োজনে অতিরিক্ত কেনো জটিল বিন্যাস না থাকায় একটি মস্ত লাভ হয়েছে এই যে, দুইমুখ-খোলা পথের ব্যঞ্জনা এখানে অব্যাহত থাকতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাটকে এই পথ যে কেবল দেশবিন্যস্তই নয়, ওরই সঙ্গে তা কালের মধ্যেও ছড়ানো—তার আভাস যেন খানিকটা এসে যায় এই মঞ্চপ্রয়োগে। সুদর্শনার ওই 'ঠাকুরদা' আহ্বানে ছোটো টানা পথটুকুই প্রবহমান কাল বলে মুহূর্তমধ্যে মায়া জন্মিয়ে দেয়, অভিনেত্রীর কণ্ঠক্ষেপের কৌশলে মনে হয় যেন কত যুগযুগান্তরের প্রতীক্ষাবেদনার অবসান হলো, 'পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ'। এবং তারপর আছে অন্তিম দৃশ্যের সংযোজন, যা কেবল বড়ো পরিচালকের পক্ষে সম্ভব, 'এসো, বাইরে চলে এসো—আলোয়' শুনে বিনতা সুদর্শনা ঘুরে

দাঁড়ান, তাঁর সামনে প্রবাহিত হতে থাকে বহির্জগতের আনন্দধারা। ওই একই গান, যা চতুর্থ দৃশ্যে রোহিণী-সন্নিধানে প্রাসাদশীর্ষ থেকে শুনতে পেয়েছিলেন আত্মভোর আকুলতায়, এখন আবার সেই স্বরই এল তাঁর অহংকারের অবসানে। পুরোনো দৃশ্যে আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে গানকে শুনেছিলাম, বিপরীত এই নূতন দৃশ্যে গানের মধ্য দিয়ে দেখতে পাচ্ছি তাঁকে। অবশেষে নাট্যপরিণামকে সম্পূর্ণ ছন্দোময় করে তোলে কলস-মাথায় মেয়েটির নাচ আর বিরামহীন তার ঘাঘরার ঘূর্ণির সঙ্গে যবনিকা।

৪

কিন্তু তাহলেও কেন সম্পূর্ণ সফল হলো না 'রাজা'? প্রথম অভিনয়রজনীর শেষে সাজঘরে শিল্পীর উৎকণ্ঠায় পরিচালক জিজ্ঞেস করছিলেন 'কী হচ্ছে? গ্রিপ থাকছে না শেষ পর্যন্ত? ঝুলে পড়ছে?' মুঠো সত্যিই কোথাও শিথিল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে বহির্নাট্যে নয়, অন্তর্নাট্যে। বহির্নাটকীয়তা সঞ্চারের জন্য বরং কোথাও-বা ঈষৎ অতিরিক্ত চাপ আছে। যেমন নাটকের রাজন্যবর্গকে পরিচালক ব্যবহার করেন স্বস্তিরচনার উপাদান হিসেবে এবং সুবর্ণকে করে তোলেন সীমাহীনরূপে দর্শকজনের কৌতুকভাজন। হয়তো ততটাই এর প্রয়োজন ছিল না। ভেবে দেখতে গেলে নাগরিক জনতার মধ্যেই স্বস্তির সন্ধান মেলে এবং বাকি অংশ-গুলিকে বিষয়ের প্রয়োজনে টান-টান করে রাখাই সমীচীন ছিল। অথবা যেমন কাঞ্চীরাজ। এই চরিত্র কল্পনায় পরিচালককে ঈষৎ বিভ্রান্ত মনে হয়। প্রথাগত ভিলেনের ধরনে কাঞ্চীর উপস্থাপনা বিপজ্জনক; কিন্তু অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের কাঁধ-ঝাঁকুনি এবং খলতাময় অট্টহাসি, 'রক্তকরবী'র সর্দার-সুলভ পদক্ষেপ অথবা স্বরভঙ্গিতে মনে হয় শম্ভু মিত্র সেই টিপিক্যালের মধ্যেই এই চরিত্রকে বেঁধে দিতে চান। এর অনিবার্য যা পরিণাম, তা ঘটেছে। যদিও স্বয়ংবর সভায় কাঞ্চীকে ঈষৎ আত্মনিবিষ্ট এবং অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল এবং উপান্ত্য দৃশ্যের অন্ধকারে তাঁর দ্বিধান্বিত লাজুক প্রবেশ প্রকট করা আছে, তবুও তাঁর চরিত্রের পরিবর্তন খুব স্বাভাবিক হতে পারেনি, প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয় যেন। রবীন্দ্রনাথের এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চরিত্রগুলি—যেমন কাঞ্চী বা মহাপঞ্চক অথবা ক্ষেমংকর—ব্যর্থ হয়ে যায় যদি ব্যক্তিত্বের প্রবলতা বা স্পর্ধিত মহিমায় এঁদের স্থাপন না করি। কেবলমাত্র ইতর লোভের চিত্রণে যে সর্বব্যাপী রিপুময়তা, এই চরিত্রগুলিতে তার ব্যবহার অসংগত। মহাপঞ্চক বা ক্ষেমংকরের সামনে যেমন একটা জোরালো

ভ্রান্ত আদর্শ আছে, কাঞ্চীর তা নেই বটে। কিন্তু কাঞ্চীরও আছে অবিশ্বাসের জোর।

বস্তুত, কোনো একটি অতিনির্দিষ্ট স্তর থেকে 'রাজা' নাটকের প্রয়োগ সমুচিত কি না, সেইটেই বিবেচনাসাপেক্ষ। 'মুক্তধারা' বা 'রক্তকরবী'র সঙ্গে 'রাজা' অথবা 'ডাকঘর'-এর যে একটি মৌলিক ভিন্নতা আছে, তাকে কি শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করা যাবে? সহজেই বোঝা যায়, 'মুক্তধারা' বা 'রক্তকরবী'র প্রতীক প্রয়োগ ঘটতে থাকে একটা পরিচিত সমাজকাঠামোর অন্তর্বৃত্তে, তাই বাইরের সংঘর্ষ এখানে তুলনায় বেশি আসতে পায়। 'ডাকঘর' বা 'রাজা'য় আছে ব্যক্তিরই নিহিত সমস্যা, ব্যক্তিত্ব-অর্জনের সমস্যা। উপরন্তু লক্ষ করতে হবে এ-দুটি রচনাকে কোনো সমান্তরাল রূপকের চেহারায় বাঁধা কবির অভিপ্রেত ছিল না। এমন-কী বিদেশি *Poetry* পত্রিকার সহসম্পাদিকাও 'রাজা'র আলোচনাক্রমে দেখাতে পেরেছিলেন যে এর মধ্যে চলেছে এক নিরর্গল প্রতীকিতা, 'পিলগ্রিম্‌স প্রোগ্রেস'এর ধরন এর নয়।

এসব ভাবনা বেশি মনে আসে সুদর্শনা প্রসঙ্গে। পরিচালক সুদর্শনাকে কল্পনা করেছেন প্রগল্‌ভা নায়িকারূপে। যেমন কাঞ্চীর বেলায়, তেমনি এখানেও ব্যক্তিস্বরূপের মধ্যে এমন কোনো অবসর রাখেননি পরিচালক, যেখানে তাঁরা প্রয়োজনমতো একটু দূরে সরে দাঁড়াতে পারেন। তাই নৈর্ব্যক্তিক আত্মোপলব্ধি নাট্যপরিণামে সহজ হতে পারে না প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই।

মহিমাচ্যুত এই নায়িকা আবার রূপলিপ্সায় উদ্‌ভ্রান্ত। 'রূপের নেশা আমাকে লেগেছে; সে নেশা আমাকে ছাড়বে না, সে যেন আমার দুই চক্ষে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, আমার স্বপনসুদ্ধ ঝলমল করছে'—মঞ্চপ্রয়োগে দেখি এই সংলাপই তাঁর চরিত্রের ধ্রুবপদ। এতে যদি আপত্তিযোগ্য কিছু না-ও থাকে তো ভেবে দেখতে হবে, প্রথম নাট্যমুহূর্ত থেকেই সুদর্শনাকে ওই সংলাপে অধিষ্ঠিত করা যোগ্য হয় কি না। কেননা সেখানে অপরিসীম ক্লান্তিকর দায় চলে আসে, কিছু-বা ভঙ্গিকাঠিন্যে (ম্যানারিজম)-জাত তৃপ্তি মিত্রের অঙ্গসঞ্চালন এবং উচ্চারণপদ্ধতি—কখনো শিথিল দুই ঠোঁটে আলতোভাবে বেরিয়ে-আসা শব্দগুলি—কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের পরিচিত হয়ে যায় এবং কখনো কখনো সমস্ত ব্যাপারটাকেই মনে হতে থাকে এক নিছক প্রমত্ততা, মনে হতে থাকে অভিনয়-বিষয়ে এই সাবধানবাণী : over-emphasis is ugly! স্মরণীয় যে উপরে-বলা ওই সংলাপটি ছিল নাটকের মাঝামাঝি অষ্টম দৃশ্যে। অভিনয়ের

ক্রমিক আরোহণে এখানে এসে পৌঁছবার আয়োজন হয়েছে কি না সন্দেহ জাগে, বোঝা যায় না চতুর্থ দৃশ্যের দ্বন্দ্ব ঠিকমতো ধরা দিল কি না এখানে : কেন সে-দৃশ্যে হঠাৎ ভগবান চন্দ্রমার কটাক্ষপাতে লজ্জিত হয়ে ওঠেন সুদর্শনা এবং বলতে পারেন 'হঠাৎ বুঝতে পেরেছি, যা সকলের চেয়ে বড়ো পাওয়া তা ছুঁয়ে পাওয়া নয়'—অভিনয়ে সে-কথা খুব স্পষ্ট হতে পারে না। তদুপরি যে-গানে আছে 'দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ'—এই নায়িকার পটভূমিকায় তাকে থীম মিউজিক করে তুলবার সার্থকতাও দুর্বোধ্য।

কিন্তু যদি তার নায়িকা রূপ ধারাবাহিকও হতো, রূপমত্তা সুদর্শনার লিপ্সা-মোচনের কাহিনীকে যদি সংগতরূপে উপস্থাপিত করাও যেত, তাহলেও এই প্রগল্‌ভা নায়িকার প্রত্যাবর্তনকে খুব বড়ো রকমের আত্মোপলব্ধি বলা চলত কি? যে বৌদ্ধ জাতক থেকে কাহিনীটি গৃহীত, এতে হয়তো তার সমীপবর্তী হতে পারা যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অনুসৃত হয় কি না সন্দেহ। উপরন্তু সে-ক্ষেত্রে সুরঙ্গমা ঠাকুরদা কাঞ্চীর ভূমিকা কি নিতান্তই বাক্‌বিস্তারে অবসিত হয় না? অন্তরালবর্তী যে রাজা আছেন নাটকের কেন্দ্রে, তাঁর সঙ্গে প্রতিচরিত্রের পৃথক সংযোগ বোঝা যায় ছড়ানোছিটোনো উক্তিগুলি থেকে—কিন্তু চার চরিত্র কেমন করে এক ঐক্যবিন্দু রাজায় গিয়ে মিলিত হয়, উপান্ত্য দৃশ্যে পথের মাঝখানে এই চার চরিত্রের যোগাযোগ কোন্ নিহিত তাৎপর্য বহন করে, তার কোনো আভাস আমরা অভিনয় থেকে পাই না।

হয়তো সেই কারণেই 'অরূপরতন'-এ কথাটা আরেকটু প্রকটভাবে রাখা ছিল নাটকের সূচনাতেই, সুদর্শনা বিষয়ে রাজার এই উক্তি : 'আমার নাম নিয়ে সকলের চেয়ে বড়ো হবে, এই অহংকারে সে আমাকে চায়'। অহংকার কেবল দাম্ভিকতা অর্থে নয়, প্রেমিকা সুদর্শনার সেই দম্ভ তেজ বরং তৃপ্তি মিত্র লক্ষ করেছেন, কিন্তু আত্মাদরের স্বাতন্ত্র্যে এই চরিত্রকে তিনি রূপায়িত করে তুলতে পারেননি। সম্ভবত এইখানেই সফলতার চাবি লুকোনো ছিল, কেননা একমাত্র তখনই সহজে ভিন্ন চারটি চরিত্রের উন্মোচন রাজমুখী হয়ে উঠতে পারত, এই পরিণাম সংগত মনে হতে পারত যে 'মিথ্যে মান সব ঘুচে গেছে, এখন দেখতে দেখতে রঙ ফিরে যাবে'।

এইজন্যেই 'রাজা' অভিনয়ে দুটি স্তরের সম্পৃক্ত ব্যবহার সর্বথা কাম্য ছিল। কেননা কেবল অহং থেকে আত্মোপলব্ধির পথে যাত্রাকে রূপান্তরিত করতে গেলে অ্যাবস্ট্রাকশনের সম্ভাবনা হতো প্রবল, তাতে এর অন্তঃশায়ী

কবিতার উন্মোচন হতে পারত, কিন্তু সে কেবল নাটকের বিনিময়ে। অ্যাবস্ট্রাক্‌ট এবং কন্‌ক্রিটের দুই চেহারাকে একত্র তাতে বাঁধা যেত না। 'রাজা'র অভিনয়ে বহুরূপীর সফলতা এইখানে যে এখান থেকে তাঁরা নাটক আকর্ষণ করে এনেছেন এবং অনেকসময়ে স্পর্শ করেছেন এর ব্যাকুল কবিতাকে। কিন্তু তাঁদের ব্যর্থতা হয়তো এই যে, শেষ পর্যন্ত সেই নাটক এবং কবিতাকে কোনো এক বিন্দুতে তাঁরা মিলিয়ে দিতে পারেননি, রহস্য এবং প্রকাশ্য এসে নাট্যপ্রবাহে একসঙ্গে বাঁধা পড়েনি।

১৯৬৪

রক্তকরবী, ক্রিসেন্থিমাম্

'রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি' এইটে যখন মনে রাখবার পরামর্শ দিচ্ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তখনও নিশ্চয় তিনি ভুলে যাননি এর বাস্তবাতিশায়ী পরিমণ্ডল। আর সেটা বোঝা যায় ওরই সংলগ্ন রামায়ণের রূপক ব্যাখ্যায়। অর্থাৎ নন্দিনীরও 'রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ' সত্তাকে যে লক্ষ করতে হবে একই সঙ্গে, সেটাও তাঁর প্রচ্ছন্ন বক্তব্য, কেননা একদিক থেকে দেখতে গেলে সেই নির্যাসের মধ্যেই নিহিত থাকে 'রক্তকরবী'র নাট্যবিষয়। তবে কেন আগ্রহভরে দর্শকদের মনে করিয়ে দিতে হয় মানবী-রূপেরই কথা?

এর একটা উত্তর হয়তো সংগ্রহ করা যায় 'চতুরঙ্গ'তে শচীশের কথা থেকে। শচীশ দেখেছিল কেমনভাবে রূপাতীত থেকে রূপের দিকে নেমে আসেন স্রষ্টা, আর তাকে তাই চলতে হয় রূপ থেকে অরূপে, বিপরীত পথে এগিয়ে এলে তবেই ঘটবে মিলন। শিল্পীও তাঁর বোধ থেকে নেমে আসেন সৃষ্টিতে, সেই বোধকে স্পর্শ করবার জন্য আমাদের ধরতে হয় সৃষ্টিরই বহিরবয়ব। প্রশ্ন এই যে রচনার মধ্যে স্পর্শযোগ্য সেই অবয়বটি রাখা আছে কিনা কোথাও। অন্তত 'রক্তকরবী'তে যে তা আছে, সেইরকম মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের।

কিন্তু তা মনে হয়নি আমাদের নিয়মতান্ত্রিক সমালোচকদের। এক যুগ আগের দুঃসহ স্মৃতিতে জানি যে এমন-কী 'রক্তকরবী'কেও গণ্য করা হতো নিছক কবিয়ানা রূপে, আর এই সেদিনও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালনী লিখেছেন এর বিষয়ে: 'The treatment is characteristically Tagorean, logic and mysticism weakening each other!' হয়তো এর সঙ্গে মিশে ছিল কোনো কোনো বিদেশি পণ্ডিতের আবছা ধারণা, যাঁরা বিভ্রান্তভাবে এসব রচনাকে মেলাতে চেয়েছিলেন নিতান্তই পশ্চিমি চলতি আদর্শের সঙ্গে। 'রক্ত-করবী'র সংলাপ বা প্রতীকের কোনোই রণন ছিল না তাঁদের কাছে, আর সেটা অস্বাভাবিকও নয়। ফলে আমাদেরও কেতাবি বা প্রাতিষ্ঠানিক বৃত্তে প্রায়

অতিসম্মানের দ্বারা উপেক্ষিত ছিল রবীন্দ্রনাটক, আমরা ধরতেই পারছিলাম না এমন কোনো প্রতিমান যা দিয়ে এর যোগ্য পরিমাপ সম্ভব, সম্ভব এর যোগ্য পাঠ বা অভিনয়।

তার একটা কারণ হয়তো এই যে প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় এলিজাবেথীয় নাট্যাদর্শকেই ধরা হয়েছিল চিরন্তন, ভুলভাবে প্রায় সেখানেই আবর্তিত হচ্ছিল বাংলা নাটকের ইতিহাস। পুরো এই শতাব্দী ব্যাপ্ত করে বিশ্বনাটকে যে নবীন বিন্যাস দেখা দিয়েছে তার কোনো বোধ আমাদের মন্থর মনে পৌঁছয়নি। কবিতা কেমনভাবে আত্মস্থ হয়ে আসছে অন্য শিল্পরূপের মধ্যে, স্পেনীয় কবি উনামুনো-কে কেন বলতে হয় 'উপন্যাস, তার মানেই কবিতা', নাটকের মধ্যে কতটা আমরা খুঁজতে পারি পরিমিত বাস্তবের পরিবর্তে গূঢ়তর জাতীয় সত্তা—তার প্রতি অল্পই আমরা অবহিত ছিলাম। আমাদের মঞ্চকে ভাবালু তুচ্ছতা থেকে বাঁচাবার জন্য কোন্ সমান্তরাল আদর্শ রচনা করছিলেন রবীন্দ্রনাথ, দুর্ভাগ্যবশে তা আমাদের লক্ষ্যে আসেনি বহুকাল।

সে-হিসেবে বহুরূপীর 'রক্তকরবী' অভিনয় এক ঐতিহাসিক মর্যাদাময় ঘটনা। এই অভিনয়ের মধ্যে একদিকে যেমন উঠে এল এর নাটকীয়তার সামর্থ্য, এর সতেজ মঞ্চযোগ্যতা, তেমনি এঁরা ধরিয়ে দিলেন যে কবিতা আর জীবন পরস্পরবিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। এর জন্যে অবশ্য প্রয়োজন ছিল মঞ্চ বা অভিনয়েরও পুরোনো ধারণা খসিয়ে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথের জীবনকালেও 'রক্তকরবী'র কমই অভিনয় হতে পারত বলে শুনেছি, এতই জটিল এর সংগঠন, কিন্তু বহুরূপীর এই সার্থকতার পরে আজ শৌখিন অফিস-প্রমোদেও নির্বাচিত হতে পারে এ-নাটক, তাঁরাও আজ দেখতে পান কীভাবে দর্শকে-মঞ্চে সংযোগ তৈরি হয় এর অভিনয়ে।

ভাবনাপ্রণালীর এই পরিবর্তনের তাৎপর্য নিশ্চয় অনেক। কেবল রবীন্দ্রনাটকবোধের প্রসঙ্গেই নয়, তাৎপর্য ধরা পড়ে বাংলাদেশের অভিনয়শিল্পের ব্যাপারেও। নূতন এই অভিনয় যেমন সাহসভরে আবিষ্কার করে দেয় এ-নাটকের মানবসাপেক্ষতা, তেমনি আবার বিপরীত দিকে প্রমাণ হয় যে বাংলামঞ্চ এবার কেবল বালকশোভন রোমাঞ্চ বা খেলো রকমের বাস্তব নিয়ে বাঁধা থাকবে না আর, সে এখন ধরতে চায় কবিতারও জগৎ। এ-জগৎ যে কেবল 'ঠাকুরবাড়ির নূতন ঢঙ্' বলে উড়িয়ে দেবার নয় তা প্রমাণ করে এই অভিনয় হয়ে দাঁড়াল আমাদের মঞ্চের ইতিহাসে স্পষ্ট এক মাইলস্টোন।

বহুরূপীর পরিচালক নিজেই কখনো কখনো লেখেন, কীভাবে তিনি পড়েছেন রবীন্দ্রনাথের নাটক। কীভাবে এর চরিত্রগুলি 'আদ্যোপান্ত মানুষটাকে প্রকাশ করার' রূপ তা ব্যাখ্যা করেন তিনি, সরলতা আর সফিস্টিকেশনকে একত্র মিলিয়ে ধরে দিতে চান সেই চরিত্র। এরই ফলে তিনি দেখতে পান 'রক্তকরবী'র ছোটো ছোটো ভূমিকারও মধ্যে কেমনভাবে আছে এক সম্পূর্ণতার আয়োজন, যেমন কিশোর, যেমন মেজো সর্দার। অবশ্যই এ-দুই চরিত্রের সম্পূর্ণতা আসে দুই ভিন্ন অর্থে। রবীন্দ্রনাথের এই সবচেয়ে পরিণত নাটকটিতে ভিন্ন ভিন্ন সকলেই মানবস্বভাবের ভাঙা ভাঙা অনেকগুলি স্তরে জড়ানো আছে, যেন একটা তলহীন গহ্বরে পতনশীল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান। ফলে তাদের কখনোই মনে হয় না যান্ত্রিক পরিকল্পনায় ক্লিষ্ট, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়েই আমাদের তারা ছুঁয়ে যায়। মেজো সর্দারের সম্পূর্ণতা অল্প সময়ের জন্য চকিতে দেখে নেওয়া এই রচনার নাটকীয় দিক। কিন্তু কিশোর অল্পবয়সী, এখনো নানাখানা হয়ে যায়নি নিজের মধ্যে, নিজেকে সে প্রকাশ করে তার সমগ্র অন্তর্গত অস্তিত্বের বিভায়। বিভান্বিত এই প্রকাশই হলো, পরিচালক যেমন মনে করেন, কবিতা।

অভিনয়ে তাই প্রয়োজন ছিল এমন কোনো মুহূর্ত থেকে নাটকের স্বর বেঁধে নেওয়া, যেখানে কবিতার এই সংযমিত প্রকাশ ঠিকমতো মিলতে পারে জীবনের সঙ্গে, ব্যাপারটাকে ভাবালুতা মাত্র মনে না হয়। মঞ্চে সে-স্বর বাঁধা হয়ে যায় কিশোরের 'না আমি সামলে চলব না চলব না' ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তার শারীরিক ঘূর্ণার মধ্যে। পুরো অভিনয় এর পর বেশ সংগতভাবেই নাটকে কবিতায় মিলিত হয়ে এগিয়ে যায়।

কোথায় কবিতা ? স্থূলভ কোনো কবিত্বে নয়, এ-অভিনয়ের কবিতা আছে কোনো চরিত্রের ভিতরটাকে মুহূর্তের জন্যে বাইরে ছড়িয়ে দেবার সফলতায়। সুন্দরী সর্দারনীদের বিলাসযাত্রার এক টুকরো হঠাৎ চকঝমকে চলে আসে মঞ্চের উপর, লিপ্সাতুর আগ্রহ নিয়ে চন্দ্রা এগিয়ে যায় প্রায় তাদের পায়ের কাছে, তাদের অলংকার-ঝংকৃত উপহাসে তাড়া-খাওয়া জন্তুর মতো উবু হয়ে পা ঘষে ঘষে সরে আসে আবার—কবিতা আছে চন্দ্রার সেই নির্বাক মুহূর্তে। 'নীল চাঁদোয়ার নিচে খোলা মদের আড্ডায়' বিশুর এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ফাগুলালের শরীর ঝুঁকে পড়ে, এক লহমার জন্য চোখদুটি ব্যাকুল নিবিষ্ট হয়ে যায় দূরের আকাশে, কবিতা তখন। কবিতা তখন, যখন পরিণতির দিকে

মুক্তির আনন্দে শরীরে একটা আলগা হিল্লোল তুলে অধ্যাপক বেরিয়ে আসেন ছোটো ছোটো দুটি শিশুসরল করতালিতে। অধ্যাপকও যে ছিলেন রাজারই মতো এক জালের আড়ালে, সে-জাল চোখে দেখা যায় না, তাই বাইরে বেরিয়ে আসাটাও দৃশ্যমান করা কঠিন ছিল। কিন্তু তাঁর শেষ এই আবির্ভাবে ব্যাপারটাকে যেন চোখেই ধরিয়ে দেন অভিনেতা।

কেবল এইখানে নয়, এরও চেয়ে বড়ো কবিতা লগ্ন হয়ে যায় যখন সমগ্র অভিনয়ের মধ্যে আমরা সবুজ দেশের হারানো সত্তাকে উজ্জীবিত হয়ে উঠতে দেখি। পরিচালক জানেন রবীন্দ্রনাটক গূঢ়ভাবে মিশে আছে দেশীয় প্রাণশক্তির বহমানতায়, নাটকের এই বিশেষ প্রকৃতিকে প্রায়ই তিনি তুলে নিতে পারেন মঞ্চে। 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' গানটির নেপথ্য-উৎসারের সঙ্গে নন্দিনীর কিশোরীসুলভ চঞ্চলতায় দ্রুত আসা-যাওয়া, পায়ে ঈষৎ-নাচের আভাস, ঠোঁটে ঈষৎ-গানের। অথবা পটভূমিতে বিশাল আকাশ হঠাৎ ভরে ওঠে নীলাভ আলোয়, পুরোবর্তী জালপ্রকীর্ণ মঞ্চসাজ আড়াল হয়ে যায়, বিশু-নন্দিনী তাদের মধ্যবর্তী 'একখানা আকাশ' নিয়ে দূরে মিলিয়ে যায় 'ভালোবাসি, ভালোবাসি' গানে, যেন অল্পের জন্য আমরাও চিনে নিলাম প্রাকারের বহির্গত আনন্দধারা। সার্ত্রের একটি নাটকের অন্তিম দৃশ্যে নির্দেশ আছে : ঘর ভরে যাবে সবুজ আলোয়, এই আলো হয়ে উঠবে অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের মিলিত প্রতীক। 'রক্তকরবী'র এই আলোও তেমনি কেবল স্থানের জড়তাই সরিয়ে দেয় না, মুছে দেয় কালেরও ছিন্নতা, আমরা অব্যাহত লগ্ন হয়ে যাই এক প্রবহমাণতার মধ্যে, তার অভ্যন্তর থেকে জেগে ওঠে দেশ। এমন-কী আলোর কৌশলে দৃশ্যরূপেও দেখাতে হয় না নীলসবুজের এই দেশপ্রকৃতি, কখনো তার সমস্ত টানটা চলে আসে স্বরক্ষেপের মধ্যেই। ঘোর যান্ত্রিক ধ্বনিকে মলিন-করে-দেওয়া ওরই দ্বন্দ্বে সাজানো তৃপ্তি মিত্রের 'অনূ—প, শকূলু—' ডাক স্মরণীয় হয়ে থাকে, ছোটো দুটি ড্যাসচিহ্নে যে স্বরলিপি প্রস্তুত রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার এমন প্রাণভরা উদাত্ত ব্যবহার এমন বেদনাময় সবল দীর্ঘ খোলা আহ্বান অল্পই শোনা যায় মঞ্চে! এই কণ্ঠের প্রক্ষেপেই যেন মায়া জন্মিয়ে দেয় যে ঈশানীপাড়ার মতোই মাঠে-প্রান্তরে বিস্তৃত কোনো বাংলাদেশের স্বাভাবিকতার মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। প্রায় একই কৌশল অভিনেত্রী প্রয়োগ করেন 'পাগলভাই' ডাকের মধ্যে, আবার সর্দারদের যুদ্ধযাত্রার দিকে ধাবিত হবার অন্তিম মুহূর্তে। শেষটিতেও কেন? এইখানে একটু সংশয় জাগে। কুন্দফুলের মালা সর্দারের হাতে তুলে দেওয়া

সম্ভব, কিন্তু মনে হয় না যে তার প্রতি প্রযুক্ত হতে পারে ওই মুক্ত আহ্বানেরও সংযোগ, লড়াইয়ের মুহূর্তে।

আর এরই সঙ্গে আছে নাটক : প্রত্যক্ষ, অবয়বময়, আঘাতশীল। খুব পরিচিত জীবনের এ-নাটক হয়তো শুরু হলো গোকুলের প্রবেশে। রবীন্দ্রনাটকে সাধারণ মানুষগুলি একেবারেই সাধারণের মতো নয়, এই ধারণার বিবৃত প্রতিবাদের মতো একে একে মঞ্চে দেখা দেয় গোকুল, চন্দ্রা, ফাগুলাল বা পরে মোড়লেরা। তাদের ব্যবহৃত শব্দাবলির সঙ্গে আচরণের বা স্বরক্ষেপের এমন সামঞ্জস্য করে দেন পরিচালক যে কখনোই আমাদের থেকে দূরে সরে যায় না তারা। ৩২১-এর চালচলন দেখে যদিও সন্দেহ হতে থাকে যে গোটা জিনিসটা বানিয়েই-বা তোলা, আরেকবার বই মিলিয়ে তবে নিশ্চিত হওয়া যায় যে এর সবটাই ছিল পুঁথিনির্দেশিত। অভিনয়ের চাতুর্যে বুঝতে পারি কীভাবে নাটকের পরতে পরতে জড়ানো আছে খুদে সর্দারেরা, চিকিৎসক বা পুরাণবাগীশ। পুরাণবাগীশ কেন বলতে বলতে আসেন 'ভয়ংকর শব্দ যে' তা প্রচণ্ড পরুষতায় ধরা দেয় সমগ্র মঞ্চ জুড়ে, যেন পাশব চিৎকারে জ্বলে ওঠে সব, জালাবরণের কুক্ষি থেকে একে একে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে ছিবড়ে-করা 'রাজার এঁটো'রা, তার মধ্যে শাণিত শব্দে বেরিয়ে আসে নন্দিনীর চিৎকার। সব জড়িয়ে আমাদের অবশ করে অদ্ভুত শক্তির কিম্ভূত খরচের এই উৎকট পীড়ন, নাটকের শব্দকে দৃশ্যে তুলে নেবার এমন নিদারুণ উদাহরণ আমাদের অভিজ্ঞতায় বিরল। তখন আর বলা যায় না যে এসব একেবারেই আমাদের বাস্তবতার বহির্ভূত জগৎ, প্রত্যহের সঙ্গে সংঘর্ষ রেখেই এ আমাদের তুলে নেয় আরেক স্তরে।

২

কিন্তু 'রক্তকরবী'র সমস্ত পালাটি কি সত্যিই নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি? অর্থাৎ এ-বাক্যের ঝোঁকটা যদি সরে যায় 'মানবী' থেকে 'নন্দিনী' শব্দের দিকে, তাহলে তাকে কি আমরা নাটকের যোগ্য পরিচয় ভাবতে পারি? নন্দিনীই অধিকার করে থাকে সমগ্র দৃশ্যপট এবং চন্দ্রার ধরনে আমরাও বলতে পারি যে এখানে প্রায় সবাইকেই 'নন্দিনীতে পেয়েছে', এমন-কী সর্দারদেরও। তাহলেও শেষ অবধি বেশি জরুরি হয় রাজার সমস্যা, রাজার মোচন। 'রাজা' নাটকে যেমন রাজা কেন্দ্রীয় সত্তা হলেও আমাদের মূল আকর্ষণ সঞ্চিত থাকে সুদর্শনার জন্য, এখানেও তেমনি ধ্রুবশক্তি নন্দিনীর চেয়ে বড়ো হয়ে দাঁড়ান

অহংরুদ্ধ রাজা! এটা অবশ্য ঠিক যে রঞ্জনের সঙ্গে তার মিলন হবে কিনা এমন একটা সহজ নাটকীয় কৌতূহল নন্দিনীকে ঘিরে রাখে। অথবা মঞ্চগোচর এই চরিত্র বিচিত্র মানবসম্পর্কের মধ্যে স্পন্দিত করে তোলে তার আচরণ, সে অনেক প্রত্যক্ষ। কিন্তু নাটকটির তাৎপর্য অনেকখানি নেমে আসে যদি-না আমরা লক্ষ করি জালের অবরোধে আমাদের অহং বা ego-র ধরন, আস্ফালনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে অবশেষে তার তুচ্ছতার উপলব্ধি। মঞ্চে রাজা যে অদৃশ্য এবং পরিণামে দৃশ্য হন, এ-দুটোই সমান তাৎপর্যময় ঘটনা, এটা ঠিক অন্যান্য রাজার মতো অ্যাবস্ট্রাকশনের ধারণা মাত্র নয়। অথবা লোর্কা যেমন অনেক নাটকেই নেপথ্যে রাখেন তাঁর কোনো চরিত্রকে, যেমন 'বের্নার্দা আল্‌বা-র সংসার' রচনায় সব-কটি মেয়েই ঘুরে ঘুরে বলেছে পুরুষপ্রবর পেপে-র কাণ্ডকীর্তি অথচ তাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও, 'রক্তকরবী'র অনুপস্থিতি তেমন কোনো সহজ নাটকীয়তাও নয়।

এইখানে একটা প্রশ্ন জাগে বহুরূপীর অভিনয় থেকে। জালমোচনের পর আমাদের মন রাজার প্রতি কতটা উন্মুখ হতে পারল? পরিচালক নিশ্চয়ই জানেন যে রাজার তিনটি ভিন্ন উপস্থাপনায় রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ তাঁকে নিয়ে এসেছেন এই অবরোধমোচনের দিকে। নিতান্ত ঘটনাক্রমে নয়, চরিত্রক্রমেই ঘটে এই মুক্তি। প্রথম আবির্ভাবে 'সময় নেই, একটুও না', অতঃপর শুনতে পাই 'এখনও সময় হয়নি' এবং তৃতীয় আবির্ভাবে 'তোমাকে আমার পরিচয় দেবার সময় এসেছে'। কেমনভাবে এল সময়? যতক্ষণ তিনি জানতে পারেননি মরাযৌবনের অভিশাপ, তার আগেই কেমন করে খুলল জাল? নিজের ভিতরে ভালোবাসার জেগে-ওঠাই হলো সেই উপায়। এখানে স্মরণীয় 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'তে উল্লিখিত এই বইরের প্রসঙ্গ: 'নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায় তাহলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাদুর্ভাব ঘটে'। সেই বাধার মোচন ঘটছে তখন, যখন ক্লান্ত ব্যথায় রাজা বলেন: 'রঞ্জনকে চাও বুঝি? সর্দারকে বলে দিয়েছি এখনি তাকে এনে দেবে'। এখন আর নন্দিনী-রঞ্জনের মিলনের পথে কোনো বাধা নন রাজা, এখন আর তাদের একসঙ্গে বসিয়ে জানতে চান না, নিজে সরে যেতে চান দূরে: এখনই নন্দিনীর প্রতি তাঁর প্রেম পূর্ণ হলো। আর এই চরিতার্থতার পথ আমরা জানতে পেরেছিলাম দ্বিতীয় স্তরেই মরা ব্যাঙটির উল্লেখে: 'নিরন্তর টিঁকে থাকার থেকে ওকে দিলুম মুক্তি। ভালো খবর নয়?'

এই স্বরানুক্রমণগুলি অভিনয়ে ভালোভাবে আসে কি না তা খুব নিশ্চিত বলা যায় না। এমন-কী মূল নাটকটিতেই কখনো কখনো রাজার ভাষা-ব্যবহারের সমতায় ঝাপ্‌সা হয়ে আসে স্তরকটির স্বাতন্ত্র্য। যে মানবিক বিচ্ছেদ বা অহংকেন্দ্রিকতার দৃশ্যপ্রতীক হিসেবে জালটির ব্যবহার, কণ্ঠক্ষেপের কৌশলে তার সঞ্চার কতটা সম্ভব? কতটা ধরা যায় একই সঙ্গে লুব্ধ আসক্তি আর দাম্ভিক ব্যবধান? অন্তত পরিণামে দ্বারোন্মোচনের পর যে মঞ্চজোড়া অন্ধকারে গোপন হয়ে যান রাজা, এতে খানিকটা ক্ষতি ঘটে বলেই আশঙ্কা জন্মায়, ওই গাঢ় অন্ধকারের ওখানে বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। তবু তার সঞ্চার কি এইজন্যে যে পোশাকে বা অবয়বে দর্শকের সামনে স্পষ্টত ধরা দিতে চান না শম্ভু মিত্র? 'কপালখানা যেন সাতমহলা বাড়ির সিংহদ্বার, বাহু-দুটো কোন্ দুর্গম দুর্গের লোহার অর্গল' এই বর্ণনায় মিলবে না বলে? শ্রমিকদের পোশাকের আধুনিক ধরনের সঙ্গে রাজপরিচ্ছদ যে-বিরোধ রচনা করে তা এই নাটকের পক্ষে বাধাজনক নয়, এর ফলে যে বাস্তবের কাঠামোটা ঈষৎ নড়ে যায় সেটা প্রত্যাশিতই। তবে শারীরিক বিঘ্নের কথা স্বতন্ত্র। আমার এক দার্শনিক বন্ধুর সঙ্গে যদিও আমি একমত নই যে রাজাকে এখন খুব তুচ্ছ দুর্বল মানুষ হিসেবেই দেখানো ভালো, তাতে তাঁর অন্তরালবর্তী আস্ফালন হঠাৎ বেশ উপহাস্য দেখায়, ভেঙে যায় অহংবিলাসের গরিমা—কিন্তু তবুও মনে হয় অনেক স্পষ্টতায় রাখবার প্রয়োজন ছিল খোলা রাজাকে, এই নাটককে ঠিকমতো ধরতে পারলে নন্দিনীর উদ্ধৃত বর্ণনার সঙ্গে তাঁকে আক্ষরিক মিলিয়ে নেবার আকাঙ্ক্ষা দর্শকমনে জাগে না।

ভাবতে হয় নন্দিনীরও বিষয়ে। নন্দিনীর সফলতা কেবল তার আনন্দময় অস্তিত্বে, 'আমি আছি' এই সত্যকে এমন করে আর কেউ অনুভব করেনি। কিন্তু থাকার এই আনন্দ দেখা দেয় তার আচরণেই, বাণীতে নয়। পরে যখন মৃত রঞ্জনের পাশে দাঁড়িয়ে সে জানতে পারে মৃত্যুর জোর এবং রাজাকে বলে: 'আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু' তখন তার চরিত্রে যে মাত্রার বদল ঘটে যায়, অভিনয়ের উত্তেজনায় সেইটে তত ধরা পড়ে না। আর তখন আমরা লক্ষ করি, এই প্রথম হয়তো লক্ষ্যে আসে যে পরিচালক অল্পস্বল্প সুযোগ নেন পুঁথি থেকে বর্জন বা পুনর্বিন্যাসের।

সংযোজন আপত্তিজনক হলেও এ-রকম মঞ্চপ্রয়োগে আংশিক বর্জন কখনো-বা অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। প্রশ্ন এই, কেন বর্জন। পুরাণবাগীশের অনেকটা

সংলাপ ছেড়ে দিলে নজরেই আসে না, 'ভয়ংকর শব্দে'র আলোড়িত পরিবেশে দুই পণ্ডিতের আলোচনা নাট্যপ্রয়োগের পক্ষে অসুবিধের এবং বিষয়ের পক্ষে একটু ব্যাখ্যাপরায়ণ। কিন্তু যখন প্রায়-বর্জিত হয় অবসানে পৌষের গানটি, তখন হয়তো ততই সহজে আমরা এর সমর্থন পাই না। 'প্রায়-বর্জিত' বলতে হয়, কারণ পরিচালক গানটিকে রাখতেই চান এবং তার ব্যবহারও করে থাকেন, কিন্তু একাধিক অভিনয়ের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় সেটা ঠিকমতো পৌঁছয় না দর্শক পর্যন্ত। একে কি ভাবব সাংগঠনিক বিঘ্ন ? বস্তুত মনে হয় ঈষৎ দ্বিধান্বিত আল্‌গা ভঙ্গিতে রাখা-না-রাখার মাঝখানে এই গান। কেন এর প্রয়োগে আরো উচ্চাশী নন পরিচালক ? রবীন্দ্রনাটকে গান অনেকসময়ে বাহুল্য, কিন্তু ধ্রুবপদের মতো ফিরে-আসা এই সুরটি তো নিষ্কারণ নয়। হয়তো ভয় হতে পারে যে এই গানটি ধরিয়ে দিচ্ছে আধুনিক সভ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এক অতিসরলীকৃত সমাধান, হয়তো কেউ ভাবতে পারেন যে গোটা যন্ত্রবিজ্ঞানটাকেই ত্যাগ করবার ছল হিসেবে এই পৌষের গানের পুনরাবির্ভাব। অন্তত আপ্‌টন সিন্‌ক্লেয়ার অনুরূপ অনুযোগ করেছিলেন তাঁর সপ্ততিবর্ষের সংবর্ধনায়, মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন যে যন্ত্রে নয়, সমস্যা হলো যন্ত্রের ব্যবহারে। অনুযোগ হয়তো বাহুল্যই ছিল, কেননা এটা রবীন্দ্রনাথ মনে রাখেননি ভাবলে আমরাই বরং অতিসরল করে নেব তাঁর চিন্তাকে। আর্থার কোনান ডয়াল যে আধ্যাত্মিক সমাধানের কথা জানাচ্ছিলেন সিন্‌ক্লেয়ারকে, যার উত্তরে তৎকালীন এই সোশ্যালিস্ট ভাবুককে বলতে হলো : 'On the subject of spiritualism, my attitude has to be, wait and see'—সিন্‌ক্লেয়ার লক্ষ করেননি যে সেই আধ্যাত্মিকতা রবীন্দ্রনাথের নয়।

'তাকে বলেছিলুম তার থেকে কিছু নেব না, এই নিতে হলো—তার শেষ দান' এই বলে বিশু যে কঙ্কণচ্যুত রক্তকরবীটি তুলে নেয়, একে পরিচালক এনে দেন যূথবদ্ধ 'লড়াইয়ে চল্‌' ডাকের আগে। এর কারণ দুর্বোধ্য নয়। শ্রমিকসঙ্ঘের উত্তাল আবির্ভাবে গর্জে ওঠে জয়ধ্বনি, বিভিন্ন অস্ত্রে-জোড়া হাতের সমবেত প্রসারণ প্রায় ভাস্কর্যের কাঠিন্যে মঞ্চ ভরে দেয়—অল্পের জন্য ঝিকিয়ে ওঠে আমাদের বিধ্বস্ত ঝিমন্ত মন। এই অনুভূতিতেই নাটক শেষ করবার মধ্যে যে প্রবলতা আছে, সংগতভাবেই সেটিকে ধরতে চান শম্ভু মিত্র। আমাদের নিশ্চেতন হতাশ্বাসকে আঘাত করবার যোগ্য এই আয়োজন। কেবল রাজনৈতিক প্রপ্যাগাণ্ডায় নয়, অথবা শিল্পভণিতির মোড়কে তুলে দেওয়া কোনো সংগ্রামী

প্রোগ্রামে নয়, শিল্পের নিজস্ব অধিকারেই যে পৌঁছতে পারে জীবনের বেগ আর উল্লাস, 'রক্তকরবী' এবারে তা প্রমাণ করল। কিন্তু তার এই সম্পূর্ণ অভিভব স্বীকার করেও প্রশ্ন ওঠে, রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় কি অবিকল ধরা পড়ল অভিনয়ে? সম্ভব ছিল না কি এরই আপাতবৈষম্যে পশ্চাৎপটে গানটিরও কোনো দীপ্যমান আবহ রেখে একটা জটিল সংগঠন দেখিয়ে দেওয়া? বাস্তবে-পরাবাস্তবে মিলিয়ে নেওয়া? শক্তিপরীক্ষার প্রায় চূড়ান্তে পৌঁছে চ্যালেঞ্জটাকে যেন ছেড়ে দিলেন পরিচালক, এই শেষ মুহূর্তে।

তুলনীয় একটি রচনা মনে পড়ে এখানে, স্ট্রিণ্ডবের্গের 'স্বপ্ন নাটক'। তারও প্রতীক গড়ে ওঠে এক দুর্গ আর এক ফুলে, আত্মকারায় বন্দী অফিসার আর তাকে মুক্ত করবার যোগ্য এক স্বর্গচ্যুত ইন্দ্রকন্যা, অ্যাগ্নেস। নন্দিনীর মতো এ-চরিত্রও প্রথমে দেখা দেয় অপাপবিদ্ধ সারল্যে, কিন্তু ক্রমেই বিধুর হয়ে ওঠে অভিজ্ঞতায়। এ-নাটকও দেখাতে চায় জড় বস্তুপিণ্ড থেকে চেতনার মুক্তি, অহংময়তা থেকে নির্গলিত হবার পথ। সেখানেও শুনতে পাই; 'কেন আবর্জনা থেকে বেরিয়ে আসে ফুল? আলোর দিকে ফুটে উঠে ঝরে যায়, এই তাদের আনন্দ।' আর অন্তিমে, যখন জ্বলে যাচ্ছে একটু একটু করে সমস্ত দুর্গ, তার মধ্যে দেখা দিচ্ছে হতাশ শোকময় প্রশ্নাতুর মুখের ভিড়, তখন এক ফুলের কুঁড়ি আকস্মিক প্রস্ফুটনে হয়ে ওঠে বিশাল এক ক্রিসেন্থিমাম্।

এই ক্রিসেন্থিমাম্ আর রক্তকরবী প্রায় সমতুল্য, কিন্তু বিন্যাসে একেবারে সমান নয় নাটকদুটি। 'স্বপ্ন নাটক'কে দেখাতে হবে স্বপ্নছায়ার মতো সবটা প্রায় একই স্তরে। 'রক্তকরবী'কে নিয়ে আসতে হবে জাগ্রত জগতে। জাগ্রত জগতে, অথচ সম্পূর্ণই আমাদের চেনাজানা চব্বিশ ঘণ্টার সীমানার মধ্যেও নয়। ক্রিসেন্থিমামের জ্বলে-ওঠার মতো প্রকট নয় বটে বিশুর রক্তকরবী তুলে নেওয়া, ইতিমধ্যে এতবারই ওই ফুলের কথা আমরা শুনেছি যে ও-টি আর ওখানে কোনো পৃথক জায়গা জুড়ে থাকে না, জায়গা পেয়ে যায়। কিন্তু যা-ছিল ঐ ক্রিসেন্থিমামের ফুটে-ওঠায়, দৃশ্যরূপে, আমাদের নাটকের অবসানে কি তাকেই রবীন্দ্রনাথ ধরেননি শ্রুতির কাছে গান হিসেবে? আগুনের মধ্য দিয়ে ক্রিসেন্থিমাম্ যেমন দেখতে পাই, লড়াইয়ের আহ্বানের মধ্য দিয়ে পৌষের গানকে তেমনিভাবে শুনতে পেলে রচনার দুই স্তর এখানে শেষ অবধিই মিলে যেতে পারে অভিনয়ে। তখন গানটিকে আর সংগ্রামের বিকল্প বলে বোধ হয় না, সংগ্রামের অন্তঃস্থ সামর্থ্য বলেই জানা যায়। এবং তখন নন্দিনীর মানবীরূপকে অব্যাহত রেখেই

তাকে অতিক্রম করে যাবার নাটকীয় অভিপ্রায়টি পরিবাহিত হতে পারে মঞ্চ থেকে দর্শকে। এই পরিবহণ কোথায় যেন থমকে যাচ্ছে অভিনয়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে।

১৯৬৯

অভিনয়ের মুক্তি

আনুইয়ের 'আন্তিগোনে' অভিনয়ের পর যেন এক ঝড় উঠেছিল তাঁকে নিয়ে, এর মধ্যে কেউ দেখেছিলেন নাৎসিবাদ কেউ-বা অ্যানার্কিজম। সেই অভিজ্ঞতা মনে করতে ভালো লেগেছিল সার্ত্রের, কেননা এই উত্তেজনা থেকেই বোঝা গেল যে ঠিক জায়গায় এখন আঘাত করতে পারছে তাঁদের নতুন নাটক, দর্শক-জনের অনড় অভ্যাসকে টলিয়ে দিতে পারছে শেষ পর্যন্ত।

সার্ত্রের এই উৎসাহিত স্মৃতিকথা শুনতে শুনতে মনে পড়ে বহুরূপী দলের 'রক্তকরবী' প্রসঙ্গ। সেই অভিনয়ের প্রথম পর্যায়ে কেমন এক চাপা গুঞ্জন তৈরি হয়েছিল তা আমরা ভুলিনি, এমন গুজবও ছড়াচ্ছিল যে অভিনয় বন্ধই-বা হয়ে যায়, কেননা বিশুদ্ধ রাবীন্দ্রিক মহল এর থেকে খুঁজে পাচ্ছিলেন কমিউনিস্ট ছলা। সন্দেহ নেই যে ওই অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে রাষ্ট্র-কাঠামো বা সামাজিক পট দেখা দিল অনেক বেশি প্রত্যক্ষতায়। কিন্তু মূলের চেয়ে স্বতন্ত্র একটি-কোনো শব্দেরও নূতন যোজনা না করে কেমনভাবে সেই অভিনেতৃদল হয়ে উঠছিলেন অপরাধী ?

এক হিসেবে বলতে গেলে এই অভিনয়ের মধ্যেই উঠে এসেছিল নাটকটির সম্পূর্ণ বিষয়চাপ। যে প্রাণনাশক যান্ত্রিকতাকে ধিক্কৃত করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সে-ধিক্কার এবার কোথাও পৌঁছল ঠিক। কিন্তু কেন এর আগে অনেকেরই চোখে পড়েনি বা মনে লাগেনি নাটকের অনতিগোপন এই অভ্যন্তরীণ দ্যুতি ? তাঁর সমকালীন প্রবন্ধাবলি এবং চিঠিপত্রে যদিও তিনি বারংবার প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন এই যন্ত্রসর্বস্ব দুঃসমাজের বিরুদ্ধে, মার্কিন দেশকে মনে হচ্ছিল তাঁর 'ব্রবডিঙ্‌ন্যাগ রাজ্যে দীর্ঘকালের দুঃস্বপ্ন', দেখছিলেন 'জনমনের চোরাবালির উপর এরা মিথ্যার প্রলেপ দিয়ে রাজনৈতিক সভ্যতার বিরাট সৌধ' গড়ছে কিংবা কেমনভাবে চলছে 'রাশিয়ার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার', তবুও তাঁর এ-ধারণা সত্যি হয়নি যে এসব ভাবনার কারণে দেশে ফিরলে তাঁর ভাগ্যে লেখা হবে

'একাকী নির্বাসন'। সত্যি হয়নি, কেননা এই ধিক্কার আর বেদনা যে-মুহূর্তে রূপ নিল সাহিত্যের, হয়ে উঠল 'রক্তকরবী', পাঠক তাকে দেখতে অভ্যস্ত হলেন পুরোনো পরিচিত মায়ামণ্ডনে, অলৌকিক রহস্যময়তায়, হারিয়ে গেল তার রাষ্ট্রগত প্রতিবাদের বাস্তব। কখনো কখনো এমন হয় যে রচনাকে অতিক্রম করে ওঠে রচয়িতার পরিচিত মুখ, এই মুখই তখন হয়ে দাঁড়ায় যেন সৃষ্টির পক্ষে মুখোশ! তখন আর কিছুতেই আমরা তাকে দেখতে পাই না সত্য রূপে, ভেঙে যায় রচনার আদি তাৎপর্য। এটা ঠিক যে অভিনয়ের জোর কখনো কখনো ছিঁড়ে নিতে পারে কৃত্রিম সেই আড়াল, আমাদের পৌঁছে দিতে পারে অনেকটা কেন্দ্রের কাছাকাছি। এবং তখন ফ্যাসিবাদ অ্যানার্কিজম যে-নামেই তাকে ডাকি না কেন, উত্তেজনা সরে গেলেই বুঝতে পারা যায় যে তীরটা এবার লক্ষ্যে এসে লাগল।

কিন্তু অভিনয় যেমন খুলে দিতে পারে আড়াল, তেমনি আবার অভিনয় নিজেই কি কখনো নয় আড়াল? এই প্রশ্ন থেকে উঠে আসে আরেক জটিলতা। মঞ্চে নেবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত নাটকের বইখানি স্বরলিপি ছাড়া কিছুই নয়, এ-কথার গূঢ়তা বোঝা যায়। কিন্তু শ্রোতার কাছে সেই স্বর পৌঁছে দেবার যত পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় নাটকে, সে তো অনেকটাই তাকে ধরে রাখবার নানা কৌশল। ভাবনার বৃত্তকে কিছুমাত্র স্পর্শ না-করেও কেবল আলোর চাতুরিতে মেঘ নাচিয়ে জল ভাসিয়ে বা ট্রেন চালিয়ে যখন সহস্র রজনী অতিক্রম করে কোনো জনপ্রিয় নাটক, শিল্পবোধের নজিরে তখন তাকে সহজেই পরিহাস করা চলে। কিন্তু ভাবলে হয়তো দেখা যাবে এটা নিতান্তই মাত্রার ব্যাপার। কেননা অন্যদিকে আবার ঠিক সেইরকমই শারীরিক নানা মুদ্রায়, কণ্ঠের সঞ্চালনে অথবা পেশীর সৌষ্ঠবেই কি বাঁধা পড়ছে না দর্শকের মন? তার চোখকান? একটাকে বলি যান্ত্রিক আলো, আরেকটা হয়তো জীবিত শরীর। কিন্তু শরীরও কি ক্রমে হয়ে উঠছে না সুঠাম এক নমনীয় যন্ত্র? অমুক অথবা অমুকবাবুর অভিনয়মহিমা তখন হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিশেষ বিশেষ নাটকের একান্ত আকর্ষণ। আর তারই ফলে মঞ্চে দ্রুত গ'ড়ে উঠছে এক স্টারসিস্টেম। সব শিল্পের মধ্যে নাটকই হয়তো সবচেয়ে মুখোমুখি খোলা হয়ে দাঁড়াতে পারে আমাদের সামনে। কিন্তু সব শিল্পের মধ্যে নাটকেই এ-ভয় বেশি যে বহিরবয়বে থমকে যাবে মন, সে-অবয়বের আপন জোর এতটাই। ছন্দ যেমন কবিতার পক্ষে উপকারী হলেও অনেকসময়েই হয়ে উঠতে পারে প্রবল বাধা, অভিনয়ও তেমনি নাটকের পক্ষে যতখানি অনিবার্য, ততখানিই সে আবার বিঘ্ন!

এই কারণে, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট নামে যাঁর খ্যাতি, সেই হেনরি আর্ভিঙের অভিনয়কে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল দুঃসহ। এঁরই অভিনয়প্রতিভায় ভিক্টোরীয় মঞ্চে আরেকবার প্রবল হলো শেক্সপীয়রের আকর্ষণ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : 'বিখ্যাত অভিনেতা আর্ভিঙের হ্যামলেট ও ব্রাইড অব লামারমুর দেখিতে গিয়াছিলাম। আর্ভিঙের প্রচণ্ড অভিনয় দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। এরূপ অসংযত আতিশয্যে অভিনেতব্য বিষয়ের স্বচ্ছতা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে ; তাহাতে কেবল বাহিরের দিকেই দোলা দেয়, গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিবার এমন বাধা তো আমি আর কখনো দেখি নাই।' এ-আপত্তি কেবল রবীন্দ্রনাথেরই নয়, আর্ভিঙের পরিশ্রমী অঙ্গভঙ্গিমা অনেককেই করে তুলেছিল অসহিষ্ণু। দু-একজন এতটাই বলছিলেন যে তাঁর প্রতিষ্ঠারও মূল তিনি নিজে নন, বস্তুত তিনি মর্যাদা পান নায়িকা এলেন টেরির নৈপুণ্যে।

তার মানে এ নয় যে অভিনয়টাই তাহলে পরিত্যাজ্য। টেনেসি উইলিয়মস্ যে-সমালোচকদের অবজ্ঞা জানিয়েছিলেন এক 'bucket brigade of critics' নামে, তাঁদের এই ভাবনা নিশ্চয় পাগলামি যে অভিনয় হচ্ছে নাটকের ইতরীকরণ, রচনার পক্ষে সর্বনেশে। রবীন্দ্রনাথেরও বক্তব্য, স্বভাবতই, অভিনয়ের বিপক্ষে নয়। অভিনয় অবশ্যই চাই, কিন্তু ওরই মধ্যে চাই মুক্তি, খানিকটা না-অভিনয়। তা নইলে বাইরের দোলায় মুগ্ধ জননন্দনের আবেগভারে মনে হতে পারে যে আমরা পৌঁছে গেছি সফলতার চূড়ায়, ভুলভাবে মনে হতে পারে যে সাম্প্রতিক বাংলাদেশের নবনাট্য আন্দোলন অবশেষে অর্জন করছে তার বিষয়ের সিদ্ধি। এই আন্দোলন যে সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল, তা যদি দেশে অনেকটাই ব্যাপ্ত হয়ে না-পড়ত তবে কীভাবে সম্ভব হলো এত ছোটো ছোটো নাট্যগোষ্ঠী? এই প্রশ্ন বিচারের সময়ে মনে রাখা ভালো যে বিচিত্র উপকরণের সহযোগে যেমন দ্রুতই আমরা ছুঁতে পারি দর্শকমনের লঘু স্তর, তেমনি এর প্রমোদজনক আকর্ষণের জন্য ত্বরিতবেগে তৈরি হতে পারে অসংখ্য দল। এর থেকে যদি ভাবি যে দেশ এখন বেশ টগবগিয়েই চলছে নাটকে, অথবা যদি মনে হয় যে এই হচ্ছে যোগ্য সময় নাটকের মধ্যে সব কথা বলে নেবার, নাটকের সাহায্যে আমাদের সব ভাবনা জনতার কাছে পরিবাহিত করে দেবার, তাহলে সে হবে এক ভিত্তিহীন আত্মতৃপ্তি।

কীভাবে তবে অর্জিত হতে পারে মুক্তি? অভিনয় যেন না হয়ে ওঠে বিষয়ের আড়াল, সে-জন্য অভিনয়কেই কি আড়াল করে দেওয়া চাই মুখোশের

প্রয়োগে? ও'নিল অন্তত ভেবেছিলেন যে আধুনিক নাটকে যদি ধরতে হয় গূঢ় মনস্তত্ত্বের অন্তর্নাট্য, তাহলে একদিন মুখোশের ব্যবহার হবে অপরিহার্য। এমন-কী হ্যামলেটকেও তিনি ধরিয়ে দিতে চান মুখোশ, কেননা কেবল তাহলেই না কি সেখানে আমরা দেখতে পাব আত্মহৃদয়ের তুমুল আন্দোলন, কোনো শক্তিমান অভিনেতার বহিরাচার দেখেই আমাদের ফিরতে হবে না তাহলে। সে-ক্ষেত্রে কোনো হেনরি আর্ভিঙ আর আচ্ছন্ন করতে পারেন না কোনো হ্যামলেটকে।

এখনো অবশ্য প্রমাণিত হয়নি যে ও'নিলের ওই ভবিষ্যকথন কোনো অর্থে গ্রাহ্য ছিল, ঠিক এই প্রয়োজনে মুখোশের প্রচলন এখনো পর্যন্ত জরুরি হয়নি। কিন্তু এ-ও ঠিক যে ওই একই ভাবনার ভিন্ন ভিন্ন কোণ ধরা পড়ছে অন্যত্র, হয়তো এরই এক তত্ত্বরূপায়িত স্পষ্ট অবয়ব হয়ে ওঠে ব্রেখ্‌টীয় অভিনয়ের ধারণা, অথবা ব্রেখ্‌ট থেকে অত্যন্ত পৃথক রাবীন্দ্রিক অভিনয়ধরন। রবীন্দ্রনাথের মঞ্চাভিনয় প্রসঙ্গে অবশ্য কোনো গোটা বিবরণ আমাদের হাতে পৌঁছয় না, তাহলেও টুকরো টুকরো স্মৃতিকথন থেকে তার একটা ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব। তাঁর অভিনয়কে ধরা যাচ্ছে না প্রচলিত কোনো রীতির অন্তর্গত রূপে, মুগ্ধ হয়েও সকলে বলছেন তাঁর প্রধান ঝোঁক আবৃত্তিরই দিকে। অভ্যাসের জগৎ থেকে দেখলে সৌম্যেন্দ্রনাথ বরং মনে করেছেন যে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড়ো অভিনেতা অবনীন্দ্রনাথ। অন্যদিকে যাঁরা অন্তত 'কর্ণকুন্তীসংবাদ'-এর রেকর্ডও শুনেছেন তাঁরাও জানেন যে কেবল কণ্ঠের সাহায্যে কত দ্রুত তিনি আমাদের পৌঁছে দিতে পারেন শব্দের সূক্ষ্মচারী বোধে। এমন-কী স্বরভঙ্গিতেও এর জন্য কোনো কৃত্রিম তরঙ্গ তৈরি করেন না তিনি, আলতো টানাপোড়েনে বুনে যান অনুভব-স্তর, কিছু-বা মায়া।

আর ব্রেখ্‌ট ভেঙে দিতে চান এই অনুভূতির পুরোনো জগৎ। অভিনয়জাত মায়ার ঘোর যে দর্শকমন থেকে ছুটিয়ে দেওয়া চাই, এই প্রয়োজনবোধ থেকে শুরু হয় তাঁর এ-ইফেক্ট বা এলিয়েনেশনের চর্চা। তিনি সরাসরি জানান যে এখনকার অভিনেতারা ব্যবহার করেন হিপ্‌নোসিস, এবং তার দ্বারা অন্যায়রূপে আচ্ছন্ন হয়ে যায় নাটকের অর্থ। নতুন অভিনয়ে চাই এর থেকে সরিয়ে নেবার যোগ্য কোনো কৌশল।

'পথের পাঁচালি' উপন্যাসে ছোটো অপু যাত্রার সেনাপতিকে মঞ্চের বাইরে বার্ডসাই ধরাতে দেখে চমকে গিয়েছিল। বড়ো বয়সে নিশ্চয় সে লক্ষ করত যে যাত্রায় এই আবেশ ভেঙে যাওয়াটা প্রায়ই ঘটে, তবুও তার এক অন্তঃসংগতি

রচিত হয়ে যায় কোথাও। চীনা অভিনেতা যখন নিজেই নিজের চলনবলনের দিকে তাকান মঞ্চে দাঁড়িয়ে, তখন তার মধ্যে ব্রেখ্‌ট দেখেন এক 'masterly use of gesture'। অথবা কাবুকির মধ্যে শুনতে পাই কখনো-বা মঞ্চের উপর অভিনেতা ঘোষণা করে বসেন তাঁর নাম, কিংবা তাঁর প্রিয় অভিনেতার নাম, কিংবা এই তথ্য যে অনেকদিন অসুস্থতার পর আজ দর্শকদের সামনে দাঁড়াতে পেরে তিনি ধন্য। এ-ব্যাপারগুলি ঘটতে থাকে নাটকের মধ্যেই, এবং তারপর, 'আচ্ছা-এবার-ফিরে-যাওয়া-যাক-গল্পে' ধরনে আবার শুরু হতে পারে নাট্যকাহিনী।

এসব উদাহরণকে মনে হতে পারে রূঢ়, কিছু-বা স্থূল। কিন্তু এরই সূক্ষ্ম প্রযোজনা যে আধুনিক অভিনয়চর্চায় একটা নূতন দিক্‌নির্দেশ করছে তাতেও সন্দেহ নেই। আর সেটা করতে হচ্ছে কেবল এই কারণেই যে তার অভাবে নাটক ব্যাপারটা গড়িয়ে চলছিল ললিত আবেগতারল্যে, আমাদের বোধ বা বিবেচনার কাছে তার কোনো বড়ো প্রত্যাশা তৈরি হচ্ছিল না, একেবারেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল 'অভিনেতব্য বিষয়ের স্বচ্ছতা'। এমন-কী নবনাট্য-আন্দোলনেরও প্রায় পঁচিশ বছর অতিক্রম করবার পর আমাদের দেশে এই জিজ্ঞাসা এখন প্রাসঙ্গিক যে তার ভাবনার জৌলুশ কতটা পৌছল দর্শকসমাজে, কতখানি দীক্ষা পেল মন। রবীন্দ্রনাটক অভিনয়ে বহুরূপীর ঐতিহাসিক সিদ্ধির পরেও ভাবতে হয়, দর্শক বা দলগুলির মধ্যে কতটা ছড়াতে পারল তাঁর চেতনার অন্তঃসার। মঞ্চের কারিগরি বা অভিনয়ের সৌষ্ঠবে মনমাতানো বাহারের কথা নয়, এখন, এই দ্বিতীয় ঝাঁপের জন্য প্রস্তুত হবার পূর্বমুহূর্তে আমাদের বিচার করতে হবে দর্শকদের এতদিনকার সমর্থনে কতটাই ছিল বিষয়মুখী উৎকণ্ঠা। অভিনয়ের এই নতুন দূরত্ব হয়তো তা পরীক্ষা করতে সাহায্যই করে।

অর্থাৎ এখানে আমাদের মূল ভাবনা অভিনয় নিয়ে নয়, অভিনয়ের অন্তরালবর্তী 'বিষয়' নিয়ে। নাটকে আমরা কতটাই ধরতে পারছি সত্যিকারের 'বিষয়'? একশো বছরের নাট্যচর্চাতেও এ-দেশে আমরা কমই জেনেছি তেমন কোনো ভাবনা যাকে বলা চলবে সর্বাতিশায়ী, যা স্পর্শ করতে পারে একই সঙ্গে দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্তর। কিন্তু সে তো আমাদের মৌলিক দুর্ভাগ্য, দুই বা ততোধিক সংস্কৃতির ছিন্ন জীর্ণতা আমরা অতিক্রম করতে পারছি না প্রায় কোনো শিল্পেই। কাবুকি থিয়েটার একদিন সমগ্র জাপানি সমাজের রুচিসমতার প্রশ্রয় পেয়েছিল বটে, কিন্তু যতই খুলে গেছে পশ্চিমের দুয়ার ততই তার রূপান্তর

ঘটে গেছে 'শিম্পা'-নামের আরেক বিন্যাসে, যার দর্শক ছিল গ্রাম থেকে শহরে-আসা সন্ত-চাকুরেদল ! আমাদেরও তেমনি অর্ধবিলাসী নগরমনস্কতা শেষ পর্যন্ত ঘিরে নিয়েছে এক বিপজ্জনক মধ্যবিত্ত প্রাঙ্গণে, একে ছেড়ে বেরিয়ে আসবার পথ নিতান্ত সহজ নয়।

কিন্তু সেই মধ্যবিত্ত জগতেরও সত্য স্বভাব কি আমাদের নাট্যবিষয় ? এখন থেকে-থেকে শুনতে পাই বটে একাকিত্বের উচ্চারিত বেদনা অথবা জীবনের ভয়ংকর ক্লান্তিকরতা, নাটক দেখতে গিয়ে জেনে নিচ্ছি যে গোটা সমাজটাই এক অর্থবিহীন আবর্তনে নিরন্তর ঘূর্ণিত, একেবারেই এক হাস্যজনক ট্র্যাজেডি। বলতেই হবে যে বাংলা নাটকে এ এক নতুন অভিজ্ঞতার মতন। তাহলেও কেন এর জন্য বেশিদূর আসক্তি দেখা দেয় না মনে ? কেন তবু বারে বারে মনে হয় এ-ও এক ক্লিশেরই ছদ্মরূপ ? কেন এমন সন্দেহ হয় যে জীবনের চেয়ে নিছক জীবনতত্ত্বের প্রতিই আগ্রহ হয়ে উঠেছে প্রবল ?

অসবোর্ন বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন এই দেখে যে তাঁর নাটকের কোনো কোনো সংলাপই হয়ে উঠেছে যেন সমগ্র জীবনবোধের আকৃতি, সেই দু-চারটি কথাকে ছিনিমিনি করেই যেন সবাই মেতে উঠছে নবনাট্যচর্চায় ! 'লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গার' নাটকে জিমি পোর্টার যখন বলে : 'There aren't any good brave causes left' অথবা 'দি এন্‌টারটেনার'-এর চরিত্রটি 'I don't feel a thing'—তখন তারা সে-কথার কতটা ওজন বোঝে কিংবা বিশ্বাস করে বলে, এ-বিষয়ে নাট্যকারের নিজেরই সংশয় প্রচুর। কথাগুলি উঠে এসেছিল এইসব চরিত্রের বেঁচে থাকার আলোড়নে, সেই সত্যজীবনের ছবি থেকে ছিঁড়ে নিয়ে কথাকটিকে যদি ভিত্তি হিসেবে ধরতে চাই তবে নিতান্তই শূন্যের উপর দাঁড়াই আমরা। যখন তাঁর নিজের সংস্কৃতিতে বসেই অসবোর্ন ভাবছিলেন এসব কথার পুনরাবর্তনের অসারতা, তখন আমাদের দেশে কেমন করে বাঁচব এই ধরনেরই বিচিত্র আপ্তবচনের ওপর ! প্রতীকসর্বস্ব শীর্ণতার ওপর ! বস্তুত আমরা ফিরে পেতে চাই চরিত্রই, আধুনিক চরিত্র, দেখতে চাই তাদের মুখোশহীন অভিজ্ঞতালব্ধ উচ্চারণ কতটা আমাদের জীবনের মুখোমুখি এনে দিতে পারে।

যেন নাট্যজগৎ থেকে নির্বাসিত না হয় সেই অবয়বময় চরিত্র। নির্বাসনের লক্ষণ যে ইতিমধ্যে ভয় দেখাচ্ছে না এমন নয়, মুখর আয়োজনের মধ্যে এই মুহূর্তেই তাকে হয়তো বোঝা যাচ্ছে না ততখানি। যদিও আমাদের নাটকে খানিকটা ভুলভাবে জড়িয়ে পড়ছে কবিতা, কিন্তু সেখানে কমই আশ্রয় পাচ্ছে

যোগ্য অর্থে মানবহৃদয়ের কবিতা বা পুরাণ। 'পুরাণ' কথাটি এখানে কেবল প্রাচীনতার বা ঐতিহ্যের লক্ষ্যেই ব্যবহার করছি না, তাকে আমরা দেখতে চাইছি দু-জন মানুষের নিত্যজায়মান ভিতরসম্পর্কের মধ্যে। কামুর একটি রচনাপ্রসঙ্গে যেমন মনে হয়েছিল সার্ত্রের, কেমন করে মাতাপুত্রকন্যার সমগ্র ব্যক্তিত্ব স্থির রেখেও তাদের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কটি স্বতন্ত্র হয়ে বেরিয়ে আসে যেন ছায়ার মতো, আর তারই আবর্তন আমাদের ঘিরে ধরতে থাকে, হয়ে ওঠে পুরাণ। সবচেয়ে ছোটো সামাজিক একক হলো দুই-মানুষ, ব্রেখ্‌টের এ-কথার মর্মও এই প্রসঙ্গে ভাববার। আমরা যদি মিথ্যে ছলের সমস্ত আবরণ ভেঙে দিয়ে এই দুই-মানুষের সত্য রহস্যটি তুলে নিতে চাই নাটকে, তাহলে নাটকে রচিত হবে এক নূতন মাত্রা এবং তার থেকে তৈরি হবে এক নবীন সংযোগ।

কিন্তু এই নবীনতার দিকে এগিয়ে যাবার জন্যই কখনো কখনো হয়তো ভেঙে দিতে হবে অভিনয়ের অতিমায়া, স্বাভাবিকের সর্বগ্রাসী দাবি, নইলে প্রায়ই আমরা থমকে দাঁড়াব কেবল শৌখিনতার বহির্দ্বারে! অন্তত রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় যে-অভিনয়রীতি ছিল তার ইঙ্গিত এই ভাঙারই দিকে। তিনি মনে করিয়ে দেন যে অভিনয় পুরো নকল নয়, 'একেবারে হরবোলার কাণ্ড' নয়, বরং অভিনয় জিনিসটা 'স্বাভাবিকের পর্দা ফাঁক করিয়া তাহার ভিতর দিকের লীলা দেখাইবার ভার' নেয়। যদি আমরা লক্ষ করে থাকি যে তাঁর সামগ্রিক নাট্যরচনায় রবীন্দ্রনাথ বিষয় এবং বিন্যাসেরও মুক্তি ঘটান এইভাবেই, এই স্বাভাবিকের পর্দা অপসরণ করে ভিতর দিকের লীলা দেখাবার সাধনায়, তাহলে তাঁর অভিনয়ের এই রীতিনির্দেশও আমাদের কাছে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত লাগে না।

১৯৬৯

অভিনয়ের মুক্তি এবং রবীন্দ্রনাথ

'Lyceum Theatreএ যাওয়া গেল। Bride of Lammermoor অভিনয় হল। চমৎকার লাগল। কী সুন্দর scene! অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বরাবর ধীর স্বরে বিচিত্র ভাবের concert বাজে, সেটাতে খুব জমিয়ে তোলে। Ellen Terry খুব ভালো অভিনয় করেছিল, Irving এর অভিনয়ও খুব ভালো—কিন্তু এমন mannerism, এমন অস্পষ্ট উচ্চারণ, এমন অসুন্দর অঙ্গভঙ্গি। কিন্তু তবুও ভালো অভিনয়—সেই আশ্চর্য।'

এইরকম একদিন মনে হয়েছিল যুবক রবীন্দ্রনাথের, 'ব্রাইড অব লামারমুর' ছাড়া আর্ভিঙের হ্যামলেটও সেবার দেখেছিলেন তিনি। উনত্রিশ বছর বয়সে অল্প কদিনের জন্য বিলেত গিয়েছেন তখন, আর্ভিঙ তখনো 'স্যার আর্ভিঙ' নন কিন্তু লাইসিয়ম থিয়েটারে তাঁর অভিনয় তখন কিংবদন্তি, কিংবদন্তি তাঁর অভিনীত শেক্সপীয়রের চরিত্রগুলি। অভিনয়জগতে ভিন্ন এক মর্যাদার সূচনা করেন তিনি গৌণতম চরিত্রেরও নিবিষ্ট পরিকল্পনায়, মঞ্চের নানা নূতন বিন্যাসে, মঞ্চের উপর মৃদু গ্যাসের আলোর সূক্ষ্ম আর বিশদ কারুকাজে (বিদ্যুৎ-বাতি যখন এল মঞ্চে, তার পরেও এই আলোই পছন্দ করতেন আর্ভিঙ : এলেন টেরি আমাদের জানান তাঁর স্মৃতিকথায়)।

উচ্চারণ আর অঙ্গভঙ্গি বিষয়ে আর্ভিঙের এই যে দুর্বলতার কথা বলেন রবীন্দ্রনাথ, সে অবশ্য তাঁর একারই ভাবনা নয়। আর্ভিঙের অন্য সমালোচকেরাও বলেন তাঁর এই শারীরিক সীমাবদ্ধতার কথা, অনমনীয় স্বর আর তীব্র আবেগময় ভঙ্গিমার কথা, জানান যে তাঁর অভিনয়ে কাব্যের বড়ো অভাব। কিন্তু এই নিয়েই আর্ভিঙ এক বর্ণময় রোম্যান্টিকতায় শেক্সপীয়র অভিনয়ের বিশেষ-একটি নাম হয়ে আছেন আজও, আমাদের দেশেও কেশবচন্দ্র বা গিরিশচন্দ্রদের গ্যারিক বলার মতো অমরেন্দ্রনাথকে কেউ কেউ নাম দিচ্ছিলেন 'বাংলার আর্ভিঙ'।

এমন অস্পষ্ট উচ্চারণ এবং অদ্ভুত-সব অঙ্গভঙ্গি নিয়েও 'কী এক নাট্যকৌশলে

ক্রমশ অলক্ষ্যে দর্শকের হৃদয়ে সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করতে পারেন' আর্ভিঙ, সেদিন তা লক্ষ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মনে হয় বাইরের জোর আর জাঁকজমকে তখনো যেন মুগ্ধতা ছিল তাঁর, 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'র একাধিক বর্ণনাতে ইশারা থেকে যায় এই মুগ্ধতার। স্যাভয় থিয়েটারে 'গন্‌ডোলিয়ারস্‌' নামের এক গীতিনাট্য দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, 'আলোকে, সংগীতে, সৌন্দর্যে, বিবিধ বর্ণবিন্যাসে, দৃশ্যে, নৃত্যে, হাস্যে, কৌতুকে' যেন কোনো কল্পরাজ্যে আছেন তিনি। মনে হয়েছিল একে 'কিন্নরলোক থেকে সৌন্দর্যের অজস্র পুষ্পবৃষ্টি' কিংবা 'একটা উন্মাদকর যৌবনের বাতাসে পৃথিবী জুড়ে সুন্দর নরনারীর একটা উলটপালট ঢেউ।' ইংরেজদের আমোদপ্রমোদের মধ্যে যে 'মানুষের ক্ষমতার অন্ত দেখা যায় না,' সেটা অভিভূতই করছিল তাঁকে, বিহ্বল করছিল এদের নাট্যশালার 'কী অদ্ভুত বিচিত্র ব্যাপার, কী আশ্চর্য সৌন্দর্যের মরীচিকা!'

কিন্তু অনেকদিন পরে যখন তিনি বলবেন ওই একই অভিজ্ঞতার কথা আবার, শুনতে পাব এক ভিন্ন স্বর। স্বরে আর শরীরে প্রকাণ্ড একটা জোর এনে নাটকের স্বচ্ছতাকে যে একেবারে নষ্ট করে দেওয়া হয়, আর্ভিঙেরই উদাহরণ দিয়ে সেই ধিক্‌কার জানান তিনি পরের বারের জাহাজ থেকে, ১৯১২ সালে লেখা 'অন্তরবাহির' প্রবন্ধে। ওই প্রবন্ধে লেখেন তিনি: 'যে ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়া সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার মতো বাড়াইয়া বলে। সংযম আশ্রয় করিতে তাহার সাহস হয় না। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চে প্রত্যহই মিথ্যাসাক্ষীর সেই গলদ্‌ঘর্ম ব্যায়াম দেখা যায়। কিন্তু এ-সম্বন্ধে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলাম বিলাতে। সেখানে বিখ্যাত অভিনেতা আর্ভিঙের হ্যামলেট ও ব্রাইড অব লামারমুর দেখিতে গিয়াছিলাম। আর্ভিঙের প্রচণ্ড অভিনয় দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। এরূপ অসংযত আতিশয্যে অভিনেতব্য বিষয়ের স্বচ্ছতা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে; তাহাকে কেবল বাহিরের দিকেই দোলা দেয়, গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিবার এমন বাধা তো আমি আর কখনো দেখি নাই।'

আর্ভিঙের অভিনয় সত্যিই অগভীর ছিল কিনা, সেটা অবশ্য আমাদের বিবেচনার বিষয় নয়। এখানে আমরা লক্ষ করতে চাই কেবল অভিনয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রুচির ধরন। মূল অভিজ্ঞতা থেকে স্মৃতির এই পর্বে সরে আসবার মধ্যে কেটে গেছে পুরো দুই দশক, তিরিশ বছরের যুবক আজ পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ়। এই সময়ের মধ্যে লেখা হয়ে গেছে তাঁর সাহিত্যশিল্প বিষয়ে 'অধিকতর

সত্য'র তত্ত্ব, ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসের একটি স্বতন্ত্র গড়ন আর অভিপ্রায়েরও কল্পনা করে নিয়েছেন তিনি। দেশের সেই ধারণায় শিল্পের সেই ধারণায় এখন তাঁর সর্বায়ত ঝোঁক হলো সেইদিকে, যেখানে জীবন আর শিল্প কেবল 'স্বাভাবিকের পর্দা ফাঁক করিয়া তাহার ভিতরদিকের লীলা দেখাইবার ভার লইয়াছে।' ভিতরদিকের এই লীলার জন্য ইতিমধ্যে 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে (১৯০৩) তিনি দাবি করেছেন ভিন্ন ধরনের কোনো থিয়েটার, কেননা 'বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ।' এখন তিনি মনে করেন কলাবিদ্যাকে হতে হবে 'একেশ্বরী', নানা উপাদান নানা উপকরণের সাহায্য ছাড়াই অভিনয়কে হতে হবে আত্মপ্রতিষ্ঠ, সাম্প্রতিক কালে গ্রোটোভ্‌স্কির 'পুওর থিয়েটারে'র ধারণায় যার হালফিল পশ্চিমি রূপ আমরা দেখছি। ভাবুকের মনের মধ্যেই আছে রঙ্গমঞ্চ, এই কথা এখন মনে করিয়ে দিতে চান রবীন্দ্রনাথ। এখন নিশ্চয় আর্ভিঙের অভিনয়কে ভালো বলতে পারেন না আর, কেননা এখন তাঁর আদর্শ হলো : 'অভিনয়ের চারি দিক হইতে তাহার বহুমূল্য বাজে জঞ্জালগুলো ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া তাহাকে মুক্তিদান ও গৌরবদান।'

অর্থাৎ, ইওরোপীয় বাস্তবতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যে আপত্তি ছিল যে-কোনো শিল্পেরই বেলায়, 'খেলো নকলনবিশি' করতে যে নিতান্ত অরুচি ছিল তাঁর, সেইটের প্রভাবেই তিনি বলতে পারেন যে অভিনয়টাও ঠিক 'হরবোলার কাণ্ড' নয়, মঞ্চের উপর মানুষের হৃদয়াবেগকে খুব বড়ো করে দেখাবার জন্য কোনো জবরদস্তি ভালো নয়। এই ভাবনারই পরিণতি আমরা দেখতে পাব যখন জাপান যাবেন তিনি, অথবা যখন ছেষট্টি বছর বয়সে দেখবেন জাভার নাট্যকলা। 'জাপানে কিয়োটোতে ঐতিহাসিক নাট্যের অভিনয় দেখেছি ; তাতে কথা আছে বটে, কিন্তু তার ভাবভঙ্গি চলাফেরা সমস্ত নাচের ধরনে ; বড়ো আশ্চর্য তার শক্তি'—মনে হয়েছিল তাঁর। জাপানে বা জাভায় যখন অভিনয়ের মধ্যে উঠে আসে নাচের ছন্দ, সেইটেকেই উচিত ভাবেন তিনি, কেননা 'কোনো একটা অসামান্য ঘটনাকে পরিদৃশ্যমান করতে চাইলে তার চলাফেরাকে ছন্দের সুষমা-যোগে রূপের সম্পূর্ণতা দেওয়া সংগত।'

কিন্তু চলাফেরার এই ছন্দ কি নিতান্ত অবাস্তব করে দেয় না অভিনয়কে? এই সংশয় করবেন যাঁরা, তাঁদের রবীন্দ্রনাথ মনে করিয়ে দেন যে শেক্সপীয়রের নাটকে 'লড়তে লড়তেও ছন্দ, মরতে মরতেও তাই,' বাস্তবতার দাবির তাই মানে নেই কোনো। জাভার অভিনয়ে যে 'য়ুরোপীয় শিল্পীর এঞ্জেলদের মতো

এরা ঘটোৎকচের পিঠে নকল পাখা বসিয়ে দেয়নি, চাদরখানা নিয়ে নাচের ভঙ্গিতে ওড়ার ভাব দেখিয়েছে,' তাতে খুশি ছিলেন কবি, শকুন্তলা নাটকের নির্দেশবাক্যও তখন মনে পড়ছিল তাঁর : রথবেগং নটয়তি। 'বোঝা যাচ্ছে, রথবেগটা নাচের দ্বারাই প্রকাশ হতো, রথের দ্বারা নয়।'

এবার আমরা বুঝতে পারি কেন রবীন্দ্রনাথকে তাঁর নাটক নিয়ে পৌঁছতে হবে একেবারে নৃত্যনাট্য পর্যন্ত। সংলাপ যেখানে অন্তর্লীন সুরে ভরা, তার অভিনয়ও চায় তেমনি কোনো সুর। আর, কথার সুর যেমন তাকে নিয়ে যায় গানে, শরীরের সুর তেমনি তাকে ভরে তোলে নাচে। কায়িক অভিনয় আর বাচনিক অভিনয় একটা সংগতি পায় তখন নাচ আর গানের অদ্বৈতে, জেগে ওঠে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের সম্ভাবনা। অভিনয়ের নানা অভিজ্ঞতার পর একদিন এই নৃত্যাভিনয়ে পৌঁছবেন যিনি শেষ পর্যন্ত, কী ছিল তাঁর মধ্যবর্তী দীর্ঘ সময়ের অভিনয়রীতি ?

২

অলীকবাবুর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের অভিনয় দেখে মুগ্ধ প্রিয়নাথ সেন লিখেছিলেন একদিন, 'কবিবর শুধু আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের শিরোমণি নহেন, নটচূড়ামণিও বটে।' সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'যাত্রী' বইতে লিখেছেন 'ডাকঘর' দেখার স্মৃতি : 'ইওরোপে থাকাকালীনও প্রসিদ্ধ অভিনয় আমি দেখেছি ও মুগ্ধ হয়েছি। সেসব অসাধারণ অভিনয়ের কথা স্মরণ রেখেও আমি বলছি যে ডাকঘরের যে অভিনয় আমি দেখেছি তার মতো আশ্চর্য অভিনয়, সর্বাঙ্গসুন্দর, নিখুঁত অভিনয় আমি মাত্র আর একবার দেখেছি জীবনে, আর সেটা হচ্ছে মস্কোর ভাগ্‌তান্‌গভ্‌ থিয়েটারে, প্রিন্সেস তুরেনদভের অভিনয়।' জয়সিংহের ভূমিকায় বাষট্টি বছরের রবীন্দ্রনাথকে দেখে অমৃতলাল বসুর মতো প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ অভিনেতারাও জানছিলেন তাঁর অভিনয় কোন্ শ্রেষ্ঠতায় পৌঁছয়। রঘুপতি সেজেছিলেন একবার, আর সেইটেই নাকি তাঁর শ্রেষ্ঠ ভূমিকা, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সূত্রে পাওয়া এই খবর জানিয়ে টমসন লিখেছেন : 'How moving he could be as an actor only this generation can realise. I can only assure those who will follow us, *Vidi docentem : Credite posteri.*' উত্তরকালকে এই ভাবে কেবল শোনা-কথায় নির্ভর করতে হবে, এর চেয়ে প্রত্যক্ষ কোনো ধারণা হবে না তার।

হবে না, কেননা আমাদের অভিনয়ের সমালোচনা কখনোই এমন নয়, যার মধ্য দিয়ে খ্যাত-অভিনেতাদের রীতিপদ্ধতি বিষয়ে স্পষ্টভাবে কোনো-একটা আদল আমাদের মনে পৌঁছতে পারে। রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে অগণিত স্মৃতিকথায় যেসব উচ্ছ্বাস আমরা শুনতে পাই তাঁর অভিনয় নিয়ে, তারও মধ্যে নেই তেমন যোগ্য কোনো দিকনির্দেশ। বরং সেই বিবরণ পড়ে কখনো কখনো একটা সন্দেহ জেগে ওঠাও অসম্ভব নয়। সন্দেহ এই যে, যাঁরা দেখতেন তাঁরা সব সময়ে ভূমিকাটিকেই দেখতেন তো? এমন নয় তো যে রবীন্দ্রনাথকেই দেখছেন তাঁরা? অসিতকুমার হালদারকে অভিনয়ে টানতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বুঝিয়েছিলেন তাঁকে: 'Self-conscious হলে অভিনয় হয় না—কোনো আর্টই হয় না। নিজেকে ভুলে যেতে হবে অভিনয়ের সময়।' কিন্তু তবু, অন্তত সৌম্যেন্দ্রনাথ তো নির্দ্বিধায় জানান যে, 'যে অংশই গ্রহণ করুন না কেন, রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ থেকে যেতেন, রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত সচেতন সত্তা বিলীন হতে পারত না যে-চরিত্র অভিনয় করতেন তার মধ্যে', আর এই অর্থে অবনীন্দ্রনাথকে বরং তাঁর মনে হতো আরো বড়ো শিল্পী। অসিতকুমার বলেছিলেন বটে 'রবিদার নিজের অভিনয় ক্ষমতা অপূর্ব ছিল', কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও জানিয়েছিলেন যে 'তাঁর ব্যক্তিত্বের মহত্ব, দেহের অপূর্ব সৌন্দর্য, আর তার সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে আশ্চর্য অভিনয় করার রীতি দেখে সকলেরই প্রীতির উদ্রেক হতো, সবাই মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁর দিকে স্টেজে চেয়ে থাকতেন।' প্রমথনাথ বিশীরও সেই একই অভিজ্ঞতা, তাঁকেও বলতে শুনি, 'সমস্ত ভূমিকাই তাঁহার ব্যক্তিত্বের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পাইত।' এই-যে ব্যক্তিত্বের অনুরঞ্জন, তা ঠিক কোন্ ব্যক্তিত্ব সে-কথা সব সময়ে স্পষ্ট লাগে না আমাদের। যে-অর্থে বলি, যে-কোনো ভালো অভিনয়ের মধ্যে অভিনেতার একটা ব্যক্তিত্ব দরকার, যে-ব্যক্তিত্বের জোরে আর্ভিঙ পেরিয়ে যেতে পারতেন তাঁর অন্যসব বাধা, এ কি সেই ব্যক্তিত্ব? মনে হয় না তা। সুধীরচন্দ্র কর লিখেছেন যে 'শারদোৎসব'-এর কোনো অভিনয়ে 'নিজের ভূমিকা আগু পিছু গুলিয়ে ফেলেছিলেন' তিনি, কিন্তু 'দর্শকেরা কবিকে দেখে মুগ্ধ, তাঁর কথার গোলমাল ধরবার মতো ফুরসৎ তাদের মেলেনি।' সীতাদেবীর স্মৃতিতে জেনেছি আমরা: 'যে ভূমিকায়ই অবতীর্ণ হোন, তিনি যে রবীন্দ্রনাথ ইহা কিছুতেই ভুলিতে পারিতাম না। আত্মগোপন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল, যদিও তিনি অতি উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন।' অর্থাৎ, এ ব্যক্তিত্ব কবিরই ব্যক্তিত্ব, অভিনেতার নয়।

হতে পারে যে এর অনেকটাই অতি-অনুরাগের ফল, দর্শকদের দিক থেকে অনেকসময়ে হয়তো রবীন্দ্রনাথকে দেখবার আগ্রহই ছিল প্রবল। আদর্শের বিচারে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ভুলতেই চাইতেন নিজেকে, চরিত্রের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতেই চাইতেন তিনি। অনেকসময়ে তাঁর কবিমূর্তি যে ভুলতে পারতেন না দর্শকেরা, শারীরিক প্রভা ছাড়াও তার অন্য একটা কারণ হয়তো এই যে প্রায়ই অভিনীত ভূমিকাগুলির সঙ্গে একটা সমীকরণও থাকত তাঁর নিজের চরিত্রের। ঠাকুর্দার ভূমিকায় তো বটেই, এমন-কী জয়সিংহেরও গভীরতম আবেগমুহূর্তগুলি রবীন্দ্রনাথের কবিতার জগৎকেই আনে টেনে, যে-অভিনয় দেখে বলতে পারেন সাহানাদেবী : 'এখানে কবি রবীন্দ্রনাথ আর অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ এক হয়ে গেলেন।' এক হয়ে যাবার এই আবেগে কখনো কখনো যে একেবারে আত্মহারাও হয়ে যান তিনি, তারও ইঙ্গিত আমরা পাই কোনো-কোনো অভিনয়ের অন্তরঙ্গ বিবরণে। তাঁর নিজের অথবা তাঁর পরিচালনায় অন্যদের অভিনয়ে এমন আত্মহারা চলন বিপদেরও সূচনা করত কখনো-বা, কখনো-বা রঘুপতির উদ্যত খাঁড়ার সামনে থেকে ধ্রুবকে দ্রুত সরিয়ে না নিলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকত, কখনো উত্তেজনার চূড়ায় দুর্ভার কালীমূর্তিকে দু-হাতে তুলে ধরবার পর ছুঁড়তে গিয়ে দেখা দিত সংকট। জয়সিংহের মৃতদেহের ওপর ঝাঁপিয়ে-পড়া রঘুপতির ভূমিকায় দিনেন্দ্রনাথকে নিয়ে একাধিক কৌতুক আছে তাঁর, একবার যেমন বলেছিলেন, 'দিনু, তুই ভুলে যাস যে আমি বেঁচে থাকি।' জয়-সিংহ করছিলেন একবার প্রমথনাথ বিশী, আর তাঁকেও কবি বলেছিলেন : 'তুই যখন বুকে ছোরা মেরে পড়লি আর তারপর দিনু যখন তোর ঘাড়ে পড়ল, আমি ভাবলাম তোর মরতে কিছু বাকি থাকলে ওতেই তা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।' মনে রাখতে হবে যে এসব রবীন্দ্রনাথেরই অভিনয় ধারা। কিংবা ধরা যাক 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয়ে দিনেন্দ্রনাথ আর গগনেন্দ্রনাথের কথা। ইন্দিরাদেবী লিখছেন : 'করুণ গানটি গাইতে গাইতে দিনু গগনদাদার কাঁধে হাত দিয়ে নিজেরই ভাবে এমন অভিভূত হয়ে পড়ল যে, সেও যেমন কাঁদে গগনদাদাও তেমনি কাঁদেন।' গগনেন্দ্রনাথ ভালো অভিনয় করেন বলে বাল্মীকির এক নূতন সঙ্গী বানিয়ে তাঁকে এই ভূমিকায় এনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁরই এই পরিচালনা।

ইন্দিরাদেবী সবিনয়ে জানিয়েছেন যে 'Either on or off the stage' তিনি নিজে কখনোই ভালো অভিনয় করতে পারেন না, কিন্তু অভিনয় যে তিনি বোঝেন তার পরিচয় আছে এই মন্তব্যে যে 'অভিনয় করতে করতে ভূমিকার

সঙ্গে অভিনেতা যদি একেবারে অভিন্নহৃদয় হয়ে পড়েন তবে তো অভিনয় করা মুশকিল হয়।' অন্তত, যে-আর্ভিঙের অসংযত আতিশয্য দেখে ক্ষুব্ধ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যাঁর বিশ্বাস ছিল চরিত্রের সঙ্গে একেবারে একাত্ম হওয়াই চাই অভিনেতার, ভরে ওঠা চাই স্বতঃস্ফূর্ততায়, —তাঁকেও মানতে হয়েছিল যে আবেগতাড়িত হবার মুহূর্তেও উদ্দেশ্যটাকে ভুললে চলে না, ভুললে চলে না চারপাশের পরিবেশ, হাসবার বা কাঁদবার মুহূর্তে অভিনেতাকেও লক্ষ করতে হয় তাঁর নিজের সেই হাসিকান্না। আর অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথের কাছে 'শোধবোধ'-এর অভিনয় শিখতে গিয়ে অহীন্দ্র চৌধুরী লক্ষ করেছিলেন তাঁর অভিনয়ে এমন গভীর মনোনিবেশ 'যে-গভীরতা চারিপাশের পরিবেশকে একেবারে ভুলিয়ে দেয়।'

৩

মোহময় এই ব্যক্তিত্বের প্রভাবের বাইরে এমন কিছু কি আছে, যাকে বলা যায় বাংলা অভিনয়ের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কোনো সংযোজন? শিশির-কুমার ভাদুড়ীর সময় থেকে বাংলা মঞ্চের যে যুগের কথা ভাবি আমরা, তার ভূমিকায় দেখলে কি রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের বিশেষ কোনো তাৎপর্য থাকবে? সেই অভিনয় ধারার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন যে প্রমথনাথ বিশী, তিনি অন্তত বলেছিলেন যে আধুনিক রঙ্গমঞ্চের দু-একটা নূতনত্বে কোনো যুগান্তর বা বিপ্লব দেখতে পাননি তাঁরা, তাঁদের কাছে সেসবই মনে হয়েছিল 'শান্তিনিকেতনের রীতির ক্ষীণ অনুকরণ।' এমনি এক নূতন রীতি নিয়ে এত হৈ চৈ দেখে কলকাতার ক্ষুদ্রতায় এঁরা সেদিন বিস্মিতই ছিলেন। কাকে তবে তাঁরা ভাবছিলেন শান্তিনিকেতনের রীতি?

পুরোনো দিনের ফিল্মে কেমন ছিল কথা বলবার ধরন, সেটা বোঝাতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় একবার মনে করিয়ে দিয়েছিলেন 'চণ্ডীদাস'-এর উমাশশীর সংলাপ 'চণ্ডী ঠাকুর, এ কি সত্যি?' কথাটি বলবার জন্য 'ঠাকু-র' শব্দে টানা চড়া স্বর, 'স-ত্যি-'র ঢেউ খেলানো, এসব মনে পড়লে চলচ্চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে সেদিনকার মঞ্চাভিনয়েরও একটা ছাঁচ যেন পাওয়া যায়। কোনো একটা বাঁধা স্বর, প্রায়ই বিকৃত আর কৃত্রিম, সে-ই ছিল অভিনয়কে প্রাণবান করে তুলবার একটা গ্রাহ্য ধরন। বিষয়ের মধ্যে নিহিত হবার তুলনায় দর্শকদের উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলবার আয়োজন ছিল বেশি, আর সেই চেষ্টাতেই মিলিত হতো জোরালো ভঙ্গি আর

ছাঁচে ফেলা সুরের কোনো প্রকট সমন্বয়। এরই ফলে নাটকের মধ্যে বড়ো হয়ে উঠত বিচ্ছিন্ন কোনো আকর্ষণ, কখনো কোনো গান কখনো কোনো সংলাপের টান। ধরা যাক 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' বইটির এই বর্ণনা : 'তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত "আজু কাঁহা মেরি" গান এখনো কর্ণে মধুবর্ষণ করিতেছে। শোনা যায়, বহু দর্শক না কি মাত্র এই গানখানি শুনিবার জন্যই রঙ্গালয়ে আসিতেন। ফুল হাউস বিক্রি, কিন্তু চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে দলনীর এই গানের পর পঞ্চমাঙ্কের পটোত্তোলনের সময় দেখা গেল যে রঙ্গগৃহে মুষ্টিমেয় দর্শক বিদ্যমান।' কিংবা এরই প্রবণতায় সে-বইতে দেখা যায় যে 'বাজীরাও-এর ভূমিকা অমরেন্দ্রনাথ জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন' কিংবা 'সিরাজের অংশ যে দানিবাবু জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই।' জ্বালিয়ে দেবার এইসব প্রবণতায় গলার স্বরকে কেবলই উঁচু-নিচুতে খেলিয়ে নেবার বাহাদুরি অল্পদিন আগে পর্যন্তও অধিকার করে ছিল বাংলা মঞ্চকে।

রবীন্দ্রনাথের একটা কাজ ছিল এই আতিশয্য আর তার অনুষঙ্গী টানা সুর থেকে অভিনয়কে সরিয়ে আনা। 'ডাকঘর'-এর প্রযোজনায় যে আশামুকুলের অভিনয় কিংবদন্তি হয়ে আছে আমাদের কাছে, তাকেও যে কীভাবে তৈরি করে তুলতে হয়েছিল তার একটা বিবরণ বলেন অসিতকুমার হালদার। যখন নিয়ে আসা হলো সেই ছেলেটিকে, 'পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন, আশামুকুল অভিনয় করছেন বটে কিন্তু ঠিক লাগসই হচ্ছে না। অভিনয়ভঙ্গির বাড়াবাড়ি করে একটা বিশেষ সুর দিয়ে টেনে টেনে শ্রীমান আশামুকুল যখন অমলের পার্ট বলতে আরম্ভ করলেন···কৃত্রিম আবৃত্তি শুনে কবি হতাশ হয়ে পড়লেন।' অনেক শিখিয়ে নিয়ে তবেই রবীন্দ্রনাথের পছন্দে আনা গিয়েছিল তাকে। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র কথা বলতে গিয়ে নির্দ্বিধায় জানিয়েছেন অসিতকুমার : 'রবিদাই প্রথম সনাতন থিয়েটারি বিশেষ ভঙ্গিতে টেনে টেনে কথা বলে অভিনয় করার রীতি ভেঙেছিলেন। গতানুগতিক থিয়েটারি ন্যাকামি তাঁর মোটেই পছন্দ ছিল না।' আর ঠিক এই কারণেই প্রমথনাথ বিশীরা কলকাতায় শিশিরকুমারদের মঞ্চে অভূতপূর্ব পাননি কিছুই, শান্তিনিকেতন জোড়াসাঁকোয় অভ্যস্ত অভিনয়-রীতিরই একটা অনুবর্তন হিসেবে দেখেছিলেন তাকে।

এক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের এইসব নাট্যচর্চা ছিল সে-আমলের লিট্‌ল্ থিয়েটার, ব্যাবসায়িক মঞ্চাভিনয়ের পাশাপাশি এক প্রচ্ছন্ন কিন্তু সংগঠিত আর ধারাবাহিক প্রতিবাদ। কিন্তু সে-কথা মেনে নেবার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্নও

উঠবে মনে। পূর্বতনদের বিষয়ে এখানে কি একটু অবিচারই করছি না আমরা ? থিয়েটারি সুরের ন্যাকমির বিরুদ্ধে কেউই কি আর বলেননি সে-যুগে, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ? ভিন্ন জনের অভিনয়ে যোগেশ-চরিত্র কেমন ভিন্ন হয়ে যেত, সেই প্রসঙ্গে লিখেছেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : 'গিরিশচন্দ্র যে অভিনয় করিলেন তাহাতে কোনো সুরের সংস্পর্শ তো ছিল না, কিন্তু তথাপি তাহা অমৃতলালের অপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ও মর্মভেদী হইয়াছিল।' কেবল এই নাটকেই নয়, অন্য সময়েও গিরিশচন্দ্রের রীতি ছিল সুরবর্জন, রীতি ছিল স্বাভাবিকতা। আবার, কেবল গিরিশচন্দ্রই নন, অর্ধেন্দুশেখরও তাঁর সহ-অভিনেতাদের শেখাতেন কীভাবে স্বরসংযম করতে হয়, কীভাবে 'বিকৃত ও অস্বাভাবিক অভিনয়ের উপর খড়্গহস্ত' হতে হয়। তাঁরা যেন 'অভিনয় করিতেছি—এমনই একটা বিকট ভঙ্গির সহিত অভিনয় করিয়া রসের বিপর্যয় না করেন', এইটেই ছিল অর্ধেন্দুশেখরের শিক্ষা। তাহলে এ-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কি স্বতন্ত্র কিছু ?

একদিকে আতিশয্য, অন্যদিকে স্বাভাবিকতা। আতিশয্য যেমন উৎকট আর যাত্রাস্পর্শী, স্বাভাবিকতারও তেমনি একটা বিপদ প্রাণশূন্যতার। অপরেশচন্দ্র লিখছেন : 'অভিনয়কে স্বাভাবিক করিতে গিয়া অনেকে এমন স্বাভাবিক করিয়া ফেলিতেন যে, অনেকসময়ে তাঁহাদের অভিনয় ডাল-ভাত খাওয়ার মতো অত্যন্ত ভ্যাদভেদে হইয়া পড়িত। শুধু আবৃত্তি আর উচ্চারণের প্রতি লক্ষ রাখিয়া অভিনয়কে এইরূপ স্বাভাবিক করিতে গেলে অভিনয় প্রাণশূন্য হইয়া পড়ে।' রবীন্দ্রনাথের মতো, গিরিশচন্দ্রও বলতেন যে 'অভিনয় জিনিসটাই ঠিক স্বাভাবিক নহে। ইহা—as if natural।' কিন্তু এই 'as if natural'কে রূপ দিতে গিয়ে, স্বাভাবিকতা থেকে উত্তীর্ণ করে নিতে গিয়ে, রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ে তৈরি হতো ভিন্ন ধরনের একটা সুরই, ভাষাবিপর্যয় এড়াবার জন্য তাকে বলা যাক ছন্দ। পুরোনো ধরন আর নূতন ধরনের, আতিশয্য আর স্বাভাবিকতার, একটা মধ্যপথ তৈরি হতো এই ছন্দসুষমায়।

রবীন্দ্রনাথের অনেক পরে অভিনয় করেও অহীন্দ্র চৌধুরীরা বুঝতেন, 'আমরা যদি এই ভূমিকায় ["শোধবোধ" নাটকের সতীশ] অভিনয় করতাম, তাহলে এতে একটা অতিরঞ্জিত নাটকীয় প্রভাব সৃষ্টি করতাম', কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কাছে পড়ে শুনিয়েছিলেন কীভাবে সেই অতিনাটকীয়তা বর্জন করা যায়, সৃষ্টি করা যায় সত্যিকারের নাটকীয় প্রভাব। কেবল এই পাঠের সময়ে নয়, রবীন্দ্রনাথের যে-কোনো অভিনয়ে অহীন্দ্র চৌধুরী দেখতেন 'সমুজ্জ্বল আঁখি ঔজ্জ্বল্যে

চমক দিতে থাকত, যেন বিদ্যুতের ঝলক লাগছে। ...এই সুদক্ষ অভিনেতার দিক থেকে জোরপূর্বক নাটকীয় প্রভাব বিস্তারের কোনো চেষ্টাই ছিল না।' তা সত্ত্বেও কীভাবে তিনি সঞ্চার করতেন জাদু?

'একটি মালা হাতে করে, হাতের কবজিটি সামান্য ঘুরিয়ে কেমন করে রাখতে হবে একটি থালায়, তা উনি কী সুন্দর করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। হাতটিকে ধরে ধরে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন, বলছিলেন, হাতটা এত শক্ত করে টেনে রাখো কেন, বেশ স্বচ্ছন্দে সহজভাবে ভালো করে বার করে মেলে দাও।' সাহানাদেবীকে এইভাবে যে শেখাচ্ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এ হলো শরীরের ছন্দের কথা। আর 'রাজা'র মহড়ায় যখন বলছিলেন 'ওরে সুধীরঞ্জন, বেশ হচ্ছে—কিন্তু আরেকটু দরদ দিয়ে বল', বলে নিজেই সেই কথাগুলি আবৃত্তি করতেন, সে হলো কণ্ঠস্বরের ছন্দ। সেই ছন্দেরই মধ্যে সূক্ষ্ম মোচড়ে কীভাবে রবীন্দ্রনাথ তৈরি করতে পারেন নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত, অনুরণনের সামান্যতম ভিন্নতায় কীভাবে দেখাতে পারেন বীর্য আর অবসাদ, উন্মাদনা বা অভিমান, তার একটা ছোটো নিদর্শন আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকে গেছে এখনো : কর্ণ-কুন্তীসংবাদ। বিভিন্ন লেখকের স্মৃতিতে যেসব কথা জানতে পাই আমরা, তারই একটা রূপায়ণ পাব ওই নাট্যকবিতার রেকর্ডে, আর বুঝতে পারব যে রবীন্দ্র-নাথের অভিনয়ধারার মূল শক্তিটা ছিল আবৃত্তিরই স্বরে আর উচ্চারণে। কবির মুখে গোটা 'রক্তকরবী'র পাঠ শুনে হেমেন্দ্রকুমার রায় বুঝতে পেরেছিলেন 'সাধারণ অভিনয়ের চেয়ে আবৃত্তি হচ্ছে দুরূহ আর্ট', কেননা মঞ্চের উপর অভি-নেতাকে সাহায্য করে তাঁর হাত-পা এবং সহ-অভিনেতারা, দৃশ্যপট আর আলোর নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু কেবলমাত্র স্বরের মধ্য দিয়েই, রবীন্দ্রনাথ যখন আবৃত্তি করতে বসলেন, 'তখন নাটকের তাবৎ বিশেষত্ব ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগল ফুলের মতো।' অভিনয়ে দেখা ওইরকমই এক স্মৃতির কথা বলেন সাহানাদেবী, বলেন জয়সিংহের ভূমিকায় 'যে স্নিগ্ধতা উনি বিস্তার করলেন, সে স্নিগ্ধতা, যেন জ্যোৎস্না-লোকের মতোই ছড়িয়ে পড়ল ভিতরবাহির ভেদ করে।' এই আবৃত্তিরই কথা বলেন হেমেন্দ্রকুমার, যখন তিনি লেখেন : 'অভিনেতা রবীন্দ্রনাথের ভাষণে সুরের প্রতি কোনো অনাসক্তিই লক্ষ করা যেত না, বরং তাঁর মৌখিক কথাগুলির মধ্যে আমরা লাভ করতুম অসাধারণ সংগীতের প্রতিধ্বনি। নাট্যজগতে তাঁর মতো সুরেলা কণ্ঠস্বর ছিল সত্যসত্যই দুর্লভ। কিন্তু তা বেসুর বা কৃত্রিম বা বাঁধা সুর নয়, শব্দার্থ অনুসারে তা কখনো হয়তো কোমল, কখনো কঠোর এবং কখনো-বা

তরল।' অতিরিক্ত স্বরের প্রাধান্যে আর মেলোড্রামাটিক অভিনয়ে অভ্যস্ত অমৃতলাল হয়তো সেইজন্যেই তাঁর অভিনয়ে নূতন শিখবার কিছু পেয়েছিলেন। যাকে বলছি শরীর আর স্বরের ছন্দ, হেমেন্দ্রকুমারের ভাষায় সেইটেই আমরা শুনি এইভাবে : 'অন্ধ বাউল রূপে অভিনয়ের ছন্দ জেগেছিল তঁরে সর্বাঙ্গে কিন্তু ঠাকুর্দা রূপে তিনি নির্ভর করেছিলেন প্রধানত নিজের ভাব ও কণ্ঠস্বরের উপর এবং একমাত্র কণ্ঠের সাহায্যেই তিনি যে তাবৎ নাটকীয় ক্রিয়া ফুটিয়ে তুলতে পারেন, সেকথাও আমি উপলব্ধি করলুম।' আর এইসব অর্থেই সংগত মনে হয় প্রমথনাথ বিশীর এই মন্তব্য যে রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ে 'যেন লিরিক রীতিরই প্রাধান্য ছিল।' 'অন্তরবাহির' প্রবন্ধের উৎস ছিল এই লিরিক রীতির দিকে কবির আকর্ষণ। 'মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য অভিনেতারা কণ্ঠস্বরে ও অঙ্গভঙ্গে জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে', তার অবসান চেয়েছিলেন তিনি এইজন্যই। 'কবিতার ছন্দের মতো' এক 'সৌন্দর্যনৃত্যের পাদবিক্ষেপ' তিনি দেখতে চেয়েছিলেন অভিনয়শিল্পে, আর বাস্তবিক অর্থেও নৃত্যের সঙ্গে অভিনয়ের একটা যোগ হয়ে গেল তাঁর শেষ বয়সে পৌঁছে, দেখা দিল নৃত্যনাট্যের উদ্ভব। নৃত্যকলা অভিনয়কলার গলা টিপে মারছে, রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের বহুল প্রসার দেখে ইন্দিরাদেবী একসময়ে এ-রকম ভয় পাচ্ছিলেন। আমাদের চারপাশে নৃত্যনাট্যের যে চলন দেখতে পাই আজ, তাতে যথার্থ বলেই মনে হবে ইন্দিরাদেবীর এই ভয়কে, কেননা এই নৃত্যনাট্যের প্রযোজকেরা আজ ভুলেই যান যে সেটা নাটক, তাঁরা একে ধরে নেন নাচ আর গানের কোনো সহজ যোগফল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজের বিকাশের দিক থেকে যদি দেখি, তাঁর শরীর আর স্বরের ছন্দসামঞ্জস্যের দিক থেকে যদি ভাবি, তাহলে বোঝা যায় যে নৃত্যনাট্যের এই নৃত্য তো কেবল নাচ নয়, সে হলো অভিনয়েরই একটা ছন্দোময় প্রকাশ, অভিনয়ে তাঁর লিরিক রীতিরই প্রত্যাশিত ফল। এরই মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ চাইছিলেন তাঁর অভিনয়ের মুক্তি, একদিকে আতিশয্য আর অন্যদিকে স্বাভাবিকতার জাল থেকে সরিয়ে নিতে পারে ভিতরকার যে মুক্তি।

১৯৮১

୭

নাটকে গান

রবীন্দ্রসমকাল পর্যন্ত বাংলা নাটকে গানের ভূমিকা আর রবীন্দ্রনাট্যে গীতিযোজনার প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র বিচারের যোগ্য। উৎস হিসেবে দুয়েরই মূলে আছে যাত্রার চিহ্ন, কিন্তু দুই অত্যন্ত পৃথক অর্থে। অন্য নাটকে গান যেন অনেকটা অগত্যাপ্রয়োগ, কিন্তু রবীন্দ্রনাটকে গানের ব্যবহার আমাদের কাছে ভিন্ন ধরনের এক পরিকল্পনার আভাস নিয়ে আসে।

একসময়ে গিরিশচন্দ্রকে মনে করা হচ্ছিল বাঙালি শেক্সপীয়র। আজ আমরা জানি যে নিছক শিল্পে তাঁর আগ্রহ ছিল কম, জনরুচির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে তাঁর আপত্তি ছিল না খুব। দেশের পুরাণপিপাসু ভক্তিবৎসল জনতার প্রমোদ হিসেবে এক ধরনের প্রাচীনতা-আশ্রয়ী সাহিত্যচর্চা তাঁর প্রশ্রয় পেয়েছিল। তাই প্রচলিত যাত্রারীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে না এসে তিনি বরং একটা আপোশ তৈরি করতেই চেয়েছিলেন। ফলে গিরিশচন্দ্রের নাটকে গান আসে অনেকটা আত্মরক্ষার প্রেরণায়।

যাত্রার সঙ্গে বিরোধী এবং প্রতিযোগী সম্পর্কের অবসানে এই প্রেরণা আর স্বাভাবিক রইল না, কেননা নাটক তখন নিজস্ব অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল বা ক্ষীরোদপ্রসাদেরা তখনো অন্ধ রীতির অনুবর্তনেই খুশি, এঁদের দেশপ্রেমিক আয়োজন আর পুরাণনিষ্ঠা হয়তো বাড়িয়ে দিচ্ছিল এই অন্ধতা। আর অভ্যাসের প্রতাপ যে কতই ব্যাপক তা আমরা ধরতে পারি যখন দেখি রবীন্দ্রনাথও তাঁর প্রাথমিক নাট্যচর্চায় গানকে ব্যবহার করেন যেন কুড়িয়ে-পাওয়া জিনিসের মতো, ইতস্তত, অনেকটাই প্রথাসিদ্ধ ধরনে।

অর্থাৎ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' 'রাজা ও রানী' বা 'বিসর্জন'-এর গানের প্রয়োগে অনেকসময়েই তাঁর স্বকীয় প্রবর্তনা প্রায় দেখি না। এসব রচনায় গানগুলি প্রায়ই নিরুদ্দেশ্য, চারিত্র-বর্জিত, হয়তো মধ্যবর্তী কোনো অংশপূরণ মাত্র। ইলার প্রেমসংগীত তো নিয়মরক্ষা বটেই, এমন-কী অপর্ণার বিভোর গীতা-

বলিকেও মনে হয় একটা সরব আয়োজন, তার বেশি কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না সেখানে।

কিন্তু 'শারদোৎসব' থেকে যখন রবীন্দ্রনাথ পৌঁছন তাঁর নিজস্ব জগতে, তখন একদিকে যেমন চোখে পড়ে সংগীতের প্রগল্‌ভ বহুলতা, অন্যদিকে তেমনি ভুলতে পারি না যে কবি এখন নিচ্ছেন এক নবীন বিন্যাস। এই বিন্যাসে যাত্রার গড়ন তাঁর চেতনার অনেকখানি জুড়ে ছিল, 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধটি লক্ষ করলে এই অনুমান অসংগত হয় না। রবীন্দ্রেতর নাটক যাত্রার সঙ্গে প্রতিরোধী সম্পর্কে যুক্ত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকে গ্রহণ করেন অনুকূল আদর্শ হিসেবে। 'যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান' নেই, এ-কথা তিনি তৃপ্তির সঙ্গে উচ্চারণ করেন ১৩০৯ সালে, এবং তারই ফলে 'ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে' তার কথা মনে রেখেই তিনি উৎসাহী হন পরবর্তী নাট্য-রচনায়। মঞ্চ ও দৃশ্যের পরিকল্পনায় যাত্রার সমীপবর্তী হবার সঙ্গে সঙ্গে ওই একই অভিপ্রায় তাঁর নাটকে বয়ে আনে গান।

আবার, 'শারদোৎসব' থেকে 'রাজা' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে আমাদের মনে পড়ে উপাসকের পোশাকে, তার রেশ পৌঁছয় 'ফাল্গুনী' পর্যন্ত। যখন শরৎ বা বসন্তের মতো ঋতুও হয়ে ওঠে এসব রচনার লক্ষ্যভূমি, তখনও রূপবিভোর প্রকৃতিবন্দনা পেতে চায় রসনিবিড় অবগাহন। এই গহনগমনে প্রকৃতি আর মানুষ সবই শেষ পর্যন্ত মিলে যায় কোনো এক সূক্ষ্ম চেতনায়। তা ঠিক ধর্মচেতনা নয়, কিন্তু এমন একটি আত্মিকতার চেতনা যার সাধনামাত্রেই উপাসনা বা পূজার রূপ পেয়ে যায়। সেইজন্যেই এ হয়তো স্বাভাবিক যে 'প্রায়শ্চিত্ত' 'রাজা' বা 'অচলায়তন'-এ তো বটেই, 'শারদোৎসব'-'ফাল্গুনী'রও গান অনেকটাই ধরা থাকে 'গীতবিতান'-এর 'পূজা' অংশে। 'প্রেম' তো নয়ই, 'প্রকৃতি'ও এর কেন্দ্র নয়। অন্তঃস্যূত এই আত্মিকতার প্রেরণা প্রবল ছিল বলেই 'শারদোৎসব' যখন 'ঋণশোধ' হয়, তখন অব্যক্তকে ব্যক্ততর করবার উদ্দেশ্যে আসে একটি আলংকারিক নতুন চরিত্র, যার নাম শেখর, এবং 'আজি শরত তপনে' 'অমল ধবল পালে লেগেছে' আর 'আমার নয়ন-ভুলানো এলে' গান তিনটি ছাড়া যাঁর জন্য বাকি ছটি গানই নির্দিষ্ট হয় 'পূজা'র গান বা 'পূজা'-স্পর্শী গান।

প্রকৃতি বা মানব-চেতনা যখন ঐশ্বরিক অনুভবের ঘনিষ্ঠ সংযোগ পায়, সুরের আগুন তখন স্বভাবত জ্বলে। শেক্সপীয়রেরও নাটকে একটা পর্যায় লক্ষ করেন

সমালোচকেরা, যখন একই সংযোগের ভাবনা তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে এক নান্দনিক জগতে, ফলে ঠিক সেই পর্যায়ে গানের আকর্ষণ তাঁরও কাছে হলো অমোঘ। তাঁর কোনো কোনো নাটকের সাংগীতিক পরিবেশ হয়তো এই সূত্রে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, যেমন রবীন্দ্রনাথেরও অনুরূপ সময়ে 'গীতসুধার তরে' পিপাসিত চিত্তের একটা তাৎপর্য মেলে। বিশেষত আমাদের মনে পড়ে যে এই পর্বেরই সূচনা-কালে আত্মহারা কবি কবিতার জগৎ থেকে নির্বাসন নিয়েছিলেন সম্পূর্ণ গানের জগতে।

এই জগৎ থেকে যে-নাট্যবিন্যাস রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ, সেখানে নাটক-বিচারের চল্‌তি ধারণা আমাদের ছেড়েই দিতে হয়। এই নতুন নাটকে বাস্তবিকতার তীক্ষ্ণ সংঘাত আমরা আশাই করি না, বরং মায়া রচনা করবার মতো একটা ভাসমান স্বচ্ছতাই এখানে প্রয়োজন, যার অন্য নাম লিরিক পরিবেশ। আর তখন আমাদের মনে হতে থাকে যে রবীন্দ্রনাথের গীতিস্বভাব এবং তাঁর গৃহীত শিল্পরূপের অন্তর্লীন গীতিস্বভাব একটা সুন্দর সামঞ্জস্য পেয়ে যায় তাঁর নাটকে। গান লেখেনও তিনি স্বতঃস্ফূর্ত প্রাচুর্যে, যদিও এই স্বতঃস্ফূর্তিতে হয়তো আধুনিক মন পুরোই সায় দেয় না। একটা উপরন্তু শাসন যদি নিশ্চিত-রূপে গ্রহণ করতেন রবীন্দ্রনাথ, তবে তাঁর অনেক কবিতা যেমন সংক্ষিপ্ত অথবা অলিখিতই থাকত, তেমনি তাঁর নাটকগুলিও হয়তো ঈষৎ সংযম পেত গানের ব্যবহারে। কিন্তু পরিবর্তে, যাঁর জীবনের সূচনায় গীতিনাট্য এবং অন্তিমে নৃত্য-নাট্য, তাঁর মধ্যবর্তী নাট্যাবলিরও যে গীতিসংকুল হওয়াই অনিবার্য—এতদিন আমরা এইরকম ধরে নিতে অভ্যস্ত ছিলাম।

২

'শারদোৎসব' থেকে যে-নাটকগুলি লেখা হচ্ছিল তার একটা প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল শান্তিনিকেতনের প্রমোদভাবনা। এখানকার ছাত্র-শিক্ষকেরা সংগীতে দীক্ষিত হবার পর গানকে অন্তত নেপথ্যভূমিতে সরিয়ে দিতে হয় না, যেমন নেপথ্য-গানের আয়োজন—ধরা যাক—মধুসূদনের নাটকে। মঞ্চে গায়ক পেয়ে যাবার এই সুলভ সুযোগই রবীন্দ্রনাটকে কখনো কখনো গানের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়।

তাই 'শারদোৎসব' থেকে 'ফাল্গুনী' পর্যন্ত গানের যেন স্রোত চলছে। আবার এর সঙ্গে আরও কিছু গান যুক্ত হয় নাটকগুলির পুনর্গঠনে। 'শারদোৎসব'-এর

দশটি গান 'ঋণশোধে' চোদ্দটি এবং অভিনয়কালে সতেরোটিতে পৌঁছয়। এসব নাটকের পুনর্লেখনের কারণ কবি সবসময়েই বলেন অভিনয়ের সৌকর্য-বিধান। অতএব বুঝতে হবে, নাটকে যেমন আছে তার চেয়েও বেশি গানের প্রয়োজন অভ্যন্তরীণ কোনো দাবিতে নয়, অভিনয়ের দাবিতে। আর অভিনয়ের এই দাবি এমনই যে ইচ্ছেমতো বহুল এবং অপ্রতুল হতে পারে গানের যোজনা। ইংরেজি প্রথম অনুবাদে 'রাজা'র ছাব্বিশটি গান 'কীং অব্ দি ডার্ক চেম্বারে' হয়ে দাঁড়ায় সাত, পরে প্রকাশিত বইতে বারো। এ-তথ্য থেকে কি বলা যায় না যে নাটকের বিষয়ের সঙ্গে গানগুলির যোগ নিতান্তই অচ্ছেদ্য ছিল না? তার যোজনা কেবলই বাইরের কারণে? অর্থাৎ গান এখন তাঁর এমন একটা উপ-করণ যাকে হেলাফেলায় চতুর্ধারে ছড়িয়ে দেবার সংগতিও আছে তাঁর স্বভাবে, আবার নিতান্ত নিপুণভাবে তাকে প্রয়োগ করবার আয়োজনেও তাঁর পরিবেশ ভরন্ত, সঙ্গে আছেন তাঁর 'সকল সুরের ভাণ্ডারী' দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গায়ক গায়িকার সুলভতা বা দুর্লভতা তাহলে একটা ভাববার মতো ব্যাপার। 'গৃহপ্রবেশ'-এর নটি গান স্টারের অভিনয়ে দাঁড়াল তেরোটিতে, যুক্ত করতে হলো একটি নতুন বোষ্টমী-চরিত্র, এবং হিমির গানও যে বাড়ল তার কারণ তো এই যে নীহারবালা ভালো গাইতে পারেন। অথবা সাহানাদেবী যেমন বলেন তাঁর 'বিসর্জন' অভিনয়ের স্মৃতিতে: 'আমার কণ্ঠে এ-গানটি শুনেই তখুনি স্থির করে ফেললেন গানটি আমাকে দিয়ে বিসর্জনে গাওয়াতেই হবে।' এই গান হলো 'দিন ফুরালো হে সংসারী'। সাহানাদেবীর সেই স্মৃতিকথা থেকে আরো খানিকটা অংশ শোনা যাক:

> গোটা দশেক গান দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাকেও এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। এই দশটি গানের মধ্যে বিসর্জনের জন্য আগেকার রচিত গান ছিল মাত্র তিনটি। এই তিনটি হচ্ছে: ওগো পুরবাসী, আমি একলা চলেছি এ ভবে, থাকতে আর তো পারলি নে মা—পারলি কৈ। এই তিনটি গান ছাড়াও কবির পুরোনো গান থেকে কবি বেছে দেন—তিমির দুয়ার খোলো আর দিন ফুরালো হে সংসারী, এই গান দুটি। নতুন রচনা করে দেন আরো পাঁচটি গান: ও আমার আঁধার ভালো, কোন্ ভীরুকে ভয় দেখাবি, আঁধার রাতে একলা পাগল, আমার যাবার বেলা পিছু ডাকে আর জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি হে নমি নমি।
>
> বিসর্জনের রিহার্সাল হচ্ছে শুনে প্রথম আমি দেখতে যাই।

সেখানে আমাকে দেখেই কবির ইচ্ছা হলো আমাকে দিয়ে বিসর্জনের গান গাওয়াবেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে রচনা হয়ে গেল সব নতুন গান।

এরই সঙ্গে আছে আবার জনপ্রমোদের ভাবনা। পেশাদার রঙ্গালয়ের প্রত্যক্ষ সংশ্রব তাঁর আয়ত্তে ছিল না বলে কখনো-বা আমরা ভাবি যে অন্তত এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নিরঙ্কুশ, শিল্পী হিসেবে কিছুই তিনি ছাড়তে রাজী ছিলেন না বলেই জনতা নিতে পারল না তাঁর নাটক। কিন্তু বস্তুত দর্শকের মনোরঞ্জনও ছিল তাঁর ভাবনার অন্তর্গত। 'ফাল্গুনী' অভিনয়ের সময়ে গগনেন্দ্র-নাথকে লেখা তাঁর একটি চিঠি এর সামান্য উদাহরণ: 'চেষ্টা করছি আমাদের শিশু-গাইয়ের দল বাড়িয়ে তুলতে। ···চোখ এবং কান দুইয়েরই একেবারে পেট ভরিয়ে তুলতে হবে। ···বুঝিয়ে দেওয়ার চেয়ে মজিয়ে দেওয়াটাই দরকার।'

সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য মনে পড়বে যে এই 'বুঝিয়ে দেওয়া' আর 'মজিয়ে দেওয়া'র প্রসঙ্গ আছে 'ফাল্গুনী'র বিষয়ের মধ্যেই এবং 'ফাল্গুনী' এসে মিশেছে প্রায় গীতিনাট্যের মোহনায়। তাহলেও, তাঁর অন্য নাটকেও, এই মজিয়ে দেবার সচেতন আকাঙ্ক্ষা থেকেই চলে আসে গানের পর গান; ভরে ওঠে আমাদের 'চোখ এবং কান'।

৩

যেমন একদিকে এই জনপ্রমোদের চিন্তা, অন্যদিকে তেমনি আছে অভিনয়গত প্রয়োগের সমস্যা, অভিনেতার সম্ভাব্য বিঘ্নাবলির ভাবনা।

সংস্কৃত আলংকারিকেরা যে নানা-শিল্প-সমন্বিত প্রয়োগকুশল সূত্রধারের কথা কল্পনা করেছিলেন তার শ্রেষ্ঠ ভারতীয় নিদর্শন হয়তো রবীন্দ্রনাথ। ব্যাবসায়িক মঞ্চের বহির্ভূমিতে থেকেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর প্রযোজক। তাই একদিকে তিনি দর্শকদের বিষয়ে ভাবছেন, আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনে মন দিচ্ছেন নাটকচর্চায়, আবার অন্যদিকে একজন দক্ষ পরিচালকের মতো অভিনয়-সৌকর্যের ভাবনাতেও তিনি নিবিষ্ট। এক-একটি নাটককে যে তিনি পুন-র্বিন্যস্ত করবার চেষ্টায় প্রায় নতুন চেহারা দিয়ে দেন তার মূল কারণটা আভিনয়িক; তাঁর মনোযোগ ছিল যতদূর সম্ভব এদের অভিনয়যোগ্য করে তুলবার চেষ্টাতেই।

এই প্রত্যক্ষ প্রয়োগচিন্তায় তাহলে অভিনেতাদের বিষয়ে না ভেবে তিনি কেমন করে পারেন?

নাটকের গান অভিনেতার পক্ষে মর্মান্তিক পরীক্ষা। কোনো ভূমিকার দীর্ঘ সংলাপই যখন প্রতিবেশী চরিত্রগুলিকে বিপন্ন করবার পক্ষে যথেষ্ট, তখন গান—যা একই সঙ্গে কালবিস্তারী এবং ভাবৈকময়—রঙ্গমঞ্চে দাঁড়ানো অন্য অভিনেতার কাছে কী ব্যবহার প্রত্যাশা করবে? মুখের প্রতিক্রিয়ায় কোনো দ্রুত ভাবান্তর এখন সম্ভব নয় এবং কায়িক চলনও এখন অনেক পরিমাণে রুদ্ধ। ফলে সমস্ত পরিপার্শ্ব প্রায় মুছে গিয়ে দর্শকের মন এখন গায়কের কাছে স্থির হয়ে যায়, অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে দর্শক এখন সম্পূর্ণই শ্রোতা হয়ে ওঠেন।

যেমন সহ-অভিনেতার সমস্যা, তেমনি সমস্যা স্বয়ং গায়কেরও। অর্থাৎ গানের সময়ে গায়কের কায়িক অভিনয় হবে কেমন? বা, আদৌ কিছু হবে কি?

'বিসর্জন' পর্যন্ত গানের প্রয়োগে এ-রকম কোনো প্রয়োগভাবনা রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করছে বলে বোঝা যায় না। এখনও পর্যন্ত তিনি চল্‌তি প্রথাতেই গানের কথা ভাবেন বলে অপর্ণা বা ইলার গান কোনো সমস্যা মেটায় না। এখনও পর্যন্ত বাংলা নাটকে গান প্রায় বৈঠকী, অর্থাৎ গান করা অথবা শোনা বেশ একটি আয়োজনসাপেক্ষ ব্যাপার। এ-রকম গান, বিশেষত প্রেমের গান, আবার পরে দেখতে পাব 'চিরকুমার সভা' বা 'গৃহপ্রবেশ'-এ। কিন্তু এর প্রথমটি একে তো প্রহসন, ফলে সেখানে গায়ক যদি ভঙ্গি সহযোগে প্রায় অতিনাটকীয় হন তবুও তা আপত্তির উদ্রেক করে না; তদুপরি দেখতে পাচ্ছি অক্ষয় তার চতুর্দিকে একটি উপভোগ্য চপলতার আবরণ তৈরি করতে উৎসুক। ফলে অক্ষয় বা নীরবালা কিংবা 'শেষরক্ষা'র চন্দ্রকান্ত যখন গান করে তখন তা ঠিক আবেগময় না হয়ে আভিনয়িক হয়ে ওঠে, ওদের ক্ষিপ্র সহাস্য মুখভঙ্গি যেন নাটকটি পড়তে গিয়েও স্পষ্ট দেখতে পাই।

ওই সঙ্গে আবার দেখি যে অক্ষয় দু-তিন চরণ স্থর ধরে তার সংলাপের অনুসরণে। গানগুলি ভগ্ন, টুকরো, ছড়ানো। মানসিকতার দিক থেকে খুব বিপরীত অথচ ব্যবহারে তুল্য এম্‌নি এক দৃষ্টান্ত মনে পড়ে 'মুক্তধারা'য় ধনঞ্জয়ের দ্রুত-তালে-কাটা শেষ গান। কেবল ওই একটি গানই নয়, ধনঞ্জয় তার অধিকাংশ গানই গায় ভেঙে ভেঙে, সংলাপের ব্যাখ্যাসূত্র বুনে বুনে, দীর্ঘকালীনতার অপবাদ তার গানকে প্রায়ই সইতে হয় না। এই দৃষ্টান্তগুলি বিবেচনা করলে মনে হয় যেন প্রয়োগসমস্যা সমাধানের পথে এটি ছিল রবীন্দ্রনাথের অন্যতম উপায়।

'গৃহপ্রবেশ'-এর সমাধান অবশ্য ভিন্ন প্রকৃতির। 'গৃহপ্রবেশ' তাঁর অন্য

রচনাবলি থেকে খুবই পৃথক। ঘটনাগতির স্থিরতা বলতে যদি কিছু বোঝায়, তার ছবি সর্বৈব আমরা দেখতে পাই এ-নাটকে। এইটেই রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় নিবিড় লিরিক নাটক, যার একমাত্র তুলনা মেলে 'ডাকঘর'-এ। এই নাটকে আমরা বিশেষভাবে জেনেছি যে যতীন সংগীতপিপাসু, এই তার চরিত্র, এবং রুগ্‌ণতার কারণে তার নিজের স্বর উন্মোচিত হতে পারে না বলেই শিষ্যকল্প হিমিকে সে গানের অনুনয় জানায় বারংবার। হিমির গানের মধ্যেও আছে এক প্রীতিময় ছলনা। অভিনেত্রী যদি প্রতিভাশালিনী হন তো এই দ্বন্দ্বজটিলতার আভায় তাঁর মুখরেখাকে নাটকীয় করে তুলতে পারেন। অন্যপক্ষে, যতীন রুগ্‌ণ এবং শায়িত, তার কায়িক চলন বা ভাবের দ্রুত বদল প্রত্যাশিতই নয়; তার চেয়ে বরং তার মুখে একটা স্থির বিষণ্ণ জ্যোতির আবহ দেখতেই ভালোবাসব আমরা। ফলে, এই গানগুলিতে অভিনেতার সমস্যা মেটানো সম্ভব, স্থাণু নাটকের ভাবচিত্র হিসেবে 'গৃহপ্রবেশ'-এর গানগুলি বিশেষ কোনো প্রয়োগসমস্যা তৈরি করে না।

কিন্তু অন্যত্র? যতীন হিমির কাছে গান শুনতে চায় নিজেই। অথচ রবীন্দ্রনাটকে প্রায়ই এমনটা ঘটে না, একমাত্র 'রক্তকরবী' আর 'তপতী'র অল্প ব্যতিক্রম ছেড়ে দিলে রবীন্দ্রনাথের গান সবই প্রায় স্বেচ্ছাগীত, শেক্সপীয়রের আলোচনায় অডেন যাকে বলেন 'ইম্‌প্রম্‌টু'। এই ধরনের ব্যবহার আরো জটিল এইজন্য যে প্রত্যাশিত গানে পরবর্তী আচরণের প্রতীক্ষায় অভিনেতার সঙ্গে দর্শকও খানিকটা প্রস্তুত হবার সময় পান, কিন্তু আকস্মিক এই স্বৈরপ্রণোদনায় তেমন কোনো সুযোগ মেলা কঠিন।

এইটে যেমন সবচেয়ে বড়ো বিঘ্ন, তেমনি ঠিক এই পথেই আবার রবীন্দ্রনাথ পেয়ে যান মুক্তির সন্ধান। 'জীবনস্মৃতি' বা 'ছেলেবেলা'র পাঠক মনে করতে পারবেন যে তাঁর নাটকের গায়ক—বিশেষত ঠাকুর্দাশ্রেণীর চরিত্রের একটা যুগল উৎসভূমি আছে, শ্রীকণ্ঠ সিংহ আর অক্ষয় চৌধুরী যে-উৎসের নাম। এই দুই ব্যক্তির স্মৃতিচারণে কবির ভাষাব্যবহার যদি স্মরণ করি :

> আমি গান ধরিতাম, তিনি সেতারে ঝংকার দিতেন এবং যেখানটিতে গানের প্রধান ঝোঁক ময়্‌ ছোড়োঁ, সেইখানটাতে মাতিয়া উঠিয়া তিনি নিজে যোগ দিতেন ও অশ্রান্তভাবে সেটা ফিরিয়া ফিরিয়া আবৃত্তি করিতেন।
>
> এই গানটি তিনি পিতৃদেবকে শোনাইতে শোনাইতে আবেগে

চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন…তাঁহার মুখের সম্মুখে হাত নাড়িয়া বলিতেন—অন্তরতর অন্তরতম তুমি যে……

সে-গান সুরে বেসুরে যেমন করিয়া পারেন, একেবারে মরিয়া হইয়া গাহিয়া যাইতেন।…সঙ্গে সঙ্গে তাল বাজাইবার সম্বন্ধেও অন্তরে বাহিরে তাঁহার কোনোপ্রকার বাধা ছিল না।…যাহা কিছু হাতের কাছে পাইতেন তাহাকে অজস্র টপাটপ শব্দে ধ্বনিত করিয়া আসর গরম করিয়া তুলিতেন।

ফুর্তি যখন রাখতে পারতেন না দাঁড়িয়ে উঠতেন, নেচে নেচে বাজাতে থাকতেন সেতার, হাসিতে বড়ো বড়ো চোখ জ্বলজ্বল করত, গান ধরতেন—ময়্ ছোড়োঁ ব্রজকী বাসরী।

এই চিহ্নিত অংশগুলিতে পাঠক কি গায়কের সঙ্গে সঙ্গে একজন অভিনেতাকেও দেখেন না? প্রকৃতপক্ষে এই দুই চরিত্রের সাভিনয় প্রগল্‌ভ সাংগীতিক প্রাচুর্যের সঙ্গে লোকসংগীতের প্রতি কবির স্বাভাবিক আকর্ষণ মিলিত হয়ে নাট্যচর্চার একটা অসীম সুবিধে তৈরি করে দেয়। লোকগীতি অনিবার্যভাবে আঙ্গিক সঞ্চালনের সঙ্গে যুক্ত, এবং তা যদি হয় বাউল গান তবে উদার সরল প্রাণশ্রীর নৃত্যরঙ্গও আমরা মঞ্চে প্রত্যাশা করতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা লক্ষ করি যে 'শারদোৎসব' থেকে 'মুক্তধারা' পর্যন্ত বাউলের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর রচনাবলির অন্যতম লক্ষণও বটে। 'ফাল্গুনী'তে বাউলের ভূমিকায় কবি যে আকস্মিক নৃত্যে সামাজিকবৃন্দকে চমকে দিয়েছিলেন, এখন ভেবে দেখলে তাকে পূর্বাপর সংগতিযুক্ত বলে বোঝা যায়। কথা যখন সংলাপ তখন তার অভিনয়ের রীতি ভিন্ন, কিন্তু গান যখন সংলাপ তখন নৃত্যই তার অভিনয়, নতুবা একটা মূঢ় স্থিতিতে বিপন্ন হতে পারে নাটক। এইজন্যই কি 'শারদোৎসব' থেকে কবি তাঁর বালক গায়কদলকে প্রায়-নৃত্যের জন্য উত্তেজিত করেছিলেন? কোন্ গহন আদর্শ তাঁর মনে ছিল তা সেই শিশু-অভিনেতাদের উপলব্ধির বাইরে, এমন-কী 'ফাল্গুনী'র আগে পর্যন্ত বয়স্কদের কাছেই তার রূপ ছিল না স্পষ্ট। এবং জাভাযাত্রার অভিজ্ঞতা কবিকে আরো-কিছু সাহস দেয় ঠিকই, তাহলেও প্রকৃতপক্ষে সাংগীতিক অভিনয়ের এই প্রাথমিক অন্তর্গত প্রেরণাই তাঁকে অবশেষে পৌঁছে দেয় নৃত্যনাট্যের তীর্থে, যেখানে নাটকের সংলাপই হলো গান আর গানের অভিনয়ই হলো নাচ।

'রাজা' 'ফাল্গুনী, বা 'মুক্তধারা'য় মূল বাউলকেই পাই। আর 'প্রায়শ্চিত্ত' এবং 'মুক্তধারা'র ধনঞ্জয়ও তো বাউলবৈরাগী। ফলত স্পষ্ট কোনো নির্দেশ না-থাকলেও কায়িক অভিনয় বা নৃত্য সেখানে গানের সঙ্গে অভিপ্রেত বলেই ভাবা যায়। যেখানে এ-বিষয়ে কোনো সংশয় হতে পারত সেখানেও রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করতে প্রায়ই ভোলেন না—কী আচরণ গায়কের কাছে প্রত্যাশিত। 'ঢেউ তোলো ঠাকুর, ঢেউ তোলো, কূল ছাপিয়ে যেতে চাই' পঞ্চকের এই কথার মূর্তি অল্প পরেই তার আচরণে দেখতে পাব যখন 'কিছু দূর গিয়া হঠাৎ ছুটিয়া ফিরিয়া আসিয়া' সে গান ধরে 'হারে রে রে রে রে'! কিংবা অন্যত্র 'ছুটিয়া প্রবেশ করিয়া' যে-পঞ্চক বলে 'তোমার নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক সব শুকনো পাতা' তার স্পষ্ট আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে 'আজ নৃত্য কর্ রে নৃত্য কর্' এই ব্যাকুলতায়। তখন আমরা আশা করতে পারি যে 'ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে' কোনো একটি স্থির গানের মূর্তি নয়, 'ওরে ভাই নাচ্ রে ও ভাই নাচ্ রে' কেবল গানেরই পদ নয়, অভিনয়েরও নির্দেশ। ঘূর্ণি হাওয়ার মঞ্চে তখন একটা প্রমত্ততার ছবি আমরা দেখতে পাই।

এর প্রতিতুলনায় সাজালে খানিকটা দুর্বলই মনে হবে 'সকল জনম ভরে' গানটিকে। পঞ্চকের চরিত্রের গভীর উচ্চারণের জন্য অনিবার্য ছিল কিনা ঐ গান সে-প্রশ্ন পরে বিবেচ্য, কিন্তু সন্দেহ নেই যে তার প্রয়োগগত বিঘ্ন অনেকখানি, যদি-না প্রথম থেকেই আমরা গানের নিজস্ব মাধুর্যে তৃপ্ত হতে প্রস্তুত থাকি। আর রবীন্দ্রনাটকে রবীন্দ্রসংগীত সেই পরম সুযোগ কিন্তু প্রায়ই নেয়, তার স্বসম্পূর্ণ মূল্য আমাদের এতই ভোলায় যে তাকেই কখনো কখনো নাটকের সৌন্দর্য ভেবে ভুল করি। এখানে মনে পড়ে, শেক্সপীয়রের প্রযোজকেরা বরং এই ভাবনায় পীড়িত যে প্রয়োজনমতো এমন চরিত্রাভিনেতা কোথায় পাওয়া যাবে, যিনি গায়ক কিন্তু যথেষ্ট ভালো গায়ক নন। কেননা নাটকের প্রবাহে অনেকসময়েই সুগীত গানের প্রয়োজন নেই। 'পথের পাঁচালি' ছবিতে ইন্দির ঠাকরুনের গান যদি প্রচলিত অর্থে ভালো হতো, তা কি কোনোরকমে উপাদেয় হতো আর্টের পক্ষে?

পঞ্চক কোনো একক উদাহরণ নয়, ঠাকুর্দা ধরনের চরিত্রেও এরই বিকাশ। ঠাকুর্দা প্রত্যক্ষত বাউল বা বৈরাগী নন, অথচ প্রচ্ছন্ন বাউল বলে তাঁকে চিনে নিতেও আমাদের সময় লাগে না, 'ডাকঘর'-এ তিনি দেখাও দেন ছদ্ম-ফকিরের পোশাকে। 'অরূপরতন'-এ ঠাকুর্দা যে-কথা বলেন তা এঁদের সবারই গোত্র-

পরিচয় বা লীলানির্দেশ : 'আমরা নটরাজের চেলা, তিনি ঘুরছেন আর ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছেন। কোথাও দাঁড়িয়ে থাকবার যো কী— শিঙ্গা যে বেজে উঠছে।' দাঁড়িয়ে থাকবার উপায় নেই বলেই পরমুহূর্তে তাঁর 'নৃত্য ও গীত' এবং আমরা সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাই বা দেখতে পাই :

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ।

৪

'রাজা'র গানের দলকে অনেকসময় মনে করা হয় গ্রীক ট্র্যাজেডির কোরাসের তুল্য। ঠাকুর্দা বা ধনঞ্জয়কে হয়তো এই অর্থে ভাবা যায় কোরাস দলের নেতা।

গ্রীক নাটক তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে, 'মালিনী'র ভূমিকায় কবির এই স্বীকৃতিকে প্রায় আক্ষরিকভাবেই মানতে লোভ হয়। তাঁর রচনাবলির অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য এবং বহির্জৈবনিক তথ্যাবলির দ্বারা কখনো মনে হয় না যে ওই নাটক তাঁর বিশেষ কোনো অভিনিবেশ, আসক্তি বা প্রেরণার বিষয় হতে পেরেছিল। ও-রকম সাদৃশ্যকে তাই প্রভাবজাত বলে গণ্য করা শক্ত। তবে দুয়ের মধ্যে সদৃশ সূত্র আছে কবিতার টানে অথবা মঞ্চ-ব্যবহারের ভঙ্গিতে। কিন্তু তাহলেও মনে রাখতে হবে যে কোরাসের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলিয়ে নেওয়া যায় না ঠাকুর্দার গানকে।

গ্রীক নাটকে কোরাস খুবই বড়ো এক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তা এমনই এক বৈশিষ্ট্য যা নাট্যকারদের সামনে রেখে দিয়েছিল প্রতিকূলতার বাধা। জন্মসূত্রে স্বভাব-আগত এই অতিরিক্ত অংশটিকে কীভাবে বর্জন করা যায়, ইস্কিলাস থেকে এউরিপিদেস পর্যন্ত তারই এক ক্রমিক চেষ্টা দেখতে পাই। তাই সমালোচকেরা প্রায়ই লক্ষ করেন যে এউরিপিদেসের নাটকে সৃষ্টির কোন গূঢ়লীন অংশ নয় কোরাস, বরং কয়েকটি প্রক্ষিপ্ত স্তূপ মাত্র, অনেকসময়েই তার প্রয়োজন মাত্র নাট্যবিরতি হিসাবে, যেন দৃশ্যবিভাগের বিকল্প। ইস্কিলাস বা সফোক্লেসে যদিও নাটকের সঙ্গে প্রাণময় সংযোগ পায় কোরাস, তাহলেও এর ব্যবহার তাঁদের কাছে সাদর স্বাচ্ছন্দ্যের ছিল বলে মনে হয় না।

ফলে এসব রচনায় কোরাস একদিকে যেমন নাট্যবিরতির চিহ্ন অন্যদিকে তা হয়তো পুরাঘটিত ঘটনার বিবৃতি, ঘটনাজটিলতা বা চরিত্রতাৎপর্যের ব্যাখ্যা বা

সাধারণীকরণ, প্রায়ই সমাপ্তিতে নাট্যবিষয়ের নীতিকথা উচ্চারণ, কিংবা ঘটনা-প্রবাহে দর্শকমনে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার বাণীলিপি। বিশেষত এই শেষ কারণেই কোরাস হয়ে ওঠে, গিলবার্ট মারের বর্ণনামতো, 'আইডিয়াল স্পেক্টেটর'। কিন্তু এই সমস্তকে মিলিয়ে অথবা যদি সামগ্রিক বিচারে তাকে বর্ণনা করি গ্রীক-নাটকের ভাবযন্ত্র হিসেবে, একটি জিনিস আমরা লক্ষ না করে পারি না যে এখানে নাট্যবিষয় এবং কোরাসের মধ্যে স্পষ্ট একটা ছেদরেখা আছে, যা প্রায় বিষয় আর বিষয়ীর ছেদ। অর্থাৎ কোরাস যখন জনচরিত্রে রূপান্তরিত নয়, যখন তা গীতিময়, তখন নাটককেও সে গণ্য করে দৃষ্ট বিষয় হিসেবে, নিজে তার ভিতরদিকে না-থেকে। এই বিচ্ছিন্নতা হয়তো জাপানি কাবুকি নাটকের 'চোবো'র মতো ততদূর নয়, অথবা যাত্রার বিবেক বা জুড়ির মতোও নয়। তাহলেও এসব ক্ষেত্রে দর্শক এবং কোরাসের একটা স্পষ্ট একাত্মতা আমরা সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করি।

অন্যপক্ষে রবীন্দ্রনাটকে গানগুলিও বিষয়। অর্থাৎ বিষয়ের পূর্ণতা ওই গান-গুলির সহযোগে, নাট্যকার অন্তত এইরকম ভাবেন। সন্দেহ নেই যে অনেক সময়ে তা বর্ণিত বিষয় বা চরিত্রের ব্যাখ্যা, কিন্তু তা দর্শকের দৃষ্টিতে প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা নয়, চরিত্রের নিজস্ব বিকাশের ব্যাখ্যা, চরিত্রের দৃষ্টিতে ঘটনার ব্যাখ্যা। সেই গানগুলির গায়ক কেবল গানই রচনা করে না, তার অতিরিক্ত যে-ভূমিকার দ্বারা তারা চরিত্রবান তা-ও রচনা করে। আর সেইটে বুঝতে না-পারলেই ঠাকুর্দা বা ধনঞ্জয়, কেবল গানের জন্যই নয়, তাঁদের সংলাপের জন্যও বিরক্তিকর পরিত্যাজ্য ভূমিকা বলে গণ্য হতে পারে। মনে রাখা ভালো যে এই জাতীয় চরিত্র কেবল সংগীতযোজনার অপরিহার্য যন্ত্র হিসেবেই আসে না নাটকে, আসে বিষয়েরই প্রয়োজনে, অন্তত 'ডাকঘর'-এর ঠাকুর্দা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

'সাধারণীকরণ' কথাটি প্রসঙ্গে আরেকটু বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। শিলার এই কোরাসের মধ্যে দেখেছেন নাটকের লিরিকমুক্তি। কোরাসের গানে ও ছন্দে, সুরে ও স্পন্দে নাটক তার পার্থিবতাকে অতিক্রম করে যায়। এইভাবে, কোরাস আর কোনো ব্যক্তির মূর্তি থাকে না, হয়ে ওঠে এক সার্বভৌম ধারণা, কাহিনীকে বিস্তারী তাৎপর্যদানে তার এক গূঢ় সফলতা আমরা ধরতে পারি। কিন্তু গ্রীক নাটকে লিরিকমুক্তির যে-ব্যবহার, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেইটেই নাট্য-দেহময় গৃহীত রূপ। অর্থাৎ কোনো এক বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনার মধ্যেই যে নাট্যবস্তু কেন্দ্রিত নয় তা রচনার প্রথম সংলাপ থেকেই ধ্বনিত হতে থাকে। অর্থাৎ বিশেষীকরণ এবং সাধারণীকরণের এই প্রক্রিয়া তাঁর নাটকে প্রথম থেকেই

এত স্পষ্ট যে সেইটেই কারো কারো মনে আপত্তি জাগাতে পারে। অতিরিক্ত গানগুলি সেইজন্য মুক্তিদ্যোতনার কাজে কোরাসের মতো জরুরি হয় না, এই নাটকে প্রথম থেকেই—চরিত্র ও সংলাপের স্বভাব থেকেই—বিষয় বিষয়মুক্তির সাধনা করে।

অবশ্য কোরাসের তুল্য অংশ রবীন্দ্রনাথের কোথাও নেই এমন নয়। 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে সখীদলের ভূমিকা মনে পড়তে পারে এই প্রসঙ্গে। নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে তন্বী 'চণ্ডালিকা', লক্ষণীয় যে এই শরবৎ ক্ষিপ্র রচনাটির মধ্যে অনাবশ্যক মেদবাহুল্য নেই কোথাও। এখানে সখীর কোনো ভূমিকা নেই, যে-সখীর উপস্থাপনা এই নৃত্যনাট্য বা গীতিনাট্যগুলির এক সাধারণ লক্ষণ। চিত্রাঙ্গদা বা শ্যামার সঙ্গে প্রকৃতির সামাজিক বা শ্রেণীগত ব্যবধান অনেকটা, এই সূত্রও সখীর অভাব ব্যাখ্যা করবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। বস্তুত প্রথমোক্ত রচনাদুটির নায়িকা প্রকৃতির স্বয়ম্প্রকাশ একাগ্র আকৃতিকে অনায়াসে ব্যবহার করতে পারছে না, এই দ্বিধাই কি কবিকে অন্য চরিত্রাবলি সৃষ্টির প্রেরণা দেয়নি? অর্থাৎ সেখানে, বিশেষত 'শ্যামা' নাটকে সখীরা কোরাসের মতোই সূক্ষ্ম অস্ফুটরেখায় আঁকা অংশগুলিকে স্পষ্ট করবার জন্য, বিষয়কে সার্বভৌম মুক্তি দেবার জন্য, দর্শক বা শ্রোতার উচিত-প্রতিক্রিয়ার বিশদ ছবি দেবার জন্যেই যেন উপস্থিত। উপরন্তু 'শ্যামা'তে, সখীদল এমন উচ্চারণও করে যা শুধু সর্বজ্ঞা নিয়তি এবং সেই কারণে সর্বজ্ঞ কাব্যস্রষ্টার পক্ষেই বলা সম্ভব, যার অমোঘ টানে শেষ পর্যন্ত নেপথ্যের উচ্চারণে জানতে পারি আমরা:

> অমৃতপাত্র ভাঙিলি
> করিলি মৃত্যুরে সমর্পণ;
> এ দুর্লভ প্রেম মূল্য হারাল
> কলঙ্কে, অসম্মানে।

এসব অংশ, গ্রীক কোরাসের মতোই, নাটকের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে আসে না, আসে দ্রুত-সংক্ষিপ্ত নাটকচর্চার ব্যবহারগত কারণে।

অন্যত্র, মাত্র 'মুক্তধারা'র বাউলগান 'ও তো আর ফিরবে না রে, ফিরবে না আর' গানটির নিয়তিলীলায়, 'নটীর পূজা' নাটকে 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' গানে এবং 'গুরু' আর 'অরূপরতন'-এর অন্ত্য-গীতির প্রায় নীতিকথনে কোরাসের সঙ্গে ঈষৎ প্রয়োগগত সাদৃশ্য ধরা পড়ে। 'অরূপরতন'-এর সূচনা-শেষ এমনি দুই গানে বাঁধা, নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন সেই দুই প্রান্ত যার কোনোটিই 'রাজা'য় নেই। অর্থাৎ

একদিকে বক্তব্যকে অতিপ্রকাশ্য করবার আগ্রহ, অন্যদিকে গানকে নাটকের সঙ্গে রেখেও খুব দূরবর্তী করে রাখবার প্রেরণা এই সময়ে দেখা দিচ্ছে। ইতিমধ্যে 'ফাল্গুনী'তে সেই কারণেই গীতিভূমিকা নামে একটি অংশ পাচ্ছি প্রত্যেক দৃশ্যের সূচনায়, যার পরিণতি নিশ্চয় তাঁর পালানাট্যগুলি — 'বসন্ত' 'নবীন' বা 'বর্ষামঙ্গল' — রচয়িতার নির্দেশ সত্ত্বেও যাকে নাটক বলতে আমার বিবেকে বাধে।

৫

'হ্যাঁ মহারাজ, গানের চাবি দিয়েই এর এক-একটি অঙ্কের দরজা খোলা হবে।' 'ফাল্গুনী'তে এতটাই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'গৃহপ্রবেশ'-এর সেই সদাশয় ডাক্তার-টিকেও মনে পড়ে যিনি ওষুধের চেয়ে গানকে শরীরের পক্ষে উপকারী বলে গবেষণা লিখতে রাজী ছিলেন। কিন্তু 'গৃহপ্রবেশ'-এ গান হৃদয়াকৃতির প্রকাশ, 'ফাল্গুনী'র প্রয়োজন স্পষ্টতই তত্ত্বনির্দেশ, তার গানগুলির অনেকটাই হয়তো থীম মিউজিক। কেবল এ-নাটকেই নয়, অন্যত্রও কবি একটি বা দুটি গান ব্যবহার করেন, যা নাট্য-মর্ম ধরিয়ে দেবার যোগ্য এই থীম মিউজিক।

'শারদোৎসব' থেকেই দেখা দিচ্ছে এই রীতি। পুরোনো নাটকে বিষয় পুরোনো প্রথামতোই কোনো এক পূর্ণাঙ্গ কাহিনীর আয়তন পায় এবং গানের ব্যবহারেও তখনো পর্যন্ত কবি তাঁর নিজস্ব ধরনে পৌঁছননি! আবার, 'রাজা ও রানী' বা 'বিসর্জন'-এর পদ্যসংলাপ বর্জন করে যদিও এখন গৃহীত হলো গদ্য, তাহলেও ভাষা এখন অনেক বেশি কবিতাস্পর্শী। সমস্ত আবহে এখন গীতিসুর এমনভাবে রণিত যে, রচনার নিহিতমূল তাৎপর্য গানের ভিতর দিয়ে ধরতেই এখন কবির স্বাভাবিক উৎসাহ।

'শারদোৎসব' থেকে যে প্রোলোগ ধরনটিকে পাচ্ছি নাটকে, তাকে বিষয়-নির্দেশক গান হিসেবে চিনতে কোনো ভুল হয় না! এই নাটকে 'আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে' বা 'ঋণশোধ'-এ 'হৃদয়ে ছিলে জেগে', 'ফাল্গুনী'তে 'পথ দিয়ে কে যায় গো চলে' আর 'অরূপরতন'-এর 'চোখ যে ওদের ছুটে চলে' (আবার অন্তিমে 'অরূপবীণা রূপের আড়ালে')—এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে থীম-সঞ্চারী হলেও এই অংশগুলি নাট্যদেহে ঘনিষ্ঠযুক্ত নয়, বিচ্ছিন্ন গান মাত্র। এই রীতিরই আরেকটু প্রচ্ছন্ন ব্যবহার বরং তুলনায় তৃপ্তি-জনক, যেমন 'রাজা'য় সুরঙ্গমার গান 'কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে', 'অচলায়তন'-এ পঞ্চকের 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে', 'তপতী'তে 'সর্ব

খর্বতারে দহে' কিংবা 'গৃহপ্রবেশ'-এ হিমির গান 'খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি'। লক্ষণীয় যে এই গানগুলি আছে নাটকের প্রথম দিকেই! 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' যদিও 'রক্তকরবী'র প্রথমেই নেই, কিন্তু এটি নাটকে ব্যবহৃত প্রথম গান। 'নটীর পুজা'রও সূচনায় উপালির গান আছে 'পূর্বগগনভাগে', কিন্তু ওই নাটকের মূল সুর নিশ্চয় ধরা যায় 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' গানে। এবং 'মুক্তধারা'য় প্রথম গান 'জয় ভৈরব' আর তার 'তিমিরহৃদ্‌বিদারণ' অংশের নিরন্তর আবর্তন নাটকের প্রবল এক অভিঘাত, কিন্তু এর বিষয়টি ধরা পড়ে ধনঞ্জয়ের 'আমি মারের সাগর পাড়ি দেব' উচ্চারণে।

অর্থাৎ কখনো কখনো নাটকের মধ্যে এবং অধিকাংশ সময়ে নাট্যসূচনায়, কখনো-বা পাত্রপাত্রীর সংলাপে এবং কখনো বিচ্ছিন্ন সূত্রসংগীত হিসেবে কিছু-সংখ্যক গান রবীন্দ্রনাথ রেখে যান তাঁর বক্তব্যের নিশানা হিসেবে। নাট্যসূচনায় যোজিত এ-রকম গানের একটা দুর্বলতা প্রায়ই থাকে, তাকে মনে হতে পারে এমন একটা প্রতিপাদ্যরূপে উপস্থাপিত যার ব্যাখ্যা বা উদাহরণ মিলবে পরবর্তী রচনাক্রমে। অন্তর্গত গানগুলিতে সে-ত্রুটি তুলনায় কম, কেননা ইতিমধ্যে অনেকখানি এগিয়ে এসে চরিত্র বা ঘটনার প্রত্যাঘাতে সেই গানের প্রতিধ্বনি আমরা নিতে পারছি। কিন্তু এসব দুর্বলতা থেকে কোনো কোনো নাটকে রবীন্দ্রনাথ মুক্তি পান এক আশ্চর্য উপায়ে এবং এই উপায়টিই নাটকে গানের ব্যবহারে তাঁর সর্বোত্তম সিদ্ধি।

রবীন্দ্রনাটকে অথবা সাধারণভাবে বাংলা নাটকে, আবহসংগীতের কোনো বিশদ নির্দেশ আমরা পাই না। নাটকে ঘটনাস্রোতের সমতালে অথবা মধ্যবর্তী কোনো সময়ে কোনো যন্ত্রসংগীত ব্যবহৃত হবে কিনা তা নির্ভর করে সম্পূর্ণই প্রযোজকের ওপর। বাঁশি বেহালা বা সরোদ বাজানো যেতে পারে নিজস্ব পরিকল্পনা মতো, নাট্যকার এ-বিষয়ে কোনো নির্দেশ দেন না। অথচ রবীন্দ্র-নাথের রচনায় এই আবহনির্মাণের গুরুত্ব খুবই বেশি। সেই দায়িত্ব তিনি প্রত্যক্ষত নেননি বটে, কিন্তু বস্তুত কোনো কোনো গানের কথা-সুরের সমন্বয় এমন একটা জটিল প্রত্যাঘাতপূর্ণ আবহ সঞ্চার করে যার রেশ অনেকক্ষণ পর্যন্ত থাকে নাট্যঘটনায়। ঠিক স্পষ্ট বোঝা যায় না এমন এক অনুভব তৈরি হয়, যার ঘূর্ণিস্রোতে ঘটনার যথার্থ পরিবেশ রচিত হয়, নাটকের আবেদনও একটা স্থির লক্ষ্যের পরিপূর্ণতা পেয়ে যায়।

'তপতী'র 'সর্ব খর্বতারে দহে' অথবা 'রক্তকরবী'র 'পৌষ তোদের ডাক

দিয়েছে' এমনিভাবে তত্ত্বের চেয়ে বেশি একটা প্রবাহিত সৌন্দর্য উৎসারিত করে দেয়। 'শারদোৎসব'-এ 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়' বা 'আনন্দেরই সাগর থেকে', 'রাজা' নাটকে 'আজি দখিনদুয়ার খোলা', 'অচলায়তন'-এ 'ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে' এবং 'ফাল্গুনী'র 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে' বা 'আয়রে তবে মাতরে সবে আনন্দে' গানগুলির কথা এই সঙ্গে মনে হবে। লক্ষণীয় যে কোনো কোনো নাটকের পাঠান্তর-রূপান্তরের সময়ে অনেক গানের নূতন গ্রহণবর্জন সত্ত্বেও এ-গানগুলি কিন্তু প্রায়ই অপরিবর্তিত থেকে যায়।

আবহনির্মাণ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হয়তো 'মুক্তধারা'। ভৈরবপন্থী সন্ন্যাসীদের 'জয় ভৈরব, জয় ভৈরব' গানের সঙ্গে সঙ্গে যে-গূঢ় গম্ভীর আয়োজনের সূত্রপাত, পরবর্তী নাগরিকদের শঙ্কাস্পন্দিত কথামালার সঙ্গে জড়িত হয়ে তা এক অশুভ পরিবেশের দ্যোতনায় মুহূর্তমধ্যে নাট্যদেহকে ব্যাপ্ত করে নেয়। এরই কিছু পরে যন্ত্রবন্দনা এবং প্রথম গানের 'তিমিরহৃদবিদারণ' গীতাংশ আমাদের এমন এক বোধে সরিয়ে আনে যেখান থেকে দেখলে কেবল বাউল কেন, দর্শকদের সুদ্ধ মনে হবে 'ও তো আর ফিরবে না রে ফিরবে না আর!' মধ্যবর্তী ধনঞ্জয়ের গানগুলিকে খানিকটা বহুলতা মনে হয়, আবহসঞ্চারে তার নিজস্ব ভূমিকা অল্পই, একমাত্র 'আগুন আমার ভাই' হয়তো ঘটনাকে একবার করতালিতে বাজিয়ে তোলে: কিন্তু এই ধ্বনিই আবার সহস্রতায় ঝংকৃত হয়ে ওঠে নাটকের শেষ গানে, দ্রুত তালে যেন ছিন্ন প্রত্যঙ্গের মতো দূরে দূরে, সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে: 'বাজে রে বাজে ডমরু বাজে'। যেন ভৈরবের সাধনা সফল হলো একেবারেই এক অন্য অর্থে, চতুর্ধারে অন্ধকার উদ্‌বেগ আশঙ্কা ক্রন্দন, তার মাঝখানে একটি প্রায়-সহাস্য, স্থির, ঈশ্বরপ্রতিম মূর্তি থেকে যখন ওই সংগীত ছড়িয়ে পড়ে, তখন মনে হয় যেন মঞ্চে একটা এলোমেলো অস্পষ্ট ঘূর্ণি বয়ে গেল, গানটিকে যেন নাটকে দেখতে পাই পর্যন্ত।

তাহলে নাটকের বক্তব্যকে কোনো একটা কেন্দ্রে স্থির রাখবার জন্য অথবা আবহরচনার সুযোগ্য কারণে রবীন্দ্রনাটকে কোনো কোনো গান প্রয়োগের তাৎপর্য বোঝা যায়। কিন্তু অন্য গানগুলি? নাটকের অন্য প্রয়োজন?

৬

'নাট্যশাস্ত্র'কার গানকে বলেন নাট্যশয্যা এবং 'গীতেষু যত্নঃ প্রথমং তু কার্যঃ' বলে নাট্যকারকে বরং গীতিরচনায় উৎসাহই দেন। আমাদের গ্রামীণ চর্চায়

সবসময়েই একত্রলীন হয়ে আছে নাচ গান নাটক। তাই প্রথানুকূল পশ্চিমি নাটকের আদর্শ আমাদের না-ভাবলেও চলে, গানকে আমরা ব্যবহার করতে পারি জাতিচরিত্রের কাঠামো হিসেবেই। তাহলেও আছে শিল্প-সংগতির প্রশ্ন : যদি চরিত্রাবলির গুরুতর কোনো অনিবার্যতা থেকে না আসে এবং/অথবা যদি তা নাট্যবিন্যাসের সঙ্গে একটা প্রাণময় অংশরূপে সন্নদ্ধ না-হয়, তবে নাটকে গানের ব্যবহার হয়ে ওঠে এক অবৈধ অত্যাচার। জন-প্রমোদের প্রয়োজনে নাট্যকার অনেক সময়ে আত্মইচ্ছার বিরুদ্ধেও প্রভূতসংখ্যক গান রচনায় বাধ্য থাকেন, কিন্তু তাঁর সাধনা নিহিত হয় এই রচনার যোগ্য শিল্পরূপায়ণে। তার ফলে একজন শেক্সপীয়রকে হয়তো আমরা পাই সফল মিলনের মহৎ দৃষ্টান্ত হিসেবে, কিন্তু অনেকসময়েই এটা থাকে অনায়ত্ত। এমন-কী শেক্সপীয়রের বিপন্নতাও কখনো কখনো লক্ষ করেন সমালোচক। 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' পর্যন্ত গায়ককে তিনি যে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর নাট্যচরিত্র করে তুলতে পারছেন না, তাকে নিতে হচ্ছে কেবল গানেরই প্রয়োজনে, আমিয়েলের চরিত্রে কেউ কেউ তার প্রমাণ দেখেন। অবশ্য প্রায়ই শেক্সপীয়রের গান চরিত্রের গূঢ়তম ব্যঞ্জনায় অথবা কোনো আকস্মিক প্রত্যাঘাতের প্রয়োজনে নাটকের বড়ো উপাদান হয়ে ওঠে। ট্র্যাজেডিগুলিতেও এমন অবকাশ তৈরি হয় যেখানে গানই একমাত্র ভাষা এবং তার অসম্ভব অবিশ্বাস্যতাকেই মনে হয় সবচেয়ে নাটকীয়। আমরা কি ভুলতে পারি ওফেলিয়ার গানের আঘাত, কিংবা ডেসডিমোনার!

রবীন্দ্রনাথে এর অনুরূপ এক দৃষ্টান্ত মনে পড়ে, 'গৃহপ্রবেশ'। যতীনের সেই একটিমাত্র গান 'ওরে মন যখন জাগলি না রে', তার নিঃসীম শূন্যতা তাকে এক নিশ্চিত গানের সমুদ্রে পৌঁছে দিয়েছে জেনেও তার কণ্ঠে এই গীতিধ্বনির জন্য প্রস্তুত ছিলাম না আমরা। তার রুগ্‌ণতা আর শক্তির ক্ষীণ অবশেষ হয়তো এর কারণ। যদি অভিনয়ে গানের সেই ক্ষীণতা আর অমোঘ প্রেরণার দ্যুতি একসঙ্গে ধরা থাকে, এই গানের মধ্যে নাটকের সবচেয়ে করুণতা তাহলে হয়তো দেখতে পাব। সন্দেহ নেই যে চতুর্দিকে হিমির গানের পুঞ্জ যদি একে সর্বতোভাবে আচ্ছন্ন করে না-রাখত তবে এর আঘাত হতে পারত আরো তীব্র, আরো অসহনীয়।

এখানে প্রশ্ন উঠবে যে চরিত্রগত এই অভিঘাত অথবা চরিত্রবিকাশের স্বাভাবিক রীতি রবীন্দ্রনাথে আমরা আশাই বা করব কেন। পুরোনো মানের বিচার কি এখানে একেবারেই ব্যর্থ নয়? এই প্রশ্ন স্বীকার করে নিলে কী বলব

আমরা ? 'রাজা ও রানী' 'বিসর্জন' বা 'প্রায়শ্চিত্ত', 'শোধবোধ' 'চিরকুমার সভা' বা 'শেষরক্ষা'য় রবীন্দ্রনাথ অনেকসময়ে গানের ব্যবহারে প্রথানুকূল, দ্যুতিহীন। কিন্তু তাঁর স্বরীতির নাটকে গান নাট্যধর্মের পোষকতাই করে, যেহেতু এই ধর্মই ভিন্ন। তাঁর পরবর্তী নাটকগুলি বহন করে পরাবাস্তবের ব্যঞ্জনা, তাই তা দূরগম্য অস্পষ্টতায় গড়িয়ে যায়, সুরসঞ্চারী গীতিকবিতার সঙ্গে তার সম্পর্কও হয় ঘনিষ্ঠ। সমালোচক তাই এ-কথা মনে করবেন যে এ-রকম নাটকে আমরা রুক্ষ বাস্তবের চেয়ে বরং প্রত্যাশা করব একটা গীতল পরিবেশ, নভোবিস্তারী কোনো এক সুরের আবহ। তাই অজিতকুমার চক্রবর্তী জানিয়েছিলেন যে গীতিপরিবেশ রচনার কারণেই তাঁর নাটকে গানের এই বহুলতা, টমসনের ভাষায় 'লিরিক্যাল ফীস্ট'।

কিন্তু নাটকগুলির বারংবার পাঠ আর অভিনয় থেকে আমাদের কি এই-রকমই মনে হয় না যে গানগুলির কিছু পরিমাণে বর্জিত হওয়া উচিত ছিল কেবল এই গীতিপরিবেশ রক্ষা করবার জন্যেই! প্রতীকী নাটক ব্যঞ্জনা বহন করে বলেই তার পক্ষে বাহুল্যবর্জন এবং সংযমিতা অত্যাবশ্যক, কারণ পুনরাবৃত্তিজনিত ক্লান্তি যত বাড়ে, সূক্ষ্ম রসানুভবের পরিবেশ রচনায় তা ততই বেশি বাধা তৈরি করে।

অথচ তাঁর নাটকে একদিকে যেমন একই ভাবের আবর্তিত ব্যবহার, অন্য-দিকে তেমনি গানগুলি আছে যেন কথারই ভাষ্যকার হিসেবে, যেন প্রগল্ভ ব্যাখ্যাতার অবয়ব ধরে গান, যেমন 'রাজা' বা 'মুক্তধারা'য়। আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথের গান বাণীপ্রধান, ফলে তা কেবল সুরের মায়াজালই বোনে না, সেই সঙ্গে এঁকে যায় কথার রেখাও। তখন প্রশ্ন জাগে যে, সব সময়ে সেই কথায় আমরা অতিরিক্ত কিছু পাচ্ছি কি, যা তার অব্যবহিতপূর্ব সংলাপেই ধরা পড়ছে না? তাঁর গানগুলির এইটে কি এক সামান্য লক্ষণ নয় যে প্রথমত সংলাপে যে-বিষয়ের উত্থাপন, গানে তারই বিস্তার? বিস্তার না বলে কখনো তাকে পুনঃপ্রয়োগ পর্যন্ত বলা যায়, কেননা পূর্ববর্তী সংলাপে সেই গীতিভাষার পুরোটাই অনেকসময়ে মিলে যাচ্ছে। একটি উদাহরণ ধরা যাক :

ধনঞ্জয়। রাজা, ভুল করছ এই যে ভাবছ জগৎটাকে কেড়ে নিলেই জগৎ তোমার হল। ছেড়ে রাখলেই যাকে পাও মুঠোর মধ্যে চাপতে গেলেই দেখবে সে ফসকে গেছে।

ভাবছ, হবে তুমি যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও,

দেখবে হঠাৎ নয়ন মেলে
হয় না যেটা সেটাও হবে।

কিংবা, বিপরীত উদাহরণ :

ধনঞ্জয়। রইল বলে রাখলে কারে?
হুকুম তোমার ফলবে কবে?
টানাটানি টিকবে না, ভাই,
রবার যেটা সেটাই রবে।

রাজা, টেনে কিছুই রাখতে পারবে না। সহজে রাখবার শক্তি যদি থাকে তবেই রাখা চলবে।

আবার অন্যত্র :

ঠাকুর্দা। ফাঁকা! আমাদের দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেই তো সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে— তাকে বল ফাঁকা! সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে।…আমাদের রাজা নিজে জায়গা জোড়ে না, সবাইকে জায়গা ছেড়ে দেয়।…

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে!…
রাজা সবারে দেন মান
সে মান আপনি ফিরে পান
মোদের খাটো করে রাখেনি কেউ কোনো অসত্যে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।

এসব অংশ কি বস্তুত একই কথার গদ্য-পদ্য দুই ভিন্ন রূপ নয়? কী ছিল এই দুই রূপের অনিবার্য প্রয়োজন? সুর ব্যবহারের ফলে কি রচিত হচ্ছে কোনো নূতন ধরনের সংগতি?

না। 'শারদোৎসব' থেকে নাটকের গদ্যসংলাপেই লাগছে কবিতার স্পর্শ, কখনো কখনো এই গদ্যই হয়ে উঠছে যেন পুরো লিরিকের ভাষা। আশ্চর্য হয়তো এই যে সবচেয়ে প্রগাঢ় লিরিকের ভাষা আমাদের বাস্তবিক প্রয়োগ থেকে খুব দূরবর্তী নয়, কখনো কখনো এ-দুটি মিলে যায় এক বিন্দুতে। এই ধরনের নাটকরচনায় সেই স্পষ্ট বিন্দুটির আবিষ্কারই সবচেয়ে বড়ো সার্থকতা এবং রবীন্দ্রনাথ অন্তত একবার তাকে সম্পূর্ণত আয়ত্ত করেছিলেন 'ডাকঘর' রচনাকালে।

ফলে যে-গীতিপরিবেশ এসব নাটকে আমরা প্রত্যাশা করি, নাটকের সংলাপই তাকে খোঁজে, সংলাপেই পাই সে-সুর—গানের অতিমাত্র ব্যবহার সেইজন্তেও মনে হয় নিষ্কারণ। এর জন্যে যে সংলাপকে অলংকারময় কৃত্রিমতায় সাজাতে হবে এমনও নয়, স্বাভাবিক নিমগ্নতাই বরং সে-সুর জলেস্থলে ব্যাপ্ত করে দিতে পারে। নভোবিস্তারী যে-গীতিগুঞ্জন, যে 'music of the sphere' আমরা ধ্বনিত হতে শুনব নাটকে, তা কি সার্থকতমভাবে উপস্থাপিত নয় 'ডাকঘর'-এ?

অথচ 'ডাকঘর' নাটকে একটিও গান নেই। 'ডাকঘর'-এ ঠাকুর্দা আছেন কিন্তু গান নেই। 'ডাকঘর' রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে নিগূঢ় অর্থে লিরিক্যাল, কিন্তু অজিতকুমার নিশ্চয় লক্ষ করেছেন যে তার জন্যেই রবীন্দ্রনাথ গানের ব্যবহারকে প্রয়োজনীয় ভাবেননি। এই না-থাকা যেমন রবীন্দ্রনাটকে গানের অপরিহার্যতা বিষয়ে আমাদের আরেকবার ভাবিয়ে দেয়, তেমনি এর আরেক দিক দেখি পরবর্তী অভিনয়চর্চায়। আজ আমরা জানি যে মূল রচনাটিতে গান না-থাকলেও অভিনয়ের জন্য পরে রচিত বা নির্বাচিত হয়েছিল অন্তত সাতটি গান। এই যোজনার দ্বারা শিল্পগুণ বাড়ছে মনে করলে নিশ্চয় উত্তরকালীন সংস্করণে এদের আমরা দেখতে পেতাম। এই যোজনাতেও আমরা পূর্বকথিত আদর্শই লক্ষ করি, সংলাপে যা বলা হলো গানে তারই বিস্তার। 'সুরের জালে কে জড়ালে আমার মন' অমলের মুখে এই গান কি সত্যিই আমাদের মনে তত ব্যাপক সুরের জাল ছড়ায়, যতটা পারে তার এই কথা :

> ও আমার শুনতে খুব ভালো লাগে। আকাশের খুব শেষ থেকে যেমন পাখির ডাক শুনলে মন উদাস হয়ে যায়—তেমনি ওই রাস্তার মোড় থেকে ওই গাছের সারের মধ্য দিয়ে যখন তোমার ডাক আসছিল, আমার মনে হচ্ছিল—কী জানি কী মনে হচ্ছিল।

বস্তুত এই সংলাপের মধ্যে এমন এক পরিবহণ আছে যার সাহায্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পের প্রত্যাশিত বহুস্তর অসীমতা নিমেষে আমাদের মনকে ভারাতুর করে তোলে। অথচ গানগুলি কখনো কখনো বিপরীত কাজ করে। গান যেন এই অসীমতাকে প্রায় একটা ব্যাখ্যার কাছে এনে দাঁড় করায়, তার সবদিকে নির্দিষ্ট অর্থের বন্ধন পরিয়ে দেয়।* এমন-কী 'ডাকঘর'-এর পরিণামে অমলের মৃত্যু হলো কি হলো

* গান যে আমাদের মনকে দূরের দিকে মুক্তি দেয়, সেই সহজ সত্যকে অস্বীকার করা এ-উক্তির উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু স্ব-তন্ত্র গান আর আশ্রিত গানের আবেদন ভিন্ন। সম্পূর্ণের সঙ্গে অংশকে মিলিয়ে দেখতে আমরা বাধ্য হই। তাই এসব ক্ষেত্রে গানের বাণী একটা অর্থনির্দেশ বহন করে সীমা এনে দেয়।

না, সমালোচকদের এই দুশ্চিন্তার স্বাধীনতাও অনেকটা খর্ব হয়ে আসে সমাপ্তিতে 'সমুখে শান্তি পারাবার' গানটির পরিকল্পনায়। 'ডাকঘর'-এ অভিনীত গানগুলির ব্যবহার একে হয়তো দ্বিতীয় 'হানেলে'র মতো গড়ে তুলত, তার বর্তমান অনিঃশেষ মহিমা সেখানে পেতুম না, পেতুম না তার সেই শুদ্ধতম গঠন যা মুগ্ধ করেছিল ইয়েট্‌সকে। হাউপট্‌মান্ তাঁর উক্ত নাটকটিতে মৃত্যুসমস্যার প্রত্যক্ষ উত্থাপনে এমন একটা স্বাদ এনে দিয়েছেন, বা কখনোই 'ডাকঘর'-এর গভীরতায় পৌঁছয় না। 'হানেলে'র সব সৌন্দর্য স্বীকার করেও তাকে 'ডাকঘর'-এর মতো ব্যঞ্জনাবাহী বলে মনে করা অসম্ভব।

পুনরাবৃত্তি আর ব্যাখ্যাপ্রবণতা ছাড়া অন্যভাবেও গান আসে রবীন্দ্রনাথের নাটকে। কখনো-বা সংলাপের সম্পূর্ণ ভাষাই হয় গান। যেমন 'মুক্তধারা'য় :

> রণজিৎ। নিজে সরতে না পারো আমিই সরিয়ে দিচ্ছি। উদ্ধব, বৈরাগীকে এখন শিবিরে বন্দী করে রাখো।
>
> ধনঞ্জয়। তোর শিকল আমায় বিকল করবে না / তোর মারে মরম মরবে না···ইত্যাদি

কিংবা 'রাজা' নাটকের প্রথম গান, 'খোলো খোলো দ্বার, রাখিয়ো না আর বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে'। এখানে গান উত্তর প্রত্যুত্তরের ভূমিকা নেয়, তার অতিরিক্ত অবলম্বন হিসেবে সঙ্গে কোনো গদ্যসংলাপ যুক্ত থাকে না। ব্যাখ্যা বা বিস্তার-জনিত অপবাদ তাই এর নয়। কিন্তু এই ব্যবহারের ত্রুটি অন্যত্র। এলিয়ট দেখিয়েছেন মাধ্যমের অতর্কিত পরিবর্তন দর্শকমনে কী অবাঞ্ছনীয় উপদ্রব তৈরি করতে পারে। এলিয়টের সমস্যা অবশ্য গদ্যপদ্য বিষয়ে। কিন্তু ওই একই সিদ্ধান্ত আমরা গদ্য আর গান বিষয়েও ব্যবহার্য বলে ভাবতে পারি। যেখানে গান আর কোনো 'ব্যবহার' থাকছে না, হয়ে উঠছে স্বতন্ত্র সংলাপ, অনুভবের প্রকাশ নয় কিন্তু প্রতিকথন, সেখানে মাধ্যমের এই স্তরগত পরিবর্তন আমাদের বিপর্যস্ত করতেও পারে। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে বা গীতিনাট্যে যখন গানই সংলাপের ভাষা তখন এমন কোনো আপত্তি জাগে না, কিন্তু আকস্মিক স্তরপরিবর্তনে শিল্প তার অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হতে পারে বলে অন্য নাটকের এ-জাতীয় গানগুলি আমাদের খানিকটা ভাবিয়েই তোলে।

৭

'গৃহপ্রবেশ'-এর ব্যতিক্রম ছাড়া এ-পর্যন্ত আমরা কেবল সেই গানগুলির প্রসঙ্গ ভেবেছি যাকে বলা যায় স্বেচ্ছাগান। আয়োজনহীন গানের অনায়াস উৎস হিসেবেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর গায়ক চরিত্রগুলিকে আনেন কেন? বসন্ত রায় সুরঙ্গমা পঞ্চক ধনঞ্জয় বা ঠাকুর্দা কেন এত স্বভাবতই গীতিমুখর? এর একটা কারণ হয়তো এই যে এদের স্বভাবে বাউলবৈরাগীর পথচল্‌তি জীবনের অভিক্ষেপ আছে। আবার পরিণত জীবনে তাঁর রচনায় অনুরুদ্ধ গান তুলনায় বেশি। যেমন 'গৃহপ্রবেশ' বিষয়ে এ-কথা সত্যি, তেমনি 'রক্তকরবী' বা 'তপতী'তেও। 'রক্ত-করবী'তে গানের সংখ্যা কম। তার মধ্যে বিশুর দুটি গান স্পষ্টই অনুরোধজাত, একটি শুনতে চেয়েছিল চন্দ্রা, অন্যটি নন্দিনী। আরো যে-দুটি সবচেয়ে মর্মভেদী গান বিশুর গলায় শুনেছি তা-ও প্রচ্ছন্ন অনুরোধেরই। নন্দিনী আর বিশুর কথোপকথনের সূত্রপাতে জানতে পাই গানের প্রসঙ্গ: 'পাগল ভাই, দূরের রাস্তা দিয়ে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিল, শুনেছিলে?' সেই দীর্ঘ প্রসঙ্গের অবসানেই শুনি 'সেই আকাশটা আছে বলেই তোমাকে গান শোনাতে পারি' বলে বিশুর গেয়ে-ওঠা 'তোমায় গান শোনাব'। অল্প পরে নন্দিনীর কাছে আমরা জেনেছি যে বিশু তাকে গান শেখায়, তার কাছে সে শিখেছে 'ভালোবাসি ভালোবাসি', আর তার আগেই ইতিমধ্যে, 'তারপর কতকাল খোঁজ পাই নি, কোথায় তুমি গেলে বলো তো' এই প্রশ্নের উত্তরে শুনছি 'ও চাঁদ চোখের জলের লাগল জোয়ার'।

এই গানে শুনতে পাওয়া যায় বিশুর মনের একটা অব্যক্ত অংশ যা সঙ্গে সঙ্গে অনির্বচনীয়ও বটে, যা প্রকাশ করতে গেলে গান ছাড়া অন্য ভাষা বাতুল হয়ে যায়। তখন এ-গানকে মনে হয় অনিবার্য, কেননা এর দ্বারা বিশুর যে-চরিত্র প্রকাশ পাচ্ছে তার মধ্যে একটা তৃতীয় মাত্রার আভাস আমরা দেখতে পাই, আর এই মাত্রাই হচ্ছে সেই মানব-মাত্রা, রবীন্দ্রনাথের স্বভাবগায়কদের মধ্যে যা আমরা প্রায়ই পাই না। স্বেচ্ছাগান আর অনুরুদ্ধ গানের এই প্রভেদসূত্র থেকেও বোঝা যায় যে বিশু পুরোপুরি ধনঞ্জয়-শ্রেণীরই আরেকজন মাত্র নয়, ধনঞ্জয় বা ঠাকুর্দার সেই তৃতীয় মাত্রাটি নেই যার জোরে বিশু অনেক সমৃদ্ধ চরিত্র।

স্বভাবতই আমি বিশুর প্রেমিক চিত্তটির কথা ভাবছি, ব্যর্থ প্রেমিকের দগ্ধ উদার চরিত্রের কথা। 'তপতী'তেও ঠিক তেমনি গান আসে এই মানবিক

চরিত্রের প্রেমবাসনার বিকাশে। 'গৃহপ্রবেশ'-এও প্রেমই বিষয় এবং যতীনের নিবিষ্ট সৌন্দর্যানুভূতি একটা অস্পষ্ট ব্যর্থতাবোধের দ্বারা জড়িত হয়ে হাহাকার ধ্বনিত করছে এই নাটকে। এই সূত্রে যতীন আর বিশুর সংগীতচেতনায় একটা দূর সাদৃশ্যও ধরা পড়ে, গভীরতায় আক্রান্ত হয়ে যা সৌন্দর্যের সৃষ্টি করছে, 'তপতী'র গানে যার অভাব। 'গৃহপ্রবেশ'-এ অনেক এবং 'রক্তকরবী'তে কিছু গান কমতে পারত, কিন্তু 'তপতী'তে অধিকাংশ গানই ছিল অনায়াসে পরিহার্য। নাটকের গাঢ়তাকে, বিশেষত 'সর্ব খর্বতারে দহে' ধ্বনিতে আগেই যাকে একটা গুরুতর অবয়ব দেওয়া হয়েছে, তাকে বিপাশার গানগুলি অনেকটা লঘু তরলতায় ছড়িয়ে দেয় যেন।

'শারদোৎসব'-'ফাল্গুনী' পর্বটির আধ্যাত্মিক মণ্ডল থেকে মুক্ত হবার পর রবীন্দ্রনাথ এখন অনেক বেশি বস্তুজাগতিক স্পর্শের কাছাকাছি, নাটকের গানে এই রীতিবদলও হয়তো সেইটেই ধরিয়ে দেয়। এই সময়ের অন্তর্গত হলেও 'মুক্তধারা' এর একটা বড়ো ব্যতিক্রম (মূল পরিকল্পনায় নয়, ধনঞ্জয়ের গানে), তার মস্ত কারণ এই দেখি যে উক্ত নাটক অনেকটাই প্রভাবিত ছিল 'প্রায়শ্চিত্ত'র দ্বারা। অর্থাৎ এক নাটকের ভাবকল্পনাকে অন্য নাটকের রূপকল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চেয়েছেন লেখক, পরিণামে যা খুব তৃপ্তিজনক হয়নি। রণজিৎ কিছুমাত্র প্রতাপাদিত্য নন এবং অভিজিতের সঙ্গে উদয়াদিত্যের যে-সাদৃশ্য তা রবীন্দ্রসাহিত্যের এ-চরিত্রে ও-চরিত্রে প্রায়ই দেখা যাবে। অথচ মূল প্রেরণাগত পরিবর্তনের ফলে 'মুক্তধারা'য় চরিত্রগুলির আচরণ ও সংলাপে এমন একটা বিভোর গাঢ়তা আসে, ধনঞ্জয় এবং তার নাগরিক সম্প্রদায় যাকে অনেকটা নষ্ট ক্লান্ত করে দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গেই দেখি যে এই অংশগুলি প্রায় সমূলে নেওয়া হয়েছে এক নাটক থেকে অন্য নাটকে।

এক থেকে অন্য রচনায় এই দীর্ঘ প্রক্ষেপের শিল্পগত সংগতির প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও অন্য একটা গুরুতর সমস্যা এখানে ওঠে। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর এই মন্তব্য অত্যন্ত সংগত যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের গানগুলি ইমোশনাল এবং পরবর্তী গান ইস্‌থেটিক। বস্তুত, কবি নিজেই লক্ষ করেছিলেন এই ভিন্নতা। এরই সঙ্গে মিলিয়ে ভাবতে পারি তাঁর সেই কথা : 'পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন।' কেবল কাব্যগুলি কেন, এ-উক্তি সাধারণভাবেই তাঁর সমগ্র জীবন বিষয়ে প্রযোজ্য। ইমোশনাল আর ইস্‌থেটিকের এই পার্থক্যের মধ্য দিয়ে

তাঁর রচনার দুই যুগ প্রধানভাবে চিহ্নিত হতে পারে। 'বলাকা'র সময় থেকেই স্পষ্ট এই বিদারণরেখা।

এ যদি সত্যি হয় তো 'মুক্তধারা' কবির এই 'ইস্‌থেটিক' যুগের রচনা; রচনার অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যেও তার সমর্থন পাই। সেদিক থেকে 'শারদোৎসব' 'রাজা' বা 'ডাকঘর'-এর সঙ্গে 'মুক্তধারা' বা 'রক্তকরবী'র একটা বড়ো প্রভেদ আছে। এর প্রথম পর্যায়টির বিষয়ে বলা যায়, ইয়েট্‌সের ভাষায়: 'the meaning is less intellectual, more emotional and simple'। 'মুক্তধারা' বা 'রক্তকরবী' এমন ইমোশনাল বা সিম্পল নয় এবং ফলত তার গানের মধ্যে ভাব ও ভাষারূপ -গত একটা পরিবর্তন চোখে না-পড়ে পারে না, এগুলিকে ইন্দিরা দেবী নিশ্চয় ইস্‌থেটিক বলতেই পছন্দ করতেন।

কিন্তু মুশকিল এই যে 'মুক্তধারা'য় কোনো কোনো গান সম্পর্কে এই কথা সত্য হলেও তার অনেক গানই পুরোনো যুগের রচনা, তার মধ্যে ধনঞ্জয়ের পাঁচটি গান তো 'প্রায়শ্চিত্ত' থেকেই তুলে-আনা। 'মুক্তধারা'য় এই সংগীত ব্যবহারের দ্বারা আমরা বুঝতে পারি এই নাটকে শিল্পরূপের এক অন্তর্বিরোধ, যার ফলে সমস্ত শক্তি সত্ত্বেও এ-রচনার এক প্রচ্ছন্ন দুর্বলতা সব সময়ে পীড়াজনক লাগে। ধনঞ্জয়ের গানগুলির দ্বারা (এবং তার অস্তিত্বের দ্বারাও) এই নাটকে তৈরি হয়েছে দুই পৃথক তল, একটির সঙ্গে অন্যটি কিছু-বা বিরোধী সম্পর্কে যুক্ত।

৮

তাহলে এখন, মনে করা অসংগত নয় যে কখনো পরিবেশরচনার সার্থক ব্যবহার এবং কখনো-বা বিষয়নির্দেশের ঈষৎ প্রয়োজন ভিন্ন অন্য অনেক সময়েই রবীন্দ্রনাথের নাটকে গান একটা অলংকরণ মাত্র হয়ে ওঠে। সংস্করণের পরিবর্তনে বা অভিনয়ের প্রয়োগে গানগুলির যথেচ্ছ যোজনবর্জনেও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়। তার সঙ্গে আবার এ-ও দেখি যে একই গান হয়তো নাট্যরূপান্তরে গীত হচ্ছে অন্য চরিত্রের দ্বারা। 'ঋণশোধ'-এ শেখরের তিনটি গান 'শারদোৎসব'-এ শুনি সন্ন্যাসী আর ঠাকুর্দার মুখে; 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' 'অরূপরতন'-এ আছে সুরঙ্গমার গলায়, 'রাজা'তে এ-গান স্বয়ং রাজার!

অলংকার যে মাঝে পড়ে
মিলনেতে আড়াল করে,

তোমার কথা ঢাকে যে তার মুখর ঝংকার।

রবীন্দ্রনাটকে গানগুলি কখনো-বা শিল্পের লক্ষ্যভূমির সঙ্গে শিল্পের এই আড়াল তৈরি করে দেয়। এখানেও কি কবি ভাবছিলেন 'আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই নে তোমারে'? কিন্তু 'আমি' থেকে 'সুরে'র এই বিচ্ছেদ এখানে এত অনিবার্য ছিল কি? 'ডাকঘর'-এ এর সমন্বিত সুপ্রয়োগ কি দেখিনি আমরা? 'ডাকঘর'-এ কি কবিই সর্বাবয়বে সুরময় হয়ে উঠে এই আড়াল ভেঙে নিরলংকার হয়ে দাঁড়ান না?

আবার এমন ভাবাও অসংগত যে গানগুলির দ্বারা নাট্যরস কখনো ক্ষুণ্ণ হলেও তার দ্বারা সর্বাঙ্গীণ হয়েছে এর কাব্যসৌন্দর্য। মেটারলিঙ্ক প্রসঙ্গে এলিয়ট যেমন বলেছিলেন 'in failing to be dramatic (he) failed also to be poetic', তেমনি এখানে বলতে পারি আমরা, যে-সমস্ত অংশ এই রচনাবলিতে নাটক হিসেবে সুন্দর নয় তা কাব্য হিসেবেও ততটাই অগ্রাহ্য। কেননা কোনো রচনার মধ্যবর্তী অংশের বিচ্ছিন্ন কবিতা যদি আমাদের চোখে পড়ে তো তাকে ঠিক সেইভাবেই আমরা আস্বাদন করতে পারি না। আমরা অংশকে পাই না এবং সম্পূর্ণকে চাই। সন্দেহ নেই যে রবীন্দ্রনাথ এসব রচনায় ধরতে চেয়েছিলেন দেশীয় চিত্তের অনুকূল এক সাংগীতিক কাঠামো, কিন্তু দেখতে হবে যে সেটা শিল্প-অভিপ্রায় অতিক্রম করে মোহমাত্রে পর্যবসিত হলো কি না।

এই মোহরচনা রবীন্দ্রনাথের কাছে মূল ছিল না, কিন্তু ক্রমে তিনি তার বশে এসেছিলেন। আবার এর থেকে মুক্তিরও একটা ছোটো ইশারা মেলে 'মুক্তধারা'র পর। প্রহসন 'চিরকুমার সভা' এবং রূপক 'তাসের দেশ'-এর ব্যতিক্রম ছেড়ে দিলে পরবর্তী নাটকে গানের সংখ্যা বহুল পরিমাণেই কমে এল। 'মুক্তির উপায়'-এ দুটি, 'শোধবোধ'-এ তিনটি, 'বাঁশরী'তে পাঁচ, 'রক্তকরবী'তে আট, 'গৃহপ্রবেশ' 'শেষরক্ষা' এবং 'তপতী'তে গানের সংখ্যা নয়। 'নটীর পূজা' নাচ-গানেরই আলেখ্য, সেখানে গান বারোটি। এর সঙ্গে তুলনা করুন প্রাক্তন যুগ: 'প্রায়শ্চিত্ত'তে চব্বিশ, 'রাজা'য় ছাব্বিশ, 'অচলায়তন'-এ তেইশ আর 'ফাল্গুনী'তে গান আছে তিরিশটি!

উত্তর-'মুক্তধারা' যুগে গানের এই অপ্রতুলতা একেবারে নিষ্কারণ ছিল না। একদিকে যেমন এ-সময়ে তিনি অধ্যাত্ম-পক্ষপাত থেকে মুক্ত, অন্যদিকে তেমনি এর সমকালে ১৯২৩ সালে তৈরি হলো 'বসন্ত' পালানাট্য—না কি বলব পালা-গান। তারপর অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে আমরা পাই 'শেষ বর্ষণ' 'নবীন'

বা 'শ্রাবণগাথা'। এই রচনাগুলিতে কবি তাঁর গানকে ক্রমে একটা ব্যবহারিক মুক্তি দিতে পারলেন। যে-প্রমোদের প্রয়োজন অনেকসময়ে সংগীতকে নাটকের অন্তর্গত করে, তাকে তৃপ্ত করবার মতো অন্য এক আয়োজন দেখা দিল রবীন্দ্র-রচনার সমৃদ্ধ ভাণ্ডারে। ফলে, তাঁর জীবনের অবসানভাগে, 'বসন্ত' 'নবীন' প্রমুখ গীতিসম্ভার একদিকে গানকে নাটক থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত করে একটা গীতি-'প্রয়োগে' পরিণত করছে, অন্যদিকে নাচ-গান অভিনয় সহযোগে যে পূর্ণাঙ্গ নাটক রবীন্দ্রকল্পনার গভীর আদর্শে ধরা ছিল তার রূপ দেখা দিচ্ছে 'নটীর পূজা'র মধ্য দিয়ে তাঁর নৃত্যনাট্যাবলিতে। সংলাপের অন্তর্গত যে-সুরের ইঙ্গিত আমরা পুরোনো আলোচনায় লক্ষ করেছি, সেই-সুরকে গান এবং কথার মধ্যে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় তাঁর রচনা ছিল এতদিন যেন দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু এখন, জীবনের উপান্তে, সেই দ্বিধা দূর হলো, সম্পূর্ণ সুরারোপে, সম্পূর্ণ গীতিব্যবহারে। এবং তখন, যে-কথা আগে বলেছি, তাঁর নাটকের সংলাপ হলো সম্পূর্ণ গান আর সেই গানের অভিনয় হলো পূর্ণাঙ্গ নৃত্য। রবীন্দ্রনাটকে গান এতদিনে তার লক্ষ্যের সমুদ্রে পৌঁছল। কূল থেকে তাঁর গানের তরী ভেসে গেল।

১৯৬১

ঋতুমণ্ডল ও রক্তকরবী

সব পাঠকের কথা জানি না, কিন্তু আমার কাছে 'রক্তকরবী' নিয়ে আসে এক পূর্ণ জটিলতার, এক সম্পূর্ণতার বোধ। একে কি বলা যায় রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে নিবিড় নাটক? 'ডাকঘর' থাকতে তা কেমন করে হবে? এটি কি সবচেয়ে তীব্র, চাপাবিদ্যুতে ভরা? কেন, 'মুক্তধারা' নেই? এসব অর্থে কোনো শ্রেষ্ঠত্বের পদবী 'রক্তকরবী'র নয়। কিন্তু মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাটকের সব কিছুই এখানে ঘিরে উঠছে এক পরিণামী বৃত্তে। 'ডাকঘর'-এর সময় আর সুন্দর, 'শারদোৎসব-এর ছুটি আর কাজ, 'রাজা'র প্রেম আর ধ্যান, 'অচলায়তন'-এর মানুষ আর সমাজ, 'মুক্তধারা'র ইতিহাসবেষ্টিত সমকাল আর 'ফাল্গুনী'র জরামৃত্যুহীন মুক্ত চিরন্তন, যেন এসবেরই মিলিত সমবায় হয়ে আসে 'রক্তকরবী'। তাই আর এর কোনো সাময়িক বিভ্রম বা আকস্মিক স্খলন তেমন টুকরো করে চোখে লাগে না, সবসুদ্ধ মনে গড়ে ওঠে এক পরিণত ধারণার সংগঠন, এক সম্পূর্ণতার বোধ।

কোথায় এবং কীভাবে গড়ে উঠল এই [illegible]লন, তা অবশ্য স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। এখানে কেবল মনে রাখা ভালো যে এই মিলনেরই ফলে 'রক্তকরবী'র অন্তর্গত চরিত্রগুলি তার প্রকট উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করেও অনেক বড়ো হয়ে ওঠে, তাদের ঘ রে ধরে খোলা হাওয়ার পরিমণ্ডল। নন্দিনী বা রঞ্জনের মধ্য থেকে কোনো আনন্দ বা যৌবনের তত্ত্বভাবনা হয়তো পৌঁছয়, কিন্তু সে-ভাবনাকে ছাড়িয়ে যায় তাদের চারিত্রিক সত্তা, সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে তারা আপন জোরে, নন্দিনী হয়ে উঠতে পারে কোনো মানবীরই ছবি।

তত্ত্বের কথা থাক, আমরা আজ ভাবছি সেই চরিত্রগুলির কথা। নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় অবিকল মানুষেরই চেহারায়, এবং তখন, হঠাৎ, আমাদের মনে পড়তেও পারে যে আরো এক রকমের সম্পূর্ণতা জেগে উঠেছে এই নাটকের গোপন অভ্যন্তরে—সে কি ঋতুচক্রের পূর্ণতা? যদিও নাটকটির মূল পরিবেশ রচিত আছে শীতে, কেননা পৌষের গানে

এর সূচনা-শেষ বাঁধা, কিন্তু চরিত্রগুলি যেন নিজেদের মধ্যে ঘুরিয়ে নিয়ে আসে গ্রীষ্ম থেকে বসন্ত অবধি সবকটি ঋতুকে, যেন এদেরই মধ্যে ছোটোখাটো একটি প্রকৃতিভূমি রচিত হয়ে যায়, ব্যাপ্ত হয়ে যায় নাটকটির কালপরিমাপ।

নিহিত এই প্রাকৃতিক স্পন্দন লক্ষ করবার সময়ে এইটে অবশ্য ভুলব না যে এর মধ্যে ঋতুগত কোনো তত্ত্ব-আবিষ্কারের অভিপ্রায় নেই, এর দ্বারা রূপকী বা প্রতীকী কোনো নতুন তাৎপর্যের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে না, একেবারেই না। যেমন কোনো কোনো মানুষের সামনে দাঁড়ালে হয়তো-বা মনটা প্রসন্ন হয়ে ওঠে, কখনো-বা খোলা, কখনো-বা গাঢ়, অথবা কারো সামনে যেমন জলে ওঠে বিস্তীর্ণ দূরত্বের শুষ্কতা—এখানেও কেবল তাই। এই নাট্য-চরিত্রকটির সামনে এসে পাঠকের কিছু ব্যক্তিগত অনুভব জাগতে পারে হয়তো, আর সেই অনুভব এখানে আসছে ঋতুর ছবিতে।

যেমন, নাটকের শুরুতেই যখন ছুটে আসে কিশোর তার খুশিভরা বালকের গলা নিয়ে, নাটকটি শুরু হয় সকালবেলার তরুণ রৌদ্রধারায়, অমনি মনে ভেসে আসে যেন শরতের ছুটি। কিশোর, জীবনের কোনো কঠিন দায় যেন সে জানে না এখনো, কিন্তু তবু সে জীবনের খুব ভিতর ঘিরেই ঘুরে বেড়ায় হালকা মেঘের মতো, শাস্তিকেও সে করে নেয় আনন্দের সঙ্গী। 'জানতে পারলে যে ওরা শাস্তি দেবে' নন্দিনীর এ-সতর্কতায় ভালোমন্দ কোনো উত্তর করে না সে, কেবল 'একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেব' এই কথা কতবার মনে মনে ভাবে। প্রাণ দেবার এই ইচ্ছে কিন্তু তার ওপর বা পাঠকের ওপর কোনো আতুর চাপ তৈরি করে না : যেমন অবোধ আনন্দে সে বলে যায়, আমরাও তেমনি শুনে যাই স্নেহময় কৌতুকে ; জীবনকে আমরা দেখতে পাই এক ছুটির হাওয়ার মাঝখানে, যেমন কাজ-পালানো ছুটি খোঁজে কিশোর নিজেও।

ছুটির সূত্রেই লেখা হয়েছিল আরো একটি নাটক, 'শারদোৎসব'। সে-নাটকের অভিনয়কালীন ভূমিকায় মন্ত্রীর মুখে জানিয়েছিলেন কবি : 'সে-পালায় কাজের কথা নেই, সে-পালায় আছে ছুটির খুশি'। কিন্তু এই ছুটির খুশিরও কেন্দ্রে আছে আরেক কিশোর, যার নাম উপনন্দ। কিশোর রক্তকরবী খুঁজে বেড়ায়, তুলে নেয় শাস্তি নেবার দায়, কেননা নন্দিনীর আবির্ভাবেই যে আনন্দ তার ঋণ তো তাকে শোধ করতে হবে। উপনন্দেরও তেমনি আছে ঋণশোধের ভূমিকা, সে পঙ্ক্তির পর পঙ্ক্তি লিখে ছুটির পর ছুটি পেয়ে যায় : কিন্তু কেন

উপনন্দের চারদিকে ছেয়ে আছে শরৎ-প্রকৃতি, আক্ষরিক অর্থে? যে-কোনো নিসর্গপটই কি হতে পারত এর উপযুক্ত আবহ? মনে হয় না। মন্ত্রী জানিয়েছিলেন : 'শরৎকালের মেঘ যে হালকা, তার কোনো প্রয়োজন নেই, তার জলভার নেই, সে নিঃসম্বল সন্ন্যাসী'! 'শরৎকালের শিউলিফুলের মধ্যে যেন কোনো আসক্তি নেই, যেমন সে ফোটে তেমনি সে ঝরে পড়ে!' শারদীয় এই স্বভাবখানি চলে আসে উপনন্দের অন্তঃপ্রকৃতিতে আর কিশোরের সমগ্র চারিত্রে। ওই কথাগুলি কি কিশোর বিষয়েও বলা যায় না খুব সহজেই? সেই তো একই জলভারহীন নিঃসম্বল নিষ্প্রয়োজন লঘু বিচরণ, একই আসক্তিহীন ফুটে-ওঠা আর ঝরে-যাওয়া। ফুটেই তো উঠেছিল সে নন্দিনীর সামনে এসে আর খুব অগোচরে আপন-খুশিতে একসময়ে ঝরেও গিয়েছে রাজার জালাবরণের অন্ধকারে।

তখন মনে হয়, এ খুব আকস্মিক নয় যে রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় শরৎ এসেছিল শিশুর মূর্তি নিয়ে। 'আমাদের শরতের নীল চোখের পাতা দেউলে-হওয়া যৌবনের চোখের জলে ভিজিয়া ওঠে নাই। আমার কাছে আমাদের শরৎ শিশুর মূর্তি ধরিয়া আসে। সে একেবারে নবীন।' এই শরতের রঙে তিনি দেখেন কোমলতার রঙ, প্রাণের রঙ এবং 'প্রাণ জিনিসটা অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতার ব্যঞ্জনা।' কিশোরের সেই ব্যঞ্জনাময় শিশুমূর্তি 'রক্তকরবী' নাটকের সূচনাপর্বকে ভারি একটি মায়া-মাধুর্যে মণ্ডিত করে দিয়ে যায়।

কিন্তু তারই পরে পট ঘুরে যায় একেবারে বিপরীতের টানে। যেমন ছিল খোলাখুশির হাওয়া, বস্তুতত্ত্ববাগীশ অধ্যাপকের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তেমনি নেমে এল একখানা ভারি পর্দা, খুবই মাটির কাছাকাছি নিয়ে এল আমাদের। 'বস্তু-তত্ত্ব-বাগীশ' শব্দটি অবশ্য জেনেছি অনেক পরে, কিন্তু এই তার চরিত্ররূপটি চিনে নিতে অল্পমাত্রও দেরি হয় না। দু-তিনটি কথার পরেই তাঁকে বলতে শুনি : 'পৃথিবীর বুক চিরে দরকারের-বোঝা-মাথায় কীটের মতো সুড়ঙ্গর ভিতর থেকে উপরে উঠে আসছে।' কিশোরের কথাতেও ছিল মাটির থেকে বেরিয়ে আসার এক ছবি, কিন্তু কত পৃথক, সে তো রক্তকরবীর গাছ। আর এখানে এল সোনা-মাথায় কীটের মতো মানুষগুলি, যার তত্ত্বকথা বুঝিয়ে বলতে অধ্যাপকের আনন্দ। নন্দিনীকে তিনি জানাতে চান তত্ত্ব, জানতে চান তিনি নন্দিনীর তত্ত্ব, তা নইলে তিনি চলতে পারেন না এক পা। এই জড়িমাজড়িতপদ মূর্তিটি পাঠকমনে ফুটিয়ে তোলে ভারাক্রান্ত এক বুড়ো ভঙ্গি। অনেকসময়ে এই ছবিরই সঙ্গে মনে পড়ে

'ফাল্গুনী' নাটকের বিশ্বহিতার্থী দাদাটির কথা, যে-দাদার বিশ্বাস নেই বাইরের হাওয়ায়, যে কেবল খুঁজে বেড়ায় সারালো পদার্থ। খেলার চেয়ে কাজ তার কাছে অনেক বড়ো। 'ফাল্গুনী'তে যে এ-চরিত্রটিকে প্রবীণরূপে চিহ্নিত করা আছে সেটা নিষ্কারণ নয়। 'বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলছে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা' দেখাবার জন্য ঋতুতে-চরিত্রে একটি সমতা-বিধানেরও চেষ্টা আছে এই নাটকে। জীবনসর্দার ক্ষণিকের জন্য বুড়োর মূর্তি ধরেছিল, কিন্তু শেষে খসে গেল তার ছদ্মবেশ, অনুগামী যৌবনের দল জানতে পারল যে সে 'বারে বারেই প্রথম, ফিরে ফিরেই প্রথম'। কিন্তু যেসব দেহে বৃদ্ধের এই ছদ্মবেশ আর ছদ্ম থাকে না, মুখের সঙ্গে এঁটে যায় চিরকালের জন্য, তাদের কী হবে? হয়তো তাদেরও মুক্তি আছে দূর পাল্লার পথে, দাদাও অবশেষে আশ্বাস পায় যে তার চৌপদীকে রাঙিয়ে দেওয়া হবে, পণ্ডিত তাকে বলবে অর্বাচীন, ঘরের লোকে বলবে অনাবশ্যক, বাইরের লোকে বলবে অদ্ভুত। 'রক্তকরবী'রও পরিণামে 'এইবারই পাওয়া যাবে, আর এড়িয়ে যেতে পারবে না, তাকে ধরব' বলে যখন অধ্যাপক নন্দিনীর অনুসরণ করতে পারলেন, তখনই তাঁর ভাগ্যে ফিরে আসে ছদ্মসাজমোচনের এই আশীর্বাদ। মাত্র তখনই তাঁর চরিত্র থেকে শীতবুড়োটা তার প্রভাব সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

এতক্ষণে আমরা কথাটিতে পৌঁছে গেছি। অধ্যাপকের চরিত্র তাহলে সঙ্গে নিয়ে আসে শীতের জড়িমা, শীতের ভার। কেবল যে শীতের জড়োসড়ো গুটোনো ছবিটি থেকেই এ-সাদৃশ্য মনে আসে তা নয়, কেবল এইজন্যও নয় যে শীত আর বুড়ো কথাদুটিকে সমাসে বেঁধে নিয়েছেন 'ফাল্গুনী'র লেখক। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে পড়ে যে ঋতুচরিত্র বিচারকালেও এসব কথাই মনে এসেছিল কবির: 'ঋতুতে ঋতুতে যে ভেদ সে কেবল বর্ণের ভেদ নহে, বৃত্তিরও ভেদ বটে।··· ফাল্গুনের শ্যামলতায় বৃদ্ধ পৌষ আপনার পীত রেখা পুনরায় চালাইবার চেষ্টা করে···।' অথবা বলেন: 'শীতটা বৈশ্য। তাহার পাকা-ধান কাটাইমাড়াইয়ের আয়োজনে চারিটি প্রহর ব্যস্ত; কলাই যব ছোলার প্রচুর আশ্বাসে ধরণীর ডালা পরিপূর্ণ।' প্রয়োজনের ফসলসম্ভারে পরিপূর্ণ এই ব্যস্ততা বস্তুতত্ত্ববাগীশ অধ্যাপকেরও বৈশ্য ধর্ম, তাই শীতের মুদ্রা চিহ্নিত হয়ে যায় তাঁর মুখে।

জড়তা আর আপাতজড়িমা অবশ্য এক নয়, যেমন এক নয় শীত আর হেমন্ত। প্রকৃতিপর্যটক রবীন্দ্রনাথ হেমন্তের ছবি কমই দেখেন, বাংলা কবিতায় জীবনা-

নন্দের আগে তেমন করে আমরা জানতে পারিনি এই ঋতুকে। কিন্তু হেমন্ত বিষয়ে রবীন্দ্রবোধ হয়তো চিনে নেওয়া যায় একটু পরোক্ষে, যখন তিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্য শরতের মধ্যে তুলনার রেখা টানেন। যে-শরৎ পশ্চিমের, সে আছে যৌবন আর মরণের মাঝখানে। ইংরেজ কবির উচ্চারণে রবীন্দ্রনাথ সেই শরৎকে জানান: 'তোমার ওই কুঞ্জবনের ভাঙা হাট, তোমার ওই ভিজা পাতার বিবাগি হইয়া বাহির হওয়া। যা অতীত এবং যা আগামী তাদের বিষণ্ণ বাসরশয্যা তুমি রচিয়াছ। যা-কিছু ম্রিয়মাণ তুমি তাদেরই বাণী, যত-কিছু গতস্য শোচনা তুমি তারই অধিদেবতা।'

এই পশ্চিমি শরতেরই তো আরেক নাম হেমন্ত! অতীত-আগামীর বিষণ্ণ এই বাসরশয্যার পটখানি পেয়েছিলেন বলেই কি জীবনানন্দেরও সমর্পণ ছিল এই ঋতুতে? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে, এ তো বিশুরও কথা, বিশুরও বেদনা। 'রক্তকরবী' নাটকে বিশুই কি বহন করে আনছে না হেমন্তের 'ভিজা পাতার বিবাগি হইয়া বাহির হওয়া' ছবি? হেমন্তের একটি গানে যে-কথা লিখেছিলেন কবি, অন্যভাবে তা কি বিশুরই উদ্দেশে নিবেদিত হতে পারে না: 'হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা'? যেন তাকে সবটা দেখা যায় না, জানা যায় না, তাই 'আপনাকে এই কেমন তোমার গোপন করে রাখা'।

বিশুর গোপন জীবনকে প্রগাঢ় করে রেখেছিল শোচনাময় এক বিগত দিনের স্মৃতি। ওরই ছায়ার টানে তার বর্তমানকেও মনে হয় ম্রিয়মাণ, বোঝা যায় কেন সে নিজেকে বলে অমাবস্যা, রঞ্জনের ওপিঠ। কিন্তু এই ম্রিয়মাণ ব্যথার ভার কি জীবনকে শেখায় না কিছু, জীবন কি হাত পাতে কেবল যৌবনেরই উদ্দাম বসন্তী রঙ্গলীলায়? অন্তশ্চারিত্রে এক নিবিড় দুঃখের উপলব্ধি জীবনকে টেনে নিয়ে যায় রহস্যনিহিত গুহায়, 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'র মন্ত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই যে-গুহা দেখতে দেন না, যা জানে হেমন্ত। কিন্তু এই নাটকে একবার অন্তত নন্দিনী বলে উঠেছিল 'যে দুঃখটির গান তুমি গাও, আগে আমি তার খবর পাই নি'। না, রঞ্জনও তাকে দেয়নি সে খবর। দুঃখময় অমাবস্যার এই খবরটি জীবনের পক্ষে অসীম মূল্যময় বলেই 'ক্লান্ত রাত্তিরটারই ঝেঁটিয়ে-ফেলা উচ্ছিষ্ট' কোনো সকালেও বিশুকে আমরা ছাড়তে পারি না। তার গতস্য শোচনাকে নাস্তি বলে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে না, কেননা সে যে চোখের জলের জোয়ার জানে তাতে ম্রিয়মাণ ভূমিকা থেকে গূঢ় মুক্তিরও নিশানা পাওয়া যায়, অতীত এবং আগামীর এক বিষণ্ণ বাসরশয্যা হিসেবে তাকে আমরা দেখতে পাই। এই

নাটকে একসময়ে যখন সে বলে 'তোর সেই কিছু-না-দেওয়া আমি ললাটে পরে চলে যাব' তখন যে কেবল সে নিজেই এগিয়ে যায় ভবিষ্যতের দিকে তা নয়, নন্দিনীকেও এগিয়ে দেয় কোনো ভাবী মুহূর্তে। তাই তার আপাতনিষ্ক্রিয়তা শেষ পর্যন্ত ভরে ওঠে ফসলে। নাট্যপরিণামে তাকে লক্ষ করে ইংরেজ কবির হেমন্তবন্দনার মতো আমরাও বলতে পারি: 'তোমার বিনাশের শ্রী, তোমার সৌন্দর্যের বেদনা ক্রমে সুতীব্র হইয়া উঠিল, হে বিলীয়মান মহিমার প্রতিরূপ।'

শ্রীমণ্ডিত এই আত্মবিনাশের পাশাপাশি রাখা যাক ধ্বংসের লেলিহান লীলা। রসলেশহীন শুষ্কতা, দিগন্তবিসারী রুক্ষ প্রান্তর। এই হলো অগ্নিময় গ্রীষ্মের রূপ। সে ভয়াবহ বটে, অন্তরঙ্গ নিভৃতে সে টানে না আমাদের, কিন্তু ওরই সঙ্গে সে যে তার পিঙ্গল জটা নিয়ে এক মহিমান্বিত রূপও গড়ে তোলে, তাও ঠিক।

'রক্তকরবী'র কেন্দ্রে আছে দাম্ভিক পৌরুষে দগ্ধ এই বিরাট চরিত্র, রাজা। রবীন্দ্রনাথের ঋতুবর্ণনামতো তাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না বটে, তার আগুন তপস্যার আগুন নয়, তার উদ্যম নিবৃত্তির উদ্যম নয়,—কিন্তু এই বর্ণনা তো প্রকারান্তরে রাজারই বর্ণনা যখন গ্রীষ্ম প্রসঙ্গে লেখেন তিনি: 'কখনো বা সে নিশ্বাস ধারণ করিয়া রাখে, তখন গুমটে গাছের পাতা নড়ে না: আবার যখন সে রুদ্ধ নিশ্বাস ছাড়িয়া দেয় তখন পৃথিবী কাঁপিয়া ওঠে।'

'জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার/লোলুপ চিতাগ্নিশিখা লেহি' লেহি' বিরাট অম্বর'; অহংবৃত্তে বন্দী রাজার রাজকীয় মহিমাকে ঘিরে আছে এই বিরাট অম্বরের মহাশূন্যতা। রাজার প্রথম আবির্ভাব থেকেই তার স্বভাবে দুটি বিষয় প্রত্যক্ষ হয়ে আসে: তার লুব্ধজটিল একাকী পৌরুষ এবং দুর্বহ সেই একাকিত্ব থেকে মুক্তির জন্য তার অসহায় তৃষ্ণা। তাই যে-সব প্রতিমা ব্যবহৃত হয় তার সংলাপে, পর্বতের চূড়া বা মধ্যাহ্নসূর্য বা প্রকাণ্ড মরুভূমি, তার মধ্যে দেখা দেয় এই একাকী আর অসহায় আর বিরাটের এক জটিল ছবি। জলহীন গ্রীষ্মের উষর দাহনের সঙ্গে নিজেকে কেবলই মিলিয়ে ভাবে রাজা, যখন সে বলে 'আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি, তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে…।'

তবু রাজা ছুঁতে পারে না সেই হৃদয়, সবুজ ঘাস—গ্রীষ্ম যেমন পায় না স্নিগ্ধতাময়

জলের আশীর্বাদ! সবুজের আশীর্বাদ জানে গ্রীষ্ম নয়, বসন্ত—রাজা নয়, রঞ্জন। রঞ্জন যে চঞ্চল অদ্ভুত নতুন যৌবনের দূত, সে কি আর বলবার অপেক্ষা রাখে! রঞ্জনকে আমরা সামনে দেখি না নাটকে, তার চরিত্রের সমস্ত রঙ্গ আমাদের মনে গেঁথে যায় কেবল নন্দিনী রাজা বিশু বা শ্রমিকদের বিবরণ আর প্রতিক্রিয়া থেকে। 'যে পথে বসন্ত আসবার খবর আসে' নন্দিনী তাকেই জানে রঞ্জনের পথ, সে কি কেবল প্রণয়ী বলেই? 'প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে সে হারজিতের খেলা খেলে' এ-ও কি কেবল প্রণয়িনীর মুগ্ধতা? কিন্তু শ্রমিকেরা যখন বলে সে ভেলকি জানে অথবা সর্দারেরা যখন টের পায় সে এসেছে নির্বোধের মুখোশ খসাতে, যখন তার চালনায় তালে তালে কোদাল পড়তে থাকে এবং যখন দেখি সে কেমন করে শেকল থেকে পিছলে বেরিয়ে যায়, তখন মনের মধ্যে জেগে ওঠে সোনার-হরিণ খুঁজতে-চাওয়া বসন্তেরই ভঙ্গি: 'আছি সুখে হাস্যমুখে দুঃখ আমার নাই'। 'রাজা' নাটক থেকে ঠাকুর্দার তাইরে-নাইরে-না গানের আবহ ভেসে আসে এই চরিত্রের পটে 'যখন দ্বারে আসে মরণবুড়ি/মুখে তাহার বাজাই তুড়ি'। কেমন করে সম্ভব হয় এই বাজানো? 'বসন্তরাজ এসেছে আজ/বাইরে তাহার উজ্জ্বল সাজ'ওরে অন্তরে তার বৈরাগী গায়/তাইরে নাইরে নাইরে না!'

আর এই সমস্ত চরিত্রকে ঘিরে রাখে—কিংবা বলা যাক এই সমস্ত ঋতুকে ঘিরে রাখে নন্দিনী: স্নেহভারনত, মায়াভারানত, জলভারনত। কিশোর তার কাছে কী পেল, এই তার আক্ষেপ। বিশুকে সে পারেনি কিছু দিতে, এই তার আক্ষেপ। রাজাও যে তাকে অবাধে ঢুকতে দেয়নি ঘরে অথবা অধ্যাপকের যে জাল খুলে যায়নি, এ-ও কি তার আক্ষেপ নয়? অথচ এ-আক্ষেপ কতই অর্থহীন। বসন্তের মতো সে তো আপন খুশিতে ঝলমলিয়ে চলে যায় না, সে যে নিবিড়ভাবে থেমে থেমে দাঁড়ায়, সবার প্রতি অবনতমুখী। কেবল যে বিশুই তার কিছু-না-দেওয়া ললাটে পরে চলে যাবে তা নয়, সব চরিত্রই ভিতরে ভিতরে ক্রমে ভরে উঠছে শস্যসম্ভাবনায়, সকলেই তার কাছে শেষ অবধি পেয়ে যায় দু-হাত-ভরা তৃষ্ণার জল। সকলকে সে ফলিয়ে তুলছে উজ্জীবনের সার্থকতায় তার নারীসত্তার মহিমা দিয়ে।

হয়তো এই নারীসত্তায় খুব প্রত্যক্ষতার মধ্যে ধরা দেয় না বর্ষাপ্রকৃতি, তবু এ পরিপূর্ণতা কি সজল বর্ষারই অভিভাব নয়? মনে করিয়ে দিতে চাই আরো কিছু প্রতিমার ব্যবহার: রাজার সঞ্চয়সরোবরের পাথরটাতে চাড় লাগে

শঙ্খিনী নদীর জলের বেগে; বিশুর তাকে মনে হয় তৃষ্ণার জল; রাজা দেখেছিলেন তার কালো চুলে মৃত্যুর ঝরনা। এইসব জলের ছবি কখনো ঘুরে যায় মেঘের ঘনতায়, অধ্যাপক তার কপোলে রক্তকরবীর গুচ্ছে দেখেন প্রলয়গোধূলির মেঘ এবং যেন সেই ভাবীকথনকে সত্য করে একবার বলে ওঠে নন্দিনী: বিদ্যুৎশিখার হাত দিয়ে ইন্দ্র তার বজ্র পাঠিয়ে দেন। একদিকে জলের আহ্বান স্নিগ্ধ মৃদুতায়। অন্যদিকে তারই বজ্রপরিণাম, ধ্বংসের দিকে। নারীর এই দুই রূপ।

'ছিন্নপত্র'র একটি চিঠিতে কবি জলকে দেখেছিলেন নারীরই মতো। আবার হৃদয় বিষয়ে 'আষাঢ়' প্রবন্ধে তিনি জানাচ্ছেন 'আমাদের প্রকৃতির মধ্যে সে যে স্ত্রীজাতীয় তাহাতে সন্দেহ নাই।' আর বর্ষা ঋতু তো রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় হৃদয়েরই ঋতু। মানুষের চারদিকে যে বিশাল অবকাশের বায়ুমণ্ডল আছে, সেখানেই হৃদয়ের জগৎ; সে-জগৎ কোনো প্রয়োজনের ভারে নিজেকে বাঁধা রাখে না। সে সৌন্দর্যের গৌরব নিয়ে চলে যেতে চায় পৃথিবীর বুকের মাঝখানে, কিন্তু গণ্ডিতে বাঁধা পৃথিবী তো তাকে বুঝে না নিয়ে ছাড়ে না, তাকে উল্টেপাল্টে শেষে চুরমার করে নিতে চায়। কিন্তু যেখানে ফুটে ওঠে ওই মায়ামণ্ডল, সে জানে কোথায় তার জয়। সেই অনতিব্যক্ত প্রচ্ছন্ন জয়ের দিকে আমাদের নিরন্তর আকর্ষণ করে নিচ্ছে আমাদেরই হৃদয়, বর্ষা, নন্দিনী।

তাই 'রক্তকরবী' যখন পড়ি তখন রাজা নন্দিনী কিশোর বিশু অধ্যাপক আর রঞ্জনের চারিত্রবিভা ভাবলেই মনে ভেসে আসে চিরাবর্তনময় ঋতুমণ্ডল, গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত আর বসন্তের খেলা। এর পটভূমিতে আছে শীতঋতু, কিন্তু তার চারদিকে বেষ্টন করে ধরে যেন আরো এক সামগ্রিক সময়। 'শারদোৎসব'-এর কাল থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিমানুষে সহজ চলাচলের যে-সম্ভাবনা ভাবছিলেন, এইখানে এসে যেন তার এক পরমার্থ অর্জিত হলো। এইভাবে, নাটকের ভিতরদিকের সেই অদৃশ্য ঋতুমণ্ডলের পটের ওপর সাজিয়ে দেখলে, মানবসংঘাতের এই কাহিনীটি খুব একটা স্বতন্ত্র মাত্রা পেয়ে যায়।

১৯৬৬

তর্কে অথবা তত্ত্বে যেন অনেকটা অস্ফুট হয়ে আসে আমাদের জীবন, সহজ সম্পর্কের মাঝখানে একটা বাধা তৈরি হয় যেন। তেমন-কোনো তর্কের মধ্য দিয়ে নয়, সমগ্র সত্তার মধ্য দিয়ে জীবনকে পেতে চান একজন কবি, এ বিশ্বকে তিনি দেখতে চান তার সমগ্র স্বরূপে। এমন কবিস্বভাবের কয়েকটি মানুষকে প্রায়ই আমরা দেখতে পাব রবীন্দ্রনাথের নাটকে। কবি বলে তাদের কোনো পরিচয় দেওয়া হয়নি অবশ্য, তাদের পরিচয় আছে কেবল তাদের বেদনার গাঢ়তায়, তাদের অনুভবের সত্যে। বরং কবি নাম দিয়ে যে-কয়েকটি চরিত্র তিনি তৈরি করেন অনেকসময়ে, তারাই দাঁড়িয়ে থাকে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দূরে, কিছুটা যেন সাজানো কথার অলীক ভঙ্গি নিয়ে, যেমন 'ফাল্গুনী'র সূচনায় কবিশেখর কিংবা 'ঋণশোধ'-এর শেখর কবি। অথবা তাঁর নাটকে কখনো আমরা পাই কিছু দার্শনিককে, যাঁরা সুন্দরের ব্যাখ্যা করেন। সে-ব্যাখ্যাও সুন্দর বেশ, তবু তা সৌন্দর্যকে একেবারে আমাদের বুকের মধ্যে পৌঁছে দেয় না। 'শারদোৎসব'-এর সন্ন্যাসী তেমনি এক দার্শনিক। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সন্ন্যাসী কিংবা 'রাজা'র ঠাকুর্দা কিংবা 'মুক্তধারা'র ধনঞ্জয়কেও আমরা ভাবতে পারি ওই একই গোত্রে। জীবনকে বুঝতে চান তাঁরা, সুন্দরকে তাঁরা ধরতে চান, তাঁদের ভাবনা দিয়ে। কিন্তু সবকটা ইন্দ্রিয়কে খুলে ধরে অনায়াসে সুন্দরের কাছে নিয়ে যায় যারা, রবীন্দ্রনাথের নাটকে তেমন কবিস্বভাব নিয়ে আসে অন্য কয়েকটি মানুষ। আমাদের প্রিয় তেমনি কয়েকটি মানুষ হলো যতীন অভিজিৎ জয়সিংহ আর—ছোটো, কিন্তু সেই সবচেয়ে বড়ো—'ডাকঘর'-এর অমল।

এই এক আশ্চর্য বিরোধ আমাদের জীবনে: প্রাত্যহিকের মধ্যে অত্যন্ত অভ্যস্ত বলেই প্রত্যহকে আমরা দেখতে পাই না আর। কেন পাই না? আমরা ভুলে যাই যে ভালোবাসার মধ্যে আছে একই সঙ্গে একটা লিপ্ততা আর ঔদাসীন্য, আসক্তি আর নিরাসক্তি। আমরা ভুলভাবে লিপ্ত, ভুলভাবে আসক্ত।

নিরাসক্তির ঈষৎ দূরত্ব নিয়ে জীবনের দিকে তাকালে তবেই তাকে পাওয়া যায় একেবারে নিজের মতো করে। কেবলমাত্র তখনই কারো মনে হতে পারে :

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড়ো ফিরে ফিরে।

অথবা, আরেক দেশের কবি এমিলি ডিকিনসন যেমন লিখেছিলেন :

It struck me – every Day –
The Lightning was as new
As if the Cloud that instant slit
And let the Fire through !

'গৃহপ্রবেশ'-এর যতীনও ও-রকম ভাবেই দেখতে পেয়েছিল 'জীবনের ফাঁকে ফাঁকে' স্বর্গের আলো। ঝাউগাছের ঝরঝর শব্দ, নদীতে জোয়ার, দূরে বউ-কথা-কও পাখির ডাক তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল আর-জন্মের কথা। নীল পাহাড়ের উপর মূর্ছিত গোধূলির আলোয় চোখ ভরে গিয়েছিল অভিজিতের, বুকভরা শ্বাস নিয়ে সে বলে উঠেছিল 'সুন্দর এই পৃথিবী'। ঠিক এই উচ্চারণটিই জয়সিংহের মুখে আমরা শুনেছিলাম অনেকদিন আগে : 'সুন্দর জগৎ!' কিন্তু সেখানে, জয়সিংহ তাঁর বেদনাকে আরো ব্যাপ্ত করে ধরেছিল তার সংঘর্ষের ছবিটিকে সাজিয়ে তুলে, তার সংশয়ের আকুলতায়। 'এ সুন্দরী সুখময়ী ধরণী'র কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে যে দেবীর দিকে চেয়ে আছে সে, কোথায় সেই দেবী? যতীনও বলেছিল, আমাদের মনে পড়ে, 'সমস্ত জীবন হাত জোড় করে অপেক্ষাই করলুম।' তবু এই অপেক্ষা অথবা সংশয় একেবারে অধ্রুব নয়, এই অপেক্ষাই সুন্দরকে নিয়ে আসে তার অন্তরতম সত্যে, অমলের অপেক্ষা যেমন সৌন্দর্যে ভরে তোলে তার চারপাশের সমস্ত জীবনকে।

এই যে চরিত্রগুলি, এদের একটা সাধারণ মিল এই দেখি যে সকলেই এরা পরিচয়হীন, পিতৃমাতৃহারা। গ্রাম-সম্পর্কের একটা ক্ষীণ সূত্র ধরে অমলকে এনেছিলেন তার পিসিমা, অভিজিৎকে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল ঝরনাতলায়, জয়সিংহও রঘুপতির পালন পেয়েছিল মাত্র, আর যতীনকে দেখতে পাই তার মাসির শুশ্রূষায়। এরই সঙ্গে আমাদের মনে পড়তে পারে রবীন্দ্রনাথের গল্পের কয়েকটি ছেলেকে, যারা অসংসারী ডানা নিয়ে সংসারের মাঝখানে এসে পৌঁছয় অল্প কদিনের জন্য, অতিথি বা আপদ হয়ে। বারবার যখন ফিরে আসে চরিত্রায়ণের

এই একই ধরন, তখন বোঝা যায় যে কোনো-একটা ভাবনা নিশ্চয় কথা বলতে চাইছে এর মধ্যে। অল্প আগে বলেছি যে ভালোবাসায় একই সঙ্গে কাজ করে আসক্তি আর নিরাসক্তির টান। দৈনন্দিনের একটা ক্লীব আবর্ত আছে, সে আমাদের জড়িয়ে ফেলতে চায় গ্লানির পাকে, এর থেকে দূরে দাঁড়াবার মতো একটা আসক্তিহীনতার খুব দরকার। আর সেইখানে দাঁড়াতে পারলে তবেই জীবনের প্রতিটি বিন্দুর জন্য মায়ায় ভরে ওঠে মন, এই এক রহস্য। রবীন্দ্রনাথ কি সেইজন্যেই সম্পর্কহীন করে রাখেন তাঁর এই কবিচরিত্রগুলিকে? বিভূতি-ভূষণও যেমন করেছিলেন অনেকসময়ে? তখন তারা সংসার থেকে অল্প আলগা হয়ে দাঁড়াতে পারে হয়তো, জীবনের একটা দিক থাকে খোলা, আর সেই খোলা পথেই সংসারকে তারা দেখতে পায় তার সমগ্র স্বরূপে, তার বেদনাময় সৌন্দর্যে —এই হয়তো বলবার ছিল কবির।

লিপ্ত হয়ে থাকার মধ্যেই এই নির্লিপ্ততা থেকে যায় বলে সুন্দরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বিষাদ। আমাদের পূরবীতে কিংবা টোড়িতে সমস্ত বিশাল জগতের হাহাধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন 'ছিন্নপত্র'র কবি, কিংবা এই অপরিতৃপ্ত জীবনের জন্য প্রকৃতির উপর আজন্মকালের অভিমান জেগেছিল তাঁর, অনন্ত-প্রসারিত প্রকাণ্ড উদাসীন প্রকৃতির মুখেও তিনি দেখতে পেয়েছিলেন 'সুগভীর এক বিষণ্নতা'। 'ছিন্নপত্র'র চিঠিগুলির মধ্যে সৌন্দর্য যেমন বিষাদমথিত বলেই আমাদের আরো তীব্র মুঠিতে চেপে ধরে, যতীন অভিজিৎ জয়সিংহ বা অমলও তেমনি সুন্দরকে আমাদের চোখের সামনে নিয়ে আসে এক বিষাদবলয়ে ঘিরে। 'আমারও বুক কান্নায় ভরে রয়েছে': এতটাই খুলে বলেছিল অভিজিৎ। কিন্তু যারা খুলে বলেনি তাদের প্রচ্ছন্ন কান্নাটা আমরা শুনতে পাই এইসব সংলাপে: যতীন যখন জানায় যে 'সুখ জিনিসটি ঐ তারাগুলির মতো অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেয়' অথবা জয়সিংহের 'মরণ যে/এত মধুরতাময়, আগে হতে পাব/তার স্বাদ' অথবা যখন অমল বলে যে সে কেবলই কাজ খুঁজে বেড়াবে, 'খুঁজে যদি না পাই তো আবার খুঁজব।'

এ বিষাদ কিসের বিষাদ? মৃত্যুর? মৃত্যু একটা উপলক্ষ মাত্র। এটা ঠিকই যে এই চরিত্রগুলির অন্য একটা সাধারণ লক্ষণ হলো মৃত্যুর আসন্নতা। যতীন আর অমলকে আমরা দেখতে পাব মৃত্যুশয্যাতেই, জয়সিংহ আর অভিজিৎ নিজেদের ইচ্ছেয় এগিয়ে চলেছে অবসানের দিকে। এইসব আসন্নতা যেন অভিমানের এক স্বচ্ছ পর্দা তৈরি করে রেখেছে চরিত্রগুলির চলায় বলায়।

আর এও হয়তো বলা যায়, সেই ডিকিনসনেরই ভাষায়, Death sets a Thing significant/The Eye had hurried by—যাবার সময়েই আরো বেশি করে বেজে ওঠে থাকার টান, কোনো কিছুই তখন আর এড়িয়ে যায় না চোখ থেকে। কেবল এইটুকুই নয়, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েই নিজের জীবনের সঙ্গে গোটা জীবনের সম্পর্ক ঝিলিক দিয়ে যায় একবার, মৃত্যুর মুহূর্তই হলো সময়ের মধ্যে নিঃসময়কে চিনে নেবার চূড়ান্ত মুহূর্ত।

তাই এ বিষাদ, বস্তুত, সময়বোধের বিষাদ। মুহূর্তগুলিকে অসাড় অভ্যস্ততায় দেখে যায় যে, সে দিনযাপন করতে পারে অগভীর শান্তি নিয়ে। কিন্তু 'কবি-কাহিনী'র কবির মতো যে দেখেছে :

আমার হৃদয়ে
দুর্দান্ত সময়স্রোত অবিরামগতি
নূতন গড়েনি কিছু, ভাঙেনি পুরানো—

কিংবা জীবনানন্দের কোনো চরিত্রের মতো যে জেনেছে 'সেকালের একালের সব সময়ের সমস্ত ইতিহাসই এক-সাময়িক', তার অনুভব সঙ্গে সঙ্গে সকলের চেয়ে আলাদা হয়ে যায়। তখন সে সুতীর্থের মতো আজকের আকাশনীলিমা দেখে ভাবতে পারে প্রাচীন মিশরীয় মেয়েদের কথা, ভাবতে পারে যেন 'নীল-নদের পারে শেষ শীতের রৌদ্রে' বসে আছে সে। অমলের ভাবনাও কি এর থেকে ভিন্ন কিছু? রূপায়ণ ভিন্ন বটে, কিন্তু তার ভিতরকার সত্যটা একই। অমল যখন বলে :

আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই—মনে হয় যেন আমি অনেকবার দেখেছি—সে অনেকদিন আগে—কতদিন তা মনে পড়ে না। বলব? আমি দেখতে পাচ্ছি, রাজার ডাকহরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে—বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কত দিন কত রাত ধরে সে কেবলই নেমে আসছে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝরনার পথ যেখানে ফুরিয়েছে সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধরে সে কেবলই চলে আসছে—নদীর ধারে জোয়ারির খেত, তারি সরু গলির ভিতর দিয়ে দিয়ে সে কেবলই আসছে—তার পরে আখের খেত—সেই আখের খেতের পাশ দিয়ে উঁচু আল চলে গিয়েছে, সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলই চলে আসছে—রাতদিন একলাটি চলে আসছে; খেতের মধ্যে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে—নদীর ধারে একটিও মানুষ নেই, কেবল কাদাখোঁচা লেজ দুলিয়ে দুলিয়ে

বেড়াচ্ছে--আমি সমস্ত দেখতে পাচ্ছি। যতই সে আসছে দেখছি, আমার বুকের ভিতরে ভারি খুশি হয়ে উঠছে।

তখন, সব সময়ের ইতিহাসই হঠাৎ এক-সাময়িক হয়ে ওঠে। আমাদের টুকরো সময়ের আলগা নিরাপত্তা তখন ভেঙে যায় বলেই এইসব ছবি অথবা অমলের এইসব খুশি আমাদের কাছে বেদনার আঘাত নিয়ে আসে। দীর্ঘ এই উদ্ধৃতিটির মধ্যে আমরা লক্ষ না করে পারি না 'কেবলই' শব্দটির আবর্তিত ব্যবহার, অথবা ঘটমান বর্তমানের স্পন্দিত প্রয়োগগুলি। অমলের এই অনেকদিন ধরে অনেক-দিন আগের দেখা যেন জড়িয়ে থাকে চিরবহমানকে, বর্তমানের সঙ্গে প্রতিমুহূর্তে যুক্ত হয়ে থাকে অতীত-ভবিষ্যতের দুই ডানা।

প্রতিদিনের জীবনে আমরা শুধু দেখি, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন একবার বলেছিলেন, 'ডানাছাঁটা বর্তমান মুহূর্ত'। কিন্তু যদি আমরা 'স্মৃতিস্বপ্ন' আর 'আশাস্বপ্ন'কে জড়িয়ে নিয়ে দেখতে পেতাম এই মুহূর্তকে, যদি অতীত আর ভবিষ্যতের প্রবাহের উপর রেখে পেতে জানতাম এই বর্তমানকে, তাহলে যে-কোনো তুচ্ছও পেত এক স্বর্গীয় লাবণ্য। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে একই আলোয় একই কোণ থেকে যদি কোনো অনড় পাহাড়কেও দেখি, তবু সে-দেখা ভিন্ন হয়ে যায় আমার আগের মুহূর্তের দেখার চেয়ে, পাহাড়ও হয়ে ওঠে সচল, কেননা এ-মুহূর্তে আমার দেখার সঙ্গে জুড়ে আছে পূর্বমুহূর্তের স্মৃতিটুকু। এইভাবে বের্গসঁ বুঝিয়েছিলেন তাঁর চলমানতার তত্ত্ব, আর এই চলমানতাই এনে দিতে পারে বস্তুশরীরের লাবণ্য। সময়ের সেই লাবণ্যেই অমলের চোখ কান ভরে তুলছে উঠোনের কাঠবেড়ালী, পাঁচমুড়ো পাহাড়ের গ্রাম, দইওয়ালার ডাক, প্রহরীর ঘণ্টা, অন্ধ ছিদামের ভিক্ষে, ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে পিসিমার রামায়ণ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়া, অথবা ক্রৌঞ্চদ্বীপে নীল পাহাড়ের সূর্যাস্তে সবুজ পাখির উড়ে যাওয়া। এর মধ্যে অনেক আছে প্রথাগত সুন্দর, কিন্তু তেমনি অনেক আছে যার মধ্যে পৃথক করে সৌন্দর্যকে ধরতে পারি না সবাই। অমল যে পারে, তার কারণ সে জেনেছে সময়ের এক দেশ আছে, সময়ের সঙ্গে অনেক দূরের দেশে চলে যেতে যেতে তার এই দেখা।

নিজের বুদ্ধিমতো প্রহরী আক্ষেপ করেছিল 'সে-দেশে সবাইকে যেতে হবে বাবা।' আমরাও একে সরল অর্থে ভাবতে পারি যেন অমলের মৃত্যুরই এক পূর্বভাষণ। কিন্তু এ তো মৃত্যুর কথা নয়। এ তো সমস্ত বস্তুজগতেরই আরেকটা মাত্রার কথা, তার চতুর্থ মাত্রা। ঝাঁ ঝাঁ দুপুর পড়ে আছে একটা দুপুরমাত্র

হয়ে, তাকে এই সময়মাত্রায় যুক্ত করে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে সে জ্বলে ওঠে সৌন্দর্যের পটে। কালের মাত্রায় জেগে-ওঠা দেশ (space) আমাদের সামনে এমনি করে তার রূপ বদলে দেয়। তাই, পাহাড়ের উপর দিয়ে যে ডাকহরকরার নিরন্তর নেমে-আসা দেখতে পেয়েছিল অমল, সে তো শুধু সময়েরই পথ চলার এক ছবি। বের্গসঁকেও ব্যবহার করতে হয়েছিল 'সময়ের পথ' এই শব্দবন্ধ, 'পথের পাঁচালি'র অপুকেও ভাবতে হয়েছিল 'জন্ম-জন্মান্তরের পথিক আত্মা'র কথা। সেই পথিক-ছবিতে জড়িয়ে দেখেছিল বলেই সুন্দর হয়ে উঠেছিল অমলের যে-কোনো-দেখা যে-কোনো-শোনা। 'গৃহপ্রবেশ'-এর গৃহটি যতীনের কাছে 'কোনো-কালে শেষ হবে না' তাই; 'যেসব পথ এখনো কাটা হয়নি, দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই ভাবীকালের পথ' তাই দেখতে পাবে অভিজিৎ। জয়সিংহেরও সামনে পড়ে থাকবে সহজ সরল জীবনের অনন্তপ্রসারিত পথ। কালের থেকে ছিন্ন করে নিলে এই পথেরও কোনো মানে নেই, দার্শনিক আমাদের মনে করিয়ে দেন যে কেবল দেশ বা কেবল কাল নিছক এক অ্যাবস্ট্রাকশন মাত্র, এ দুটিকে একান্তভাবে মিলিয়ে নিয়েই আমাদের সত্যিকারের অভিজ্ঞতা তৈরি হতে পারে।

এক আছে প্রত্যক্ষকাল, আরেক আছে ধারণাকাল। সুন্দরের বোধ হলো এই প্রত্যক্ষকাল থেকে ধারণাকালে অবিরাম যাওয়া-আসা। প্রত্যক্ষের চোখে দেখলে আমাদের পরিবর্তমান দৃশ্যপরম্পরাই দেখতে পাই শুধু, তাদের দেখতে পাই প্রতিদিনের সামান্য চেহারায়। আর ধারণাকালের মধ্যে সময় যেন মস্ত এক প্রবাহ, অতীতহারা ভবিষ্যৎহারা এক চিরবর্তমান ধারা। তারই মধ্যে ঘটছে সব কিছু, কিন্তু সে যেন দাঁড়িয়ে আছে ঘটনাগুলির বাইরে। ঘটনাকে ছুঁয়েও এইভাবে ঘটনার বাইরে আছে সময়ের দেশ, হালকা, কোনো জিনিসের ভার নেই সেখানে। এই দেশই হয়ে ওঠে অমলের রাজা। আমরা সকলেই কখনো-না-কখনো চলে যেতে চাই তার কাছে, প্রহরীর অর্থে নয়, ফকিরের অর্থে; মৃত্যুর অর্থে নয়, সুন্দরের অর্থে।